প্রথম প্রকাশ : ১১ই মাঘ, ১৩৬৭ ; ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক : বি. এন. পাল
৫ শান্তি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

মুদ্রাকর : নারায়ণ দাস
এম. এন. প্রিণ্টার্স
৪৮ আমহার্স্ট রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

লোকসঙ্গীত শিল্পী

ও

লোকসঙ্গীতের গবেষকবৃন্দকে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের সার্বিক রূপরেখা

১· ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় ঃ

রাজনৈতিক বিভাজন অনুযায়ী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ, পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার সমষ্টিকে বলা হয় 'উত্তরবঙ্গ'. যদিও খণ্ডিত বঙ্গদেশের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে 'দক্ষিণবঙ্গ' বলে কোন অঞ্চলকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। তৎসত্ত্বেও, বর্তমান রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভাগ অনুযায়ী 'উত্তরবঙ্গ' বলতে উপরোক্ত পাঁচটি জেলার সমাহারকেই বোঝায়। "বঙ্গ বিভাগের পর এই জেলাগুলির কোথাও অঙ্গচ্ছেদ, কোথাও পুনর্গঠন হয়েছে। যেমন রঙপুর গোটাই, দিনাজপুরের পূর্বাংশ, কোচবিহারের কিয়দংশ এবং জলপাইগুড়ির পাঁচটি থানা (বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম) তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান এবং বর্তমান বাঙলাদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং ঐ সব জেলার ছিন্ন অংশ অন্যান্য জেলার সঙ্গে যুক্ত।"[১]

অবশ্য প্রাকৃতিক ভাঙাগড়া এবং রাজনৈতিক-উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে-কোন অঞ্চলের সীমারেখার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই কারণে কোনও স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় এবং তার ভৌগোলিক সীমা সবসময়ে এক না-ও হতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সঙ্কুচনের সঙ্গে সঙ্গে কোনও দেশের সীমাও প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়, পূর্বেও তা হয়েছে এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ পুনর্গঠন ও সীমা পুনর্বিন্যাসের পর উত্তরবঙ্গ বলতে মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার সমষ্টিকেই বোঝায়, যদিও প্রশাসনিক দিক থেকে এই জেলা সমুচ্চয়কে বলা হয় 'জলপাইগুড়ি ডিভিশন'। কিন্তু কেবল প্রশাসনিক স্তরেই জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ব্যবহার সীমিত, সাধারণভাবে এর পরিচিতি উত্তরবঙ্গ বলেই। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিক স্তরেও এই অঞ্চলকে উত্তরবঙ্গ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের নাম ছিল 'নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস', বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়', 'উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ' এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহণের নাম 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা'। সব মিলিয়ে লিখিতভাবে প্রশাসনিক স্বীকৃতি না থাকলেও কার্যক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বলতে নির্দিষ্ট জেলা সমুচ্চয়কেই বোঝায়। এতদ্ব্যতীত, সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে উত্তরবঙ্গ শব্দটি লিখিতরূপেও সুপ্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত এই পাঁচটি জেলার সমাহার 'উত্তরবঙ্গের' সীমা উত্তরে সিকিম রাজ্য ও ভুটান রাষ্ট্র, পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও নেপাল রাষ্ট্র পূর্বে আসাম রাজ্য ও দক্ষিণে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে বাঙলাদেশ রাষ্ট্র। আয়তনের দিক থেকে 'উত্তরবঙ্গ' পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক চতুর্থাংশ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার, উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশনের আয়তন ২১,৬২৫ বর্গ কিলোমিটার। অবশ্য তিনবিঘা অঞ্চল বাঙলাদেশকে হস্তান্তর করলে উত্তরবঙ্গের আয়তন আরও হ্রাস পাবে।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার জেলাওয়ারী সীমারেখা ও ১৯৫৮ সালের আদমসুমারী

দার্জিলিং—উত্তরে সিকিম রাজ্য, পূর্বে ভুটান রাষ্ট্র ও জলপাইগুড়ি জেলা, দক্ষিণে বাঙলাদেশ রাষ্ট্র, পশ্চিমদিনাজপুর জেলা আর বিহার রাজ্য এবং পশ্চিমে নেপাল রাষ্ট্র। মোট আয়তন ৩০৭৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৩,৩৫,৬০৮।

জলপাইগুড়ি—উত্তরে দার্জিলিং জেলা ও ভুটান রাষ্ট্র, পূর্বে আসাম রাজ্য, দক্ষিণে কোচবিহার জেলা ও বাঙলাদেশ এবং পশ্চিমেও দার্জিলিং জেলা। মোট আয়তন ৬,২৪৫ বর্গ কিলোমিটার, লোক সংখ্যা ২৭,৮৯,৮২৭।

কোচবিহার—উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে-আসাম রাজ্য দক্ষিণে বাঙলাদেশ এবং পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলা ও বাঙলাদেশ। মোট আয়তন ৩,৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার, লোক সংখ্যা ২১,৫৮,১৬৯।

পশ্চিম দিনাজপুর—উত্তরে দার্জিলিং জেলা, পূর্বে বাঙলাদেশ, দক্ষিণে মালদহ জেলা এবং পশ্চিমে বিহার রাজ্য। মোট আয়তন ৫,২০৬ বর্গ কিলোমিটার, লোক সংখ্যা ৩১,৩২,৩৭৪।

মালদহ—উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ও বিহার রাজ্য, পূর্বে বাঙলাদেশ, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা ও বাঙলাদেশ এবং পশ্চিমেও বিহার রাজ্য। মোট আয়তন ৩,৭১৩ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ২৬,৩৩,৯৪২।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল সমতলভূমির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এবং দেশ বিভাগের ফলে রাজনৈতিক টানা-পোড়েনে জেলাগুলির বেশ কিছু অংশ অন্য রাজ্য বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার ফলে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে। আকৃতিগত দিক দিয়ে উত্তরাংশের তিনটি জেলা, দার্জিলিং,

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরে ও মালদহ জেলা দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের পর থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এবং সেই কারণে উত্তরাংশের জেলাগুলির তুলনায় শীর্ণাকৃতি।

"অবিভক্ত বঙ্গে—উত্তরবঙ্গ বলিতে রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলাকে বুঝাইত। কোচ ও রাজবংশী সমাজকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করিয়া রঙপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল। এই তিনটি জেলাই উত্তরবঙ্গের প্রান্তভাগ।"[২]

অবশ্য উত্তরবঙ্গ নামকরণের পূর্বেও এতদঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র নাম ছিল—কোচবিহার জেলা বাদে বর্তমান উত্তরবঙ্গ পূর্বে 'পৌণ্ড্রদেশ' নামে অভিহিত হত। পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রদেশ (কোচবিহার বাদে উত্তরবঙ্গ), সমতট (অধুনা বাঙলাদেশের খুলনা, যশোহর, নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলা নিয়ে গঠিত), তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক—মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল) কামলংকা (বাঙলাদেশের কুমিল্লা জেলা), কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল) হরিকেলা (চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জেলার সমষ্টি) ও বাকলা (বাঙলাদেশের বরিশাল জেলা), এই সাতটি প্রধান রাজ্য নিয়ে তৎকালীন বঙ্গদেশ গঠিত ছিল। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন হুয়েন সাঙের ভারত আগমনকালে বঙ্গদেশ পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, পৌণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ, কামরূপ বা আসাম, সমতট বা পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল এবং দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলস্থ তাম্রলিপ্ত বা তমলুক।[৩]

বঙ্গদেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যক ব্রাহ্মণে।

'ইমা প্রজাস্তিস্রো অত্যয় যায়ং স্তানী-মানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যান্যা অর্কমোভিত বিবিশ্র ইতি ॥'

(ঋগ্বেদ। ঐতরেয় আরণ্যক ব্রাহ্মণ ২।১।৩)

মুসলমান শাসনকালে বৃহত্তর বঙ্গদেশকে উল্লেখ করা হয়েছে 'সুবে বঙ্গাল' বলে, অন্যদিকে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রধর্বন রাজ্য এবং পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। এই ভুক্তিটি একসময় হিমালয় শিখর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (দামোদরপুর লিপি পঞ্চম শতক) ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মেহার লিপি অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যও এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

"ক্রম বর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং গুপ্ত-রাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধনাইদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং দামোদরপুর তাম্র পট্টোলী কয়টিতে এবং য়ুয়াঙ চোয়াঙের বিবরণে এই পুণ্ড্রবর্ধন নামই পাওয়া যাইতেছে। উপরোক্ত পট্টোলীগুলিতে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের নাম হইতে এ তথ্য আজ নিঃসংশয় যে, তদানীন্তন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অন্ততঃ বগুড়া-দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি সমস্ত উত্তরঙ্গই বোধহয় ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগিরথী তীর হইতে আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত। কারণ য়ুয়াঙ-চোয়াঙ কজঙ্গল হইতে আসিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং করতোয়া পার হইয়া গিয়াছিলেন কামরূপ। কজঙ্গল এবং করতোয়া মধ্যবর্তী ভূভাগই তাহা হইলে পুণ্ড্রবর্ধন, উত্তরে হিমবচ্ছিখর, দক্ষিণে সীমা কালে কালে বিভিন্ন।"[৪]

করতোয়া নদী বিধৌত দেশই-যে তৎকালীন পুণ্ড্রদেশ এই সম্পর্কে নৈয়ায়িক রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'তিথিতত্ত্বে'র স্নান মন্ত্রেও উল্লেখ আছে ঃ

'করতোয়ে সদানীরে সরিশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রাণ প্লাবয়সে নিত্যং পাপ হরো করোদ্ভবে ॥'

মহারাজ বল্লাল সেন বঙ্গদেশকে 'রাঢ়' ও 'বারেন্দ্রভূমি' নামে ভাগ করার পর তৎকালীন পৌণ্ড্রদেশ 'বারেন্দ্রভূমি' বা 'বরেন্দ্রভূম' নামে পরিচিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকবৃন্দ এই অঞ্চলকেই 'বারিন্দ' বলে উল্লেখ করেছেন।

"মগধ, উৎকল, কলিঙ্গ, মিথিলা এবং বাংলার বিভাগগুলি একত্রে অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্বাংশ 'প্রাচী' নামে কথিত হইত। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে, জৈন ও বৌদ্ধ-গ্রন্থে, শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই 'প্রাচী'র ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি ভুক্তিব বা পাদেশেব উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার নাম পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তিরই অন্তর্গত 'বরেন্দ্রী' নামে একটি মণ্ডল বা বিভাগ ছিল। তাহা বর্তমানে রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত। রাজসাহী শহরের অনতিদূরে একটি বিস্তৃত ভূভাগ 'বরেন্দ্রী'র অপভ্রংশ 'বরিন্দা' নামে অদ্যাবধি সুপরিচিত। প্রাচীন বরেন্দ্রীমণ্ডলের ইতিহাসই রাজসাহী বিভাগের বা উত্তরবঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।"[৫]

তুর্কীদের বঙ্গবিজয় সম্পর্কিত ইতিহাস 'তাবাকৎ-ই-নাসিরী' (Tabaqat-i-Nasiri) গ্রন্থের লেখক মিনহাজু-এস-সিরাজ (Minhaju-S-Siraj)-এর মতে দশম শতাব্দীর কামরূপ (আসাম ও কোচবিহার নিয়ে গঠিত) অধ্যুষিত ছিল

কোচ, মেচ, ও থারু উপজাতির লোকে—যাদের মঙ্গোলয়েড ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিজয়ী তুর্কীদের উপরেও পড়েছিল। এছাড়াও কামরূপ রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল দানব, কিরাত, অসুর, বর্মন, চুতিয়া, পাল ও সেন রাজবংশ।[৬]

দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার গৌড়ে (লক্ষণাবতী) পাল রাজাদের রাজত্বকালে কোচ-সম্প্রদায় শক্তি সঞ্চয় করে। এই সময়ে কামরূপ অঞ্চলে প্রচণ্ড অরাজকতা শুরু হয় ফলে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নামে অহোম, খেণ, গারো, কাছারী, মেচ ও ভোট উপজাতি। কালক্রমে কামরূপের পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে অহোমরা, আর পশ্চিমাঞ্চলে খেণ উপজাতির নীলধ্বজ। অহোম ভাষায় খেণ অর্থে বোঝায় উত্তম বা রাজা। কেউ কেউ নীলধ্বজকে কান্তনাথ বলেও উল্লেখ করেছেন। নীলধ্বজ তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন ধরলা নদীর পশ্চিম পাড়ে—কামতাপুরে। (বর্তমান কোচবিহার জেলার প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে)। "ক্ষেণ বংশের রাজারাই কামরূপ থেকে রত্নপীঠকে পৃথক করে কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 'কামদা' বা গোঁসানী দেবী ছিলেন তাঁদের কুলদেবী। তাই রাজ্যের নাম কামতা এবং রাজধানীর নাম হয় কামতাপুর।"[৭] নীলধ্বজের পর তাঁর পুত্র চক্রধ্বজ এবং পরে চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বর কামতাপুরের শাসক হন। খেণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নীলাম্বরই শেষ রাজা। তাঁর রাজ্যের পরিধি ছিল গোয়ালপাড়া ও কামরূপের পশ্চিমাঞ্চল, রংপুর ও কোচবিহারের সম্পূর্ণ অংশ এবং জলপাইগুড়ি ও অবিভক্ত দিনাজপুরের কিছু অংশ।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ইবন্ বখ্তিয়ার খিলজি[৮] (মতান্তরে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খিলজি[৯]) নদীয়া অধিকার করার পর বাংলার শাসনভার মুসলমান শাসকদের হাতে যায়। ইতিমধ্যে নীলাম্বরের মন্ত্রী শশিপাত্র তাঁর পুত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে বাংলার তৎকালীন শাসক আলাউদ্দীন হুসেন বা হোসেন শাহের দরবারে উপস্থিত হন কামতাপুর আক্রমণের অনুরোধ নিয়ে। কামতাপুরের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে হোসেন শাহ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু দীর্ঘ বারো বছর দুর্গ অবরোধ করার পরও তা অধিকার করতে না পেরে কৌশলে রাজধানীতে ছদ্মবেশে সেনা অনুপ্রবেশ করিয়ে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নীলাম্বরকে বন্দী করে তাঁর রাজধানী কামতাপুর অধিকার করেন; এবং পুত্র নসরৎ শাহের হাতে কামতাপুরের শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু অহোমদের কাছে নসরৎ

শাহ পরাজিত হলে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পুনরায় অরাজকতা সৃষ্টি হয়।[১০]

এই সময় ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব উপত্যকার শাসক ছিলেন 'সুহুঙমঙ'—যাকে অহোম রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলা হত। তিনি নিজেকে 'স্বর্গ-নারায়ণ' বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর সময়েই বিখ্যাত পণ্ডিত শংকরদেব কামরূপে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

১৫৭৬ সালে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্ত হয়, কিন্তু বাংলার 'বারো ভুঁইয়া' খ্যাত শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ প্রমুখ স্থানীয় 'ভুইয়া' বা জমিদার গোষ্ঠী মোগল আধিপত্যের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপাড়ে কোচ প্রধান হাজো মণ্ডল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। 'হাজো' শব্দের বোড়ো অর্থ ছোট পাহাড়, আর 'মণ্ডল' ইঙ্গিত করে গোষ্ঠীপতির। অবশ্য ভিন্নমতে হাজো কোন ব্যক্তির নাম নয়, একটি অঞ্চল বিশেষ। "There was no man called Hajo, Hajo was an area of land in Kamrup comprising of Goalpara, Dhubri and part of Gauhati. Haridas was the Sardar of Hajo".[11] অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। "A single Koch Kingdom was split up into two Koch States of Hajo in Goalpara (Assam) and Koch Behar in North Bengal."[12]

অঞ্চলের নাম হাজো হলেও, কোচ বংশীয় গোষ্ঠীপতিরও নাম ছিল হাজো। হাজো তাঁর দুই কন্যা জিরা ও হীরার বিয়ে দেন গারো পাহাড়ের (আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত) চিকিনা পর্বতের (আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি শহরের ৬০/৬৫ মাইল উত্তরে সংকোশ বা সরল-ভাঙ্গা ও চম্পাবতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে চিকিনা ঝাড় বা চিকিনা পাহাড়) মেচ প্রধান হৈহয় বংশীয় হারিয়া বা হরিদাস মণ্ডলের সঙ্গে। হরিদাসের ঔরসে এবং জিরার গর্ভে চন্দন ও মদন এবং হীরার গর্ভে শিশ্ব ও বিশ্ব নামে মোট চার পুত্র জন্মে। চিকিনার শাসক তুর্ক কোতোয়ালকে পরাজিত করে ৯১৭ বঙ্গাব্দে তথা ১৪৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দন চিকিনার শাসক হন।[১২] এই সময় থেকেই 'রাজশক' গণনা শুরু হয়, যদিও কোচ রাজা হিসাবে চন্দনের উল্লেখ কোন নথিপত্রে পাওয়া যায় না। "কোচবিহার রাজসভার মহাফেজখানায় রাজবংশলতার (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃত) তিনখানা নকল রক্ষিত আছে; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বিষয়ে কিছু কিছু অনৈক্য থাকিলেও চন্দন এবং মদনের নাম একখানিতেও নাই। ডঃ বুকানন হেমিল্টনের (১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ) সংগৃহীত বংশলতাতেও চন্দন এবং মদনের নাম নাই।"[১৩]

যা-হোক কোচরাজবংশের সূচনার ১২ বছর পর ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বা ৯৩০ বঙ্গাব্দে এবং ১৪ রাজশকে বিশু বা বিশ্বসিংহ কামতাপুরের শাসক হন। বিশ্বসিংহের অভিষেকের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিশ্বসিংহ অনুজের অনুকূলে সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করে নিজেই রাজছত্র ধারণ করেন, এবং 'রায়কত' বা পরিবারের প্রধান এবং বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।[১৪] বিশ্বসিংহ সৌমরপীঠ, বিজনী বা বিজয়পুর অধিকার করেন, এবং ভুটানের রাজাকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ গৌড় অভিযান করে গৌড়ের শাসকের হাত থেকে বৈকুণ্ঠপুর অধিকার করেন। সেই সময় দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন শেরশাহের পুত্র সেলিমশাহ্। বিশ্বসিংহ বৈকুণ্ঠপুর অধিকার করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিশ্বসিংহকে বৈকুণ্ঠপুরের শাসনভার অর্পণ করেন। বৈকুণ্ঠপুরের নতুন রাজধানী হয় দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার রায়গঞ্জে (বর্তমানে রায়গঞ্জ জলপাই-গুড়ি জেলার অন্তর্গত)। রাজধানীকে বলা হত 'নিজ বৈকুণ্ঠপুর'।

বৈকুণ্ঠপুরের রাজন্যবর্গ কামতাপুরের মহারাজকে বার্ষিক নজরাণা দিতেন এবং অভিষেকের সময় রাজছত্র ধারণ করতেন। কিন্তু ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা মহীদেব কামতাপুর বা কোচবিহার মহারাজকে নজরাণা দিতে এবং অভিষেকের সময় রাজছত্র ধারণ করতে অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন নৃপতি হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ জয়ন্তদেব বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহরে স্থানান্তরিত করেন।

ইতিমধ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তথা ৬ই মাঘ ১১৭৯ বঙ্গাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে কোচবিহার রাজ্যের তৎকালীন মহারাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের এক চুক্তির ফলে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্য পরিণত হয় এক সামন্ততান্ত্রিক করদ মিত্র রাজ্যে।[১৫] এর ফলে ১৫১০ থেকে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহারের ১৫ জন স্বাধীন কোচ-নৃপতির মোট ২৬৩ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি যখন ভারতের গভর্নর জেনারেল, তখন বঙ্গদেশ বা 'বেঙ্গল' বলতে বোঝাত বর্তমান বাঙলাদেশের সম্পূর্ণ এলাকা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা বাদে সমগ্র

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রদেশ, আসামের শিলচর ও কাছাড় জেলা এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলার সমষ্টিকে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে আরও সাতটি জেলা অধিগ্রহণ করে এবং সেগুলিও 'বেঙ্গল'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। 'বেঙ্গল' বা বঙ্গদেশের পুনরায় বিস্তৃতি ঘটে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য অধিগ্রহণ করে বৈকুণ্ঠপুর, পশ্চিম ডুয়ার্স এবং জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বোদা, পচাগড় বা পাছাঘর, তেঁতুলিয়া বা তিতালিয়া দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম এই পাঁচটি থানা বা চাকলা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়। অবশ্য ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলার এই পাঁচটি চাকলাকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগে দিয়ে, প্রাচীন বৈকুণ্ঠপুর ও পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে পুনর্গঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলা।

অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট ভারতের গভর্ণর জেনারেল এবং কোচবিহারের মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মধ্যে সাক্ষরিত ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে কোচবিহার রাজ্যের সংযুক্তিকরণের চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার করদ মিত্র রাজ্য হিসাবে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। "এই হস্তান্তরের প্রায় চার মাস পরে, ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫ এর ২৯ (ক) ধারা অনুসারে কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা রূপে।"[১৬]

অন্যদিকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৪'র অধিগ্রহণ ধারায় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জলপাইগুড়ি জেলার জমিদারী স্বত্বের বিলোপ ঘটানো হয় এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলির ন্যায় এককালের স্বাধীন রাজ্য বৈকুণ্ঠপুর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্যতম জেলায় পরিণত হয়।[১৭]

এইভাবে ইতিহাসের বিচিত্র গতিতে আর রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে এক সময়ের দুটি প্রভাব প্রতিপত্তিশালী স্বাধীন রাজ্য কালক্রমে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দুটি জেলায়।

২. আদিবাসী ও তাদের জীবনযাত্রা ঃ

বঙ্গদেশের সুদূর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বসবাসকারী আদিবাসীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় মহম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজির তিব্বত অভিযানের ইতিহাসে। মহম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ভূটান ও তিব্বত অভিযান করেন।[১] তৎকালীন লক্ষণাবতী ও তিব্বতের মধ্যবর্তী পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল অর্থাৎ কামরূপে বসতি ছিল কোচ, মেচ ও থারু সম্প্রদায়ের তিনটি অ-ভারতীয় মঙ্গোলয়েড জাতির।

পশ্চিম প্রাগ-জ্যোতিষপুর বা কামতা রাজ্যের (পরবর্তীকালে কামতাপুর ও বৈকুণ্ঠপুর দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য) সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতি এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং যে জাতি যখন ক্ষমতায় এসেছে তারা অন্যদের বিতাড়নের চেষ্টা করলেও একেবারে নির্মূল করতে পারেনি, ফলে পূর্বতন আদিবাসীদের কিছু অংশ থেকেই গেছে উদ্দিষ্ট অঞ্চলে। পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে পরস্পর গ্রহণ করেছে একে অন্যের সংস্কৃতিকে, পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনের ফলে কাল-ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র জাতির, এক নতুন প্রজন্মের। জাতি-তাত্ত্বিক বিচারে বলা হয় যে, সেই সময় উত্তরবঙ্গ ও আসামে দুটি যুদ্ধপ্রিয় জাতির আধিপত্য ছিল। পশ্চিমে কামতা (তৎকালীন কামরূপ) এবং পূর্বে অহোম রাজ্য। অহোমরা উত্তর ব্রহ্মদেশ থেকে আগত মঙ্গোলয়েড জাতি—যারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এইস্থানে শক্তিশালী রাজত্বের পত্তন করেছিল। কালক্রমে এরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। অহোম থেকেই 'আসাম' রাজ্য (বর্তমানে 'অসম') নামকরণ হয়েছে। অন্যদিকে, কামতা রাজ্যে কোচ, মেচ ও থারু সম্প্রদায় ছাড়াও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর আরও কয়েকটি উপজাতি বাস করতো। যেমন, ভুটিয়া, লেপচা, রাভা, গারো ও টোটো সম্প্রদায়। আবার আদি-অস্ট্রাল উপজাতি শাখার মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহালি, নাগেসিয়া, কোরা প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কালে কালে বসতি গড়েছে এতদঞ্চলে। এছাড়া দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দুটি উপজাতি, যেমন, ওঁরাও এবং মাল-পাহাড়ী বা মাল-পাহাড়িয়া উপজাতিও তাদের স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করেছে এতদঞ্চলে।

তৎকালীন কামরূপ এবং পরবর্তীকালের কামতাপুর অঞ্চলে বিভিন্ন উপ-জাতির বসতি থাকলেও রাজবংশী জাতিই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ, অবশ্য নৃতাত্ত্বিক বিচারে রাজবংশী কোন স্বতন্ত্র জাতি কিংবা কোচ ও মেচ জাতির

সংমিশ্রণে উদ্ভূত মিশ্র জাতি এই প্রশ্নে মতদ্বৈততা রয়েছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকবৃন্দ, যেমন, ডঃ উইলিয়ম হাণ্টার, এইচ. বিভারলে, এইচ. এইচ. রিসলে, এ. ই. পোর্টার প্রমুখের অভিমত, "There can be little doubt that the people commonly known as Koch, Rajbansis and Pali, are a very mixed race."[২] ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। "The masses of North Bengal areas are very largely ot Bodo origin or mixed Austric—Dravidians—Mongoloid. They can now mainly be described as Koch i e, Hinduised or semi-Hinduised Bodo who have abandoned their original Tibeto-Burman speech and have adopted the Northern dialect of Bengali. They are proud to call themselves as Rajbansis and to claim to be called Kshatriyas,"[৩]

অন্য এক ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ. বৈলিও আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, "The Raikat of Jalpaiguri and Cooch Behar Families are Coches or Koches and Meches mixed. As both royal Families call themselves Sivabangshi, so the mass of the Koches call themselves Rajbansis as connected with Royal Families."[৪] অধ্যাপক বৈলিও'র অভিমত তথ্যাভিত্তিক নয় বলেই মনে হয়, কারণ, কামতাপুর রাজবংশের শুরু হয় কোচমাতা ও মেচ পিতার সন্তান চন্দনের সময় থেকে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে কোচ সম্প্রদায়ই কেবল রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সেইকারণে তারা 'রাজবংশী' এমন দাবী করা অযৌক্তিক যেহেতু অনা সম্প্রদায় অর্থাৎ মেচ জাতি কখনই এই ধরনের দাবী করেনি যদিও তারাও রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে, ১৫১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ কামতাপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৪৩৯ বছরের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ৫,০৮,১৬২ হতে পারে না, যেখানে ঐ সময়ে মেচ সম্প্রদায়ের জন সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩৪জন। (১৯৫১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী।)

অন্যদিকে, মৈমনসিংহ (অধুনা বাঙলাদেশের অন্তর্গত) নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ:কিছুসংখ্যক মৎসজীবী পরিবারের পদবী 'রাজবংশী' কিন্তু এইসব পরিবারের কারও সঙ্গেই কোন কালে কোন রাজা বা রাজপরিবারের সম্পর্ক ছিল না বা এখনও নেই। এক্ষেত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক

না থাকলেও এরা রাজবংশী বলে পরিচিত। সুতরাং রাজপরিবার-জাত বা রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় রাজবংশী জাতির সৃষ্টি, এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের কয়েকজন 'রাজবংশী' এক স্বতন্ত্র জাতি বলে দাবী করেন। "কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে পামীর মালভূমির নিম্নদেশে অবস্থিত কম্বোজ রাজবংশের একটি শাখা খ্রীষ্টীয় দশম শতকে উত্তরবঙ্গে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্থাপন পূর্বক 'কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি' উপাধি লইয়া রাজত্ব করিতেন। বাণগড়প্রাপ্ত স্তম্ভলিপিতে ও ইরদা তাম্রলিপিতে ইহাদের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যে অনুমান করিয়াছিলেন যে, কম্বোজ রাজবংশ হইতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত।"[৫]

কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ বা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'কম্বোজ রাজবংশ হইতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে' এমন কথা কোথাও বলেননি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন, "বরেন্দ্র দেশের অনেক স্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মঙ্গোলীয় আকাবের কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি দেখা যায়, ইহারা তিব্বতীয় বা ভুটিয়া আক্রমণকারীগণের অর্থাৎ কম্বোজ বংশজ গৌড়পতির অনুচরদের বংশধর বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অনুমান করিবার কারণ, কম্বোজ বংশজ গৌড়পতির সঙ্গে ভিন্ন বহুসংখ্যক মঙ্গোলীয় ঔপনিবেশিকের বরেন্দ্রে অর্থাৎ করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগে প্রবেশের আর কোন অবসর দেখিতে পাওয়া যায় না।"[৬]

আবার ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বলেন, "There is an element KAM or KOM which occurs in all these names, which also occurred in the name of the most western tribe of the Bodos the Koches (modern Koc-Koch) from earlier Kawoca or kamoca sanskritised as KAMBOJA in the 10th century in a North Bengal inscription (Banga inscription in sanskrit from Dinajpore) in 880 saka (966 AD)."[৭]

নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিচারে কোচ ও রাজবংশীকে দুই ভিন্ন জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন রংপুর ধর্মসভার সভাপতি যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

"কোচ ও রাজবংশী দুইটি পৃথক জাতি। সকল কোচেরই মঙ্গোলীয় গঠন। আদিম কোচ কৃষ্ণবর্ণ কদাকার জাতি। পক্ষান্তরে রাজবংশীয়গণ সুপুরুষ। * * * রাজবংশীয়দের প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত ও মৈথিলী হইতে উৎপন্ন। মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাই রাজবংশী ভাষার মাতামহী। কিন্তু কোচ শব্দের ঈদৃশ ধাতুগত বুৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। * * * রাজবংশী জাতি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের খেণ পূর্ব অধিবাসী। ইহাদের পর খেণ রাজত্ব, তারপর কোচ, আধিপত্য। * * * কোচগণ বিশ্বসিংহের সময় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু রাজবংশীয়-গণ পূর্বাপর হিন্দু। পূজা বিষয়ে কোচ ও রাজবংশী জাতির মধ্যে পাথক্য পরিলক্ষিত হয়।"[৮]

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। শ্রী সুশীল-কুমার ভট্টাচার্য বলেন, "কোচ ও রাজবংশী দুই ভিন্ন জাতি, উভয়ের আকৃতি, ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতি আলোচনা করলে দেখতে পাব যে, এরা দুই ভিন্ন জাতি এবং মূলে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির ধারায় পুষ্ট। অবশ্য পরবর্তীকালে পাশাপাশি বাস ও কাজ করার ফলে এই দুই জাতি এমনভাবে পরস্পরের মাঝে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে 'উভয়ে একজাতি'—এ ধরণের ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মাবার অনেক উপযুক্ত তথ্য সঞ্চয়নের সুযোগ ঘটেছিল।"[৯]

'ইম্পিরিয়াল গেজেট অব ইণ্ডিয়াতে'ও অনুরূপ অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। "Though the coches freely call themselves Rajbansis it is believed that the two communities sprang from entirely different sources, the Koch Kings of Mongoloid origin, while the Rajbansis are a Dravidian tribe who probably owned the name long before the Koch Kings rose to power."[10]

প্রাচীন পুঁথিতেও রাজবংশীদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে পরশুরাম ক্ষত্রিয়নিধন শুরু করায় প্রাণভয়ে বহু ক্ষত্রিয় পালিয়ে যায় হিমালয়ের পাদদেশে বা কামরূপের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে। সেখানে তারা অনার্য কোচদের সংস্পর্শে আসে এবং কালক্রমে কোচ রমণীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই ভাবে আর্য ও অনার্য জাতির মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় এক নতুন প্রজন্মের, যারা অনার্য-সম্ভূত বলে এবং প্রাণের মায়ায় স্বীয় ক্ষত্রিত্বের দাবী পরিহার করে নিজেদের ভঙ্গ-ক্ষত্রিয় রাজবশী বলে পরিচয় দিত। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

রংপুর জেলার (অধুনা বাঙলাদেশের অন্তর্গত) চাকলা ফতেপুরের অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামের কবি রতিরাম দাস রচিত একটি 'জাগের গান' উল্লেখযোগ্য।

"হায়রে! রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশুরামের ভয়, এ বড়ি শরম ॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দ্যাশে আইসাছি।
ভঙ্গ-ক্ষত্রী রাজবংশী এই নামে আছি ॥"[১১]

অবশ্য রাজবংশী জাতির অভ্যুত্থানে যে পরশুরামের কথা বলা হয়েছে, তিনি পুরাণ কথিত জামদগ্নি পরশুরাম নন, এই পরশুরাম নন্দবংশীয় রাজা মহাপদ্ম নন্দ। আসামের ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য পণ্ডিত রূপনারায়ণ শ্রুতিধর 'কামতেশ্বর কুলকারিকা' নামে অসমীয়া ভাষায় লিখিত পুঁথিতে উল্লেখ করেছেন,

"মহানন্দি সুত নন্দ বৌদ্ধ রাজা সদা মন্দ
ধ্বংস করে ক্ষত্র বংশ তিন সপ্তবার।
সেই গোটা ভূজ বলে যুঝিলেন্ত অবহেলে
দ্বিতীয় পরশুরাম যিতু অবতার ॥
ছিঁড়য়ে গালার দাঁড় ক্ষাত্র চিহ্ন লুপ্ত করি
প্রাণ ভয়ে ইতি উতি পলান্ত সকলি।
সংগ্রামক ভয় করি ভঙ্গ-ক্ষাত্রি নাম ধরি
আপনাকে মানে কেহ রাজবংশী বুলি ॥"[১২]

ভ্রামরী তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বিতীয় পটলেও এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

"নন্দীসুত ভয়াদ্ভীমে পৌণ্ড্রদেশাদ্ সমাগতা।
বর্দ্ধনস্য পঞ্চপুত্রা স্বগনৈর্বন্ধবৈঃ সহ ॥
রত্নপীঠং বিবাসন্তে কালাদ্ বিপ্রসঙ্গমাৎ।
ক্ষাত্র ধর্ম্মাদপক্রান্তী রাজবংশীতি খ্যাতা ভূবি ॥"[১৩]

অর্থাৎ, নন্দীপুত্রের ভয়ে ভীত বর্দ্ধনের পঞ্চপুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গসহ পৌণ্ড্রদেশ হতে রত্নপীঠে এসে কালক্রমে ব্রাহ্মণাভাব হেতু ক্ষাত্রধর্মচ্যুত হয়। তারাই ভুবনে রাজবংশী নামে খ্যাত।

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার চকিয়ারছড়া গ্রামের বজ্রধর কার্যীর পৌত্র চক্রধর কার্যীর সংগৃহীত হস্তলিখিত এক প্রাচীন 'রাজবংশাবলী' নামে পুস্তিকার 'পঞ্চম পল্লবে'ও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

"পৌণ্ড্র দেশে রাজা নামে যে ক্ষত্রবর্দ্ধন।
শূদ্রীসূত সনে তার হয় মহারণ॥
ধর্ম্ম জন্য যুদ্ধ করে পৌণ্ড্র ক্ষত্রীগণ।
সেই রণে বহু ক্ষত্রী হইল নিধন॥
কালাগ্নির মত দগ্ধে যত পৌণ্ড্রগণ।
সেই রণে প্রাণ দেয় নৃপতি বর্দ্ধন॥
তাঁর পুত্রগণ ভীত হয় সে কারণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন॥
করতোয়া পরপারে রত্নপীঠস্হান।
বনানীতে ঘেরা মাঠে বাছে বাসস্থান॥
কেহ কেহ বাছে স্হান কামতাবিহারে।
আশ্রয় লয় কেহ প্রাগজ্যোতিষপুরে॥
এই রূপে যেথা সেথা লইয়া আশ্রয়।
রাজবংশী বলি সবে দেয় পরিচয়॥
ক্ষত্রীনামে পাছে হয় নিধন সাধন।
রাজবংশী অ্যাখ্যা ধরে সে কারণ॥"[১৪]

বিভিন্ন সময়ের আদমসুমারী অনুযায়ী জাতিগত সংখ্যার বিচারেও উত্তরবঙ্গের মোট জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই রাজবংশী। স্বভাবতই রাজবংশী জাতির সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্হাই প্রাধান্য লাভ করেছে সমগ্র উত্তরবঙ্গে। রাজবংশী ব্যতীত অন্যান্য যে সব জাতি বা উপজাতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে আছে প্রধানতঃ পলিয়া (জলপাইগুড়ি, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর), বেলদার (মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর) ভুঁইমালি (মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর) বিঁদ (মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর) দোসাদ (জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার) তিয়র (মালদহ ও দার্জিলিং) এবং মুশাহার ও নুনিয়া (মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর)। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এই সব তফশিলী জাতি বা উপজাতির পরিচয় যাই হোক-না কেন, দীর্ঘকালীন সাযুজ্য, ও সহাবস্থানের ফলে এইসব জাতি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচার-আচরণ এবং ভাষার অক্ষর ব্যবহারে বাঙালী সংস্কৃতি ও ভাষার অনুসারী এবং হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী। আদিবাসীদের মধ্যে এছাড়াও রয়েছে কিছু সংখ্যক খেণ, কুড়িসর্জন ও মোরাঙ্গিয়া সম্প্রদায়ের লোক। খেণরা গোঁড়া হিন্দু এবং শক্তির উপাসক। তবে কিছু সংখ্যক

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিবারও রয়েছে। এই জাতির পদবী--মহেন্দ্রী, তেলি, বারুই বা বাররী, মালুয়া ও পাতিয়ার। প্রতিটি পদবীরই সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ এদের বৃত্তি বা জীবিকা অনুযায়ী, যদিও বর্তমানে সকলে আর স্ব-স্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত নেই।

কুড়িসর্জন জাতি সম্পর্কে কথিত আছে যে মহারাজা বিশ্বসিংহের মায়ের দিক থেকে মেচদের কুড়িটি পরিবার সংযুক্ত ছিল, তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে কুড়িগ্রামে বসতি স্থাপন করে। কুড়িগ্রাম বর্তমানে কোচবিহার জেলার সীমান্তে রংপুর (অধুনা বাঙলাদেশে অবস্থিত) জেলার অন্তর্গত এক মহকুমা।

মোরাঙ্গিয়া কোন জাতি না স্থানের নাম সে সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি, তবে একথা নিশ্চয় যে, এরা 'মোরাঙ' দেশ থেকে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৫৫—১৫৮৭ খ্রীঃ) কোচবিহারে এসেছিল। এই মোরাঙ দেশের আদিবাসীদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় জলপাইগুড়ি জেলার বত্রিশ হাজারীর পশ্চিমাঞ্চলে, পুর্ণিয়া ও ত্রিহুতের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ 'তরাই' অঞ্চলের পূর্বাংশে বা নেপালের দক্ষিণস্থ পাহাড়ের ঢালে। এদের সম্পর্কেও কথিত আছে যে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ নরনারায়ণের দরবারে ১২ জন মোরাঙ্গিয়াকে 'দাস' হিসাবে উপঢৌকন দেওয়া হয়। তখন থেকে এরা কোচবিহারে বসবাস করতে থাকে এবং কাল-ক্রমে রাজবংশীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

জাতি হিসাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকলেও জনগণনা কালে ঐ জাতিগত বিভাজন সুনির্দিষ্ট হয়নি। তাই কোন কোন সময় রাজবংশী জনসংখ্যার হিসাবে প্রভূত তারতম্য দেখা যায়। ১৯১১ সালের আদম সুমারীতে এই তারতম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে—"A most persistant agitation was carried on by Rajbansis of North Bengal with the object of being recognised as Kshattriyas by descent. They desired not only to be recorded seperately from Koch, but also to be distinguished by the name Kshattriyas"[১৪] অর্থাৎ এতদিন কোচ ও রাজবংশীদের স্বতন্ত্র সারণীতে দেখানো হয়নি ফলে মোট আদিবাসী সংখ্যার হিসাবে রাজবংশীদের সংখ্যা বেশি দেখানো হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য অনেক উপজাতিই নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দেওয়াতেও প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। আবার কয়েক প্রজন্মের আদিবাসীদের রাজবংশীয়দের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হওয়ায় মূল জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে তারা রাজবংশী জনসংখ্যায় সামিল হয়েছে।

১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জাতিগত জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল এইরূপ ঃ

জেলা	রাজবংশী	কোচ	পালিয়া	ভিন্নর
দার্জিলিং	১৫,৮৯৪	—	১	—
জলপাইগুড়ি	১৭২,৭১০	১৯৪	—	৩
কোচবিহার	২৫২,০৬৯	৯	—	৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৬৭,৪৮৯	৩৩১	১০,০৪৪	১৪২১

১৯৫৮ সালের আদমসুমারীতে রাজবংশীদের স্বতন্ত্র আদিবাসী হিসাবে না দেখিয়ে তাদের মূল জনসংখ্যার মধ্যে হিসাব করা হয়েছে।

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মোট আদিবাসীর সংখ্যা
দার্জিলিং	৭,৮১,৭৭৭	১,০৮,৫৮৬
জলপাইগুড়ি	১৭,৫০,১৪৯	৪,২৮,৫৯৫
কোচবিহার	১৪,১৪,১৮৩	১০,৬১১
পশ্চিম দিনাজপুর	১৮,৫৯,৮৮৭	২,২১,৩১৭

১৯৫১ এবং ১৯৫৮ সালের আদমসুমারীতে রাজবংশীদের হিসাবে বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে। ১৯৫১ সালের হিসাবে কোচবিহার জেলায় রাজবংশী-দের মোট সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২,৫২,০৬৯ অন্যদিকে ১৯৫৮ সালের হিসাবে আদিবাসীদের সংখ্যা মাত্র ১০,৬১১ অর্থাৎ এই সময়ে রাজবংশীদের আদিবাসী তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বরং রাজবংশীদের মূলজাতির অংশীদার হিসাবে দেখানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজের সমাজ ও সংস্কৃতি রাজবংশীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এই রাজবংশী জনজাতির সংস্কৃতিই উত্তর-বঙ্গের মূল সাংস্কৃতিক প্রবাহ।

এককালে যদিও বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গ কল্লোলিত ছিল ভিন্নমুখী সংস্কৃতিতে বিভিন্ন কোম বা গোষ্ঠী অনুসরণ করত তাদের নিজস্ব জীবন। কিন্তু কালক্রমে পারস্পরিক সহাবস্থান আর সামাজিক সংমিশ্রণে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে সংখ্যালঘু অনেক জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি রাজবংশীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে ফলে এইসব সংখ্যালঘু উপজাতি-দের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তাই আজ উত্তরবঙ্গে কোচ, মেচ, রাভা,

টোটো, পালিয়া, তিয়র, কুড়িসর্জন, মোরাঙ্গিয়া প্রভৃতি উপজাতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ রাজবংশীদের সঙ্গে হয় একাত্ম হয়ে গেছে অথবা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি গড়ে তুলেছে। কোচবিহারের প্রায় ৫০ হাজার রাভা বসতি গড়েছে আসামের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় এবং ভুটানের পার্বত্য এলাকায়। এর ফলে উত্তরবঙ্গে বর্তমানে মূলতঃ দুটি জনগোষ্ঠীরই প্রাধান্য, প্রথমতঃ রাজবংশী জাতি এবং অন্য জনগোষ্ঠী হিসাবে ভারত ভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু বাঙালী জাতি। এছাড়া দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়ী এলাকায়, বিশেষ করে চা বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আগত আদিবাসীও উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের সার্বিক জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে রাজবংশীদেরই প্রাধান্য, কারণ তারাই মূলতঃ এতদঞ্চলের আদিবাসী। আর রাজবংশীদের জীবন সঙ্গীত হল ভাওয়াইয়া ও চটকা। সেই কারণে রাজবংশীদের জীবনযাত্রার উপর সাধারণভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পোষাক-পরিচ্ছদ ঃ সাধারণতঃ রাজবংশী পুরুষের পোষাক নেঙটি, সেই সঙ্গে কোমর থেকে সামনের দিকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঝোলে একহাত লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড বস্ত্র। শীতে পায়ে থাকে খড়ম আর গায়ে বস্ত্রখণ্ড 'গিলাপ'। এই গিলাপ এখন সুতোর তৈরী হলেও আগে মোটা সিল্ক বা তসরের তৈরী হত। তাদের বাকী শরীরে কোন বস্ত্র নেই, খালি পা, কেবল কোন উৎসবে যাওয়ার সময় বয়োজ্যেষ্ঠরা জুতো পরতেন। রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য মাথায় থাকে 'মাথাল'—বাঁশপাতা আর বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী অনেকটা শোলার টুপির মত, যা পূর্ববঙ্গের চাষীদের মাথায় দেওয়া 'টোকা'র মত। এতে কেবল মাথাই ঢাকে শরীরের বাকী অংশ থাকে অনাবৃত। রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি অঞ্চলে এইজন্য ব্যবহৃত হয় 'ঝাঁপি'—যা মাথা থেকে শরীরের পিছনের অনেকটা অংশই ঢাকতে পারে। কোন উৎসবে বা অন্য কোথাও যাওয়ার সময়েই কেবল পুরুষেরা ধুতি ও জামা ব্যবহার করেন। সাজি মাটি বা কলাগাছের খোল পুড়িয়ে তৈরী ক্ষারে জামা কাপড় কাচা হয়, তবে ইস্ত্রি করার কোন ব্যাপার নেই।

রাজবংশী মেয়েদের পোষাক রঙীন চাদরের মাপের ৫ হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া কাপড়, যাকে বলে 'ফোতা'। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে এই 'ফোতায়', কোন শায়া বা ব্লাউজের ব্যবহার নেই। ফোতায় ঢাকা অংশ

ছাড়া শরীরের বাকী অংশ অনাবৃতই থাকে। মেয়েদের মধ্যে জুতোর ব্যবহার নেই, নেই কোন পর্দা বা বোরখার ব্যবহারও।

আর্থিক অবস্থা : রাজবংশীরা মূলতঃ কৃষিজীবী। প্রায় প্রত্যেকেই জোতদারের জমিতে চাষাবাদ করে, অল্প কয়েক জনের নিজস্ব জমি আছে। সকালে মুড়ি, চিঁড়ে কিংবা পান্তা ভাত খেয়ে মাঠে যায়, দুপুরে বাড়ীতে আসে স্নানাহার করতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার মাঠে যায়, কাজ চলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

কৃষিকাজ ছাড়া অন্য যে সব বৃত্তিতে রাজবংশীবা নিয়োজিত, তার মধ্যে মাছ ধবা, তাঁত বোনা, চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদি। সুতো, পশম ও তসর দিয়ে নানা ধরনের বস্ত্র তৈরী হয়, বিশেষতঃ 'ফোতা', 'গিলাপ', 'পাটানী', 'উড়নী', 'ঢোকরা'—পাটের তৈরী এক ধরনের শীত বস্ত্র।

জীবন যাত্রার অঙ্গ হিসাবে পশুপালন ও হাতীধরা রাজবংশী পুরুষদের অন্যতম আদর্শ বৃত্তি। গরু ও মোষের দুধ পান করা ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রী করাও অন্যতম জীবিকা। মোষ নিয়ে বাথানে যাওয়া বা 'অরোণা' (বুনো বা অরণ্যচারী) মোষ ধরে তার প্রতিপালন এবং 'জোঙ্গলিয়া হাতী' (বুনো হাতী) ধবা ও তাকে পোষ মানানো রাজবংশী পুরুষদের কাছে এক রোমাঞ্চকর বৃত্তি। এই সব মৈষাল ও মাহুতরাই রাজবংশী রমণীর কামনার ধন ; স্বপ্নের নায়ক।

কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলার নদী-সমূহ এক সময়ে জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত, ফলে এইসব নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল নানা বন্দর। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে বা শহরে মাল নিয়ে গরু ও মোষের গাড়ীতে পণ্য পরিবহণের কাজে নিযুক্ত ছিল 'গাড়ীয়াল'। আবার এই সকল নদীতে নৌকা চালনার বৃত্তিতে নিয়োজিত হত 'নাইয়া' বা মাঝি। তৎকালীন উত্তরবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন 'সউদ' বা সওদাগর, গরু চরানোর বৃত্তিতে নিযুক্ত 'আখোয়াল' বা রাখাল, ছাগল চরানোর কাজে নিযুক্ত 'ছাগল চরুয়া', মাছ ধরার বৃত্তি গ্রহণকারী মাচুয়া বা জেলে, চাষবাদে নিযুক্ত 'হালুয়া' বা চাষী, কাঁধে করে মাল পরিবহণের কাজে নিযুক্ত 'ভারী', ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যাপারী বা বানিয়া ছাড়াও সেনা বাহিনীতে নিযুক্ত সিপাই, চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত বৈদ বা কবিরাজ সকলেই রাজবংশী সমাজের অর্থনীতিতে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু যান্ত্রিক প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে আর প্রাকৃতিক প্রতিবেশের আমূল পরিবর্তনের ফলে এককালের আর্থিক অবস্থার বর্তমানে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে।

টোটো, পালিয়া, তিয়র, কুড়িসর্জন, মোরাঙ্গিয়া প্রভৃতি উপজাতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ রাজবংশীদের সঙ্গে হয় একাত্ম হয়ে গেছে অথবা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি গড়ে তুলেছে। কোচবিহারের প্রায় ৫০ হাজার রাভা বসতি গড়েছে আসামের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় এবং ভুটানের পার্বত্য এলাকায়। এর ফলে উত্তরবঙ্গে বর্তমানে মূলতঃ দুটি জনগোষ্ঠীরই প্রাধান্য, প্রথমতঃ রাজবংশী জাতি এবং অন্য জনগোষ্ঠী হিসাবে ভারত ভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু বাঙালী জাতি। এছাড়া দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়ী এলাকায়, বিশেষ করে চা বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আগত আদিবাসীও উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। •স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের সার্বিক জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে রাজবংশীদেরই প্রাধান্য, কারণ তারাই মূলতঃ এতদঞ্চলের আদিবাসী। আর রাজবংশীদের জীবন সঙ্গীত হল ভাওয়াইয়া ও চটকা। সেই কারণে রাজবংশীদের জীবনযাত্রার উপর সাধারণভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

পোষাক-পরিচ্ছদ ঃ সাধারণতঃ রাজবংশী পুরুষের পোষাক নেঙটি, সেই সঙ্গে কোমর থেকে সামনের দিকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঝোলে একহাত লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড বস্ত্র। শীতে পায়ে থাকে খড়ম আর গায়ে বস্ত্রখণ্ড 'গিলাপ'। এই গিলাপ এখন সুতোর তৈরী হলেও আগে মোটা সিল্ক বা তসরের তৈরী হত। তাদের বাকী শরীরে কোন বস্ত্র নেই, খালি পা, কেবল কোন উৎসবে যাওয়ার সময় বয়োজ্যেষ্ঠরা জুতো পরতেন। রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য মাথায় থাকে 'মাথাল'—বাঁশপাতা আর বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী অনেকটা শোলার টুপির মত, যা পূর্ববঙ্গের চাষীদের মাথায় দেওয়া 'টোকা'র মত। এতে কেবল মাথাই ঢাকে শরীরের বাকী অংশ থাকে অনাবৃত। রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি অঞ্চলে এইজন্য ব্যবহৃত হয় 'ঝাঁপি'—যা মাথা থেকে শরীরের পিছনের অনেকটা অংশই ঢাকতে পারে। কোন উৎসবে বা অন্য কোথাও যাওয়ার সময়েই কেবল পুরুষেরা ধুতি ও জামা ব্যবহার করেন। সাজি মাটি বা কলাগাছের খোল পুড়িয়ে তৈরী ক্ষারে জামা কাপড় কাচা হয়, তবে ইস্তিরি করার কোন ব্যাপার নেই।

রাজবংশী মেয়েদের পোষাক রঙীন চাদরের মাপের ৫ হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া কাপড়, যাকে বলে 'ফোতা'। বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে এই 'ফোতায়', কোন শায়া বা ব্লাউজের ব্যবহার নেই। ফোতায় ঢাকা অংশ

ছাড়া শরীরের বাকী অংশ অনাবৃতই থাকে। মেয়েদের মধ্যে জুতোর ব্যবহার নেই, নেই কোন পর্দা বা বোরখার ব্যবহারও।

আর্থিক অবস্থা: রাজবংশীরা মূলতঃ কৃষিজীবী। প্রায় প্রত্যেকেই জোতদারের জমিতে চাষাবাদ করে, অল্প কয়েক জনের নিজস্ব জমি আছে। সকালে মুড়ি, চিঁড়ে কিংবা পান্তা ভাত খেয়ে মাঠে যায়, দুপুরে বাড়ীতে আসে স্নানাহার করতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার মাঠে যায়, কাজ চলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

কৃষিকাজ ছাড়া অন্য যে সব বৃত্তিতে রাজবংশীরা নিয়োজিত, তার মধ্যে মাছ ধরা, তাঁত বোনা, চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদি। সুতো, পশম ও তসর দিয়ে নানা ধরনের বস্ত্র তৈরী হয়, বিশেষতঃ 'ফোতা', 'গিলাপ', 'পাটানী', 'উড়নী', 'ঢোকরা'—পাটের তৈরী এক ধরনের শীত বস্ত্র।

জীবন যাত্রার অঙ্গ হিসাবে পশুপালন ও হাতীধরা রাজবংশী পুরুষদের অন্যতম আদর্শ বৃত্তি। গরু ও মোষের দুধ পান করা ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রী করাও অন্যতম জীবিকা। মোষ নিয়ে বাথানে যাওয়া বা 'অরোণা' (বুনো বা অরণ্যচারী) মোষ ধরে তার প্রতিপালন এবং 'জোঙ্গলিয়া হাতী' (বুনো হাতী) ধরা ও তাকে পোষ মানানো রাজবংশী পুরুষদের কাছে এক রোমাঞ্চকর বৃত্তি। এই সব মৈষাল ও মাহুতরাই রাজবংশী রমণীর কামনার ধন ; স্বপ্নের নায়ক।

কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলার নদী-সমূহ এক সময়ে জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত, ফলে এইসব নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল নানা বন্দর। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে বা শহরে মাল নিয়ে গরু ও মোষের গাড়ীতে পণ্য পরিবহণের কাজে নিযুক্ত ছিল 'গাড়ীয়াল'। আবার এই সকল নদীতে নৌকা চালনার বৃত্তিতে নিয়োজিত হত 'নাইয়া' বা মাঝি। তৎকালীন উত্তরবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন 'সউদ' বা সওদাগর, গরু চরানোর বৃত্তিতে নিযুক্ত 'আখোয়াল' বা রাখাল, ছাগল চরানোর কাজে নিযুক্ত 'ছাগল চরুয়া', মাছ ধরার বৃত্তি গ্রহণকারী মাছুয়া বা জেলে, চাষবাদে নিযুক্ত 'হালুয়া' বা চাষী, কাঁধে করে মাল পরিবহণের কাজে নিযুক্ত 'ভারী', ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যাপারী বা বানিয়া ছাড়াও সেনা বাহিনীতে নিযুক্ত সিপাই, চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত বৈদ বা কবিরাজ সকলেই রাজবংশী সমাজের অর্থনীতিতে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু যান্ত্রিক প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে আর প্রাকৃতিক প্রতিবেশের আমূল পরিবর্তনের ফলে এককালের আর্থিক অবস্থার বর্তমানে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে।

গ্রাম ব্যবস্থা : পূর্ব বা দক্ষিণবঙ্গের ন্যায় গ্রাম ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে গড়ে ওঠেনি। প্রথম অবস্থায় যে দু একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল তা কেবল থানা বা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরকে ঘিরেই। রাজবংশীদের বাড়ী তৈরীর বিশেষত্ব হল জমির মাঝখানে বাড়ী এবং তার চারপাশে চাষের জমি। জোতদারদের বাড়ীও তৈরী হত, অনুরূপভাবে। ফলে বাড়ীগুলির চারপাশে চাষের জমি, জোতদারের যারা 'আধিয়ার' অর্থাৎ ভূমিহীন চাষী তারাও জোতদারের জমিতেই বাড়ী তৈরী করতো জোতদারের টাকায়, ফলে এই বাড়ীতে আধিয়ারের কোন স্বত্ব ছিলনা, আধিয়ার বদল হলে নতুন আধিয়ার দখল করতো পুরনো আধিয়ারের বাড়ী। রাজবংশী গ্রাম বলতে দেখা যায় কতকগুলি বাড়ীর সমষ্টি। এই রকম ২০/২৫ টি বাড়ীর সমষ্টিকে বলা হয় 'চাতাল', 'চাতর' বা 'টারি' আর ১০০/১৫০ টি চাতাল বা টারি নিয়েই এক একটি গ্রাম। গ্রামের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না, পাশাপাশি কতকগুলি চাতালের জমির আলপথই গ্রামের সীমানা চিহ্নিত করত। এই সীমানা পরিবর্তিত হত জোতদারের জমি বৃদ্ধি বা হ্রাস অনুযায়ী।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি প্রথমাবস্থায় ঘনবসতি পূর্ণ ছিল না। বিভিন্ন সময়ে যে রাজা বা সামন্ততান্ত্রিক প্রধান যতটা জমিতে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তা দিয়েই নির্ধারিত হত রাজ্যের সীমা। অধিকৃত অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক প্রধান তাঁর নিজের লোকজনদের দিয়ে গড়ে তুলতেন বসতি, ফলে, উদ্দিষ্ট এলাকার পূর্বতন অধিবাসীরা হয় নিজেদের বসতি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত, অথবা নতুন বিজয়ী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত, ফলে বিজিত জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যই লোপ পেত, এবং সেই অঞ্চলে গড়ে উঠত নতুন জনগোষ্ঠীর বসতি। ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে চা ও কাঠের ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে নানা স্থান থেকে শ্রমিক আমদানী করেছে, বিভিন্ন প্রজাতির। কালক্রমে সেই শ্রমিকেরা তাদের কর্মক্ষেত্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের জমি দখল করে বসতি স্থাপনের ফলে প্রায়ই সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসীরা হয়েছে বিতাড়িত, সৃষ্টি হয়েছে নতুন জনগোষ্ঠীর বসতি। এই ভাবে অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরাও, লোধা ও বিহারী শ্রমিকেরা আধিপত্য বিস্তার করেছে চা ও কাঠের শিল্পাঞ্চলে বিশেষ করে ডুয়ার্স ও তরাই এলাকায়, ফলে কৃষিজীবী হওয়ায় এতদঞ্চলের আদিবাসী অর্থাৎ রাজবংশী, মেচ, রাভা তিয়র, পালিয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে তাদের নিজস্ব এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গড়ে তুলেছে নতুন বসতি।

অবশ্য বর্তমানে রাজন্য প্রথার বিলোপ, জমিদারী স্বত্বলোপ এবং রাজনৈতিক ভাঙাগড়ায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের উত্তরবঙ্গে নতুন উপনিবেশ স্থাপনের তাগিদ এবং সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি, মালদহ কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার সদর এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের জনবসতির পরিমান ও সার্বিক বৈচিত্র্যের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ফলে রাজবংশী সমাজের প্রাচীন গ্রাম ব্যবস্থার অস্তিত্ব আর নেই। পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তু ছাড়াও স্বাধীনোত্তর ভারতে আসামে বসবাসকারী বেশ কিছু বাঙালী পরিবার আসামের 'বংগালী খেদাও' আন্দোলনের শিকার হয়ে উত্তরবঙ্গে নতুন বসতি স্থাপনে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান বাঙলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা পশ্চিমদিনাজপুর ও কোচবিহারে সম্প্রতি নতুন করে বসতি স্থাপন করছে কিছু সংখ্যক 'চাকমা' সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া বাণিজ্য-সফল এলাকা হিসাবেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলেছে বিভিন্ন প্রদেশের জনগোষ্ঠী।

উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও সংস্কৃতিতে এই ব্যাপক অভিবাসন বা পুনর্বসতি এক প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন সময়ে আসা নানা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ভিন্নমুখী জীবনধারা ও কৃষ্টি স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন ধারার চিরাচরিত ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়, ফলে এতদঞ্চলে বহিরাগত সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সহাবস্থান একই সঙ্গে ঘটেছে। স্বভাবতই রাজবংশী জীবনধারা তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পারছে না, তাকে নব্য সংস্কৃতি তথা মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হতে হচ্ছে। এককালের জন বিরল উত্তরবঙ্গের বর্তমান লোকসংখ্যা ১.২০.৪৯,৯৩০

দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪১ সালে লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২,৯০,৭১২ (**Census of India 1951 : General population** প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী) অর্থাৎ ৫০ বছরে লোক সংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় চারগুণ। স্বভাবতই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে যেমন ভেঙে পড়েছে প্রাচীন গ্রাম ব্যবস্থা, তেমনি নব্য ও মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে রাজবংশী সংস্কৃতিতেও হয়েছে দ্রুততর পরিবর্তন।

নদ-নদী : উত্তরবঙ্গে নদ ও নদীর প্রাচুর্য। অধিকাংশ নদীই ভুটান, সিকিম ও তিব্বতের পাহাড় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে উত্তরবঙ্গের জেলা সমূহের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসায় অধিকাংশ নদীই

খরস্রোতা। বর্ষাকালে নদীর দুকূল প্লাবিত হলেও শীতকালে এই সব নদীর অধিকাংশেই চড়া পড়ে, সেখানে উর্বরা পলিমাটির পরিবর্তে গড়ে ওঠে বিস্তীর্ণ বালুকাময় অঞ্চল, সেখানে জন্মায় শুধু ঘাস আর আগাছার জঙ্গল। উত্তরবঙ্গের নিম্নাংশে এর ফলে গড়ে উঠেছে 'দোলা' অঞ্চল—অর্থাৎ নীচু আগাছাপূর্ণ জমি, যা গোরু মোষ চরানোর পক্ষে উপযুক্ত। এই দোলা অঞ্চলের আশে পাশেই গড়ে ওঠে 'বাতান' বা বাথান। উত্তরবঙ্গের নদী তাই রাজবংশী সমাজকে কৃষিনির্ভর না করে বাথান নির্ভর করে তুলেছে। নদীর প্রাচুর্য থাকায় বিভিন্ন বাণিজ্যপোত চলাচলের কারণে এক সময় বন্দর গড়ে উঠলেও নদীর খরস্রোতা চরিত্রের ফলে এবং প্রায়শই গতিপথ পরিবর্তনের ফলে অধিকাংশ বন্দরের বিলুপ্তি ঘটেছে। নদী পথের জন্য এক সময়ে রাজবংশী জনজীবনে নাইয়া বা মাঝি বৃত্তির ছিল সহজাত বিকাশ কালক্রমে তারও অবলুপ্তি ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের জেলা সমূহের উপর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কয়টি নদী প্রবহমান তার মধ্যে রয়েছে মহানন্দা, করতোয়া, তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, রায়ডাক, ধরলা, সংকোশ, মেচি, বালাসোন, কালজানী, আত্রাই বা আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, ট্যাঙ্গন, কালিন্দী ও গঙ্গা প্রভৃতি।

মৃত্তিকা : উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ কৃষিজীবী হলেও, প্রকৃতি এতদঞ্চলে কৃষির পক্ষে সহায়ক হয়নি। পাহাড়ের বালি ও পাথর বাহিত নদী যেমন এখানে পলিমাটি ফেলে জমিকে উর্বরা করেনা, তেমনি এতদঞ্চলের অত্যধিক বৃষ্টিপাতও কৃষির পক্ষে সহায়ক নয়। নদীর প্লাবনে জমিতে যে সামান্য পলিমাটি জমা হয়, মুষলধারে বৃষ্টিপাতে তা ধুয়ে নদী উপকূল পরিণত হয় বালুকাময় ও কঙ্করযুক্ত রুক্ষ আগাছাপূর্ণ দোলা জমিতে। এই অনুর্বর জমিতে যে সামান্য চাষাবাদ হয়, সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তাও যায় শুকিয়ে, স্বভাবতই কৃষি প্রধান জীবিকা হলেও উত্তরবঙ্গের কৃষককে ফসল ফলাতে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়। যদিও অনুর্বর জমিতে বর্তমানে আধুনিক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফসল ফলানো হচ্ছে। মালদহ জেলার মৃত্তিকা অবশ্য তুলনামূলক ভাবে কৃষির উপযোগী। এই জেলায় আম ফলনের জন্য বিখ্যাত হলেও ধান, পাট, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈলবীজও যথেষ্ট উৎপন্ন হয় এবং এখানে হয় 'রেশম পোকা' পালনের জন্য প্রচুর তুঁত গাছের চাষ।

প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াবে না এমন মৃত্তিকা চা গাছ উৎপন্নের উপযুক্ত। একারণে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচ-

বিহার জেলার কিছু অংশে চা উৎপাদন অন্যতম কৃষিপণ্য। ছোট ছোট টিলা অঞ্চল থাকায় এইসব জেলায় চা উৎপাদন হয় প্রচুর, কিন্তু সার্বিকভাবে চা উৎপাদন কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এরজন্য শ্রমিক আমদানী করা হয় রাজবংশী ভিন্ন অন্য জাতিদের থেকে।

জলবায়ুঃ উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের জলবায়ু কিয়দংশে চরম ভাবাপন্ন। এই অঞ্চলে মূলতঃ তিনটি ঋতুরই প্রাধান্য, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকাল। মৃত্তিকা সাধারণতঃ বালুকাযুক্ত কঙ্করময় হওয়ায় গ্রীষ্মের দাপট যেমন প্রখর, পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত বলে বৃষ্টিপাতেরও প্রাবল্য। উত্তরে হিমালয়ের শৈত্য প্রবাহে শীতের প্রকোপও প্রচণ্ড। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা বাদ দিলেও জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমান দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির তুলনায় অধিক। কোচবিহার জেলায় বছরে গড়ে ১০২ দিনই বৃষ্টি হয়, পুনরায় শীতকালে তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াসের নীচে নামে। অবশ্য এই চরম জলবায়ুর প্রভাবে কোচবিহার জেলা তামাক পাতা চাষের উপযোগী। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা বাগিচা প্রসার লাভ করেছে, এছাড়া এই দুই জেলায় আনারস ও কমলা-লেবুও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতির বিষম জলবায়ুতে অভ্যস্থ হওয়ায় এতদঞ্চলের আদিবাসীরাও কঠোরে কোমলে গড়া। একদিকে এরা যেমন পরিশ্রমী—কারণ প্রকৃতির কৃপণতায় কৃষিকাজ অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ, অন্যদিকে প্রকৃতির অরণ্যচারী হাতী ও মোষ ধরা এবং সেগুলিকে পোষ মানানোর মত দুঃসাহসিক জীবন-যাত্রায় রাজবংশী পুরুষের আত্মনিয়োগ, খরস্রোতা নদীতে নৌকা সামলে চলার মত কঠোর পরিশ্রমে অভ্যাস হওয়ায় এদের শরীরে যেমন কঠোরতার ছাপ পড়ে, তেমনি অন্যদিকে উদার অকপট প্রকৃতির কোলে মানুষ হওয়ায় রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসীরা অত্যন্ত উদার ও খোলা মনের মানুষ। এদের জীবন প্রকৃতি-নির্ভর হওয়ায় নাগরিক কলুষতায় এদের মনকে আবিল করেনি, প্রকৃতির আহরিত সম্পদেই এরা তুষ্ট হয়েছে।

কিন্তু দিনের পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে জীবনযাত্রার চাহিদা, যান্ত্রিক সভ্যতার জটিল মানসিকতা তাই ক্রমে ক্রমে প্রভাবিত করছে রাজবংশী সমাজের নতুন প্রজন্মকে। যে সহজ সরল জীবনযাত্রায় একদিন রাজবংশী সমাজ অভ্যস্থ ছিল তারা এখন যুগের হাওয়ায় নব্য সংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে চলেছে, উত্তরবঙ্গের খরস্রোতা নদীর মত এই নব্য সংস্কৃতি অতীত ঐতিহ্যকে ভেঙে

জন্ম দিতে চলেছে নতুন সংস্কৃতির, সম্ভাবনার পথ দেখাচ্ছে নবজীবনের, সেই জীবনে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা তৎকালীন রাজবংশী জীবনধারা, এক বৃহত্তর মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে সেও একদিন একাত্ম হয়ে যাবে।

৩ উত্তরবঙ্গের আদি ভাষা :

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আদি ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে প্রয়োজন এতদঞ্চলের জনবিন্যাসের পর্যালোচনা। কারণ কোন এলাকার জনবিন্যাসের ধারণাই সেই অঞ্চলের বাচকগোষ্ঠীর পরিচয় নির্ণয়ে সহায়ক। জনবিন্যাসের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জাতির মধ্যে রাজবংশী জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য উপজাতির মধ্যে রয়েছে পালিয়া, বেলদার, ভুঁইমালি, দোসাদ, মাল, মুশাহার, নুনিয়া, তিয়র প্রভৃতি। এছাড়া সংখ্যায় অল্প হলেও খেণ, কুড়িসর্জন, মোরাঙ্গিয়া, মেচ, রাভা, গারো, টোটো প্রভৃতি উপজাতিও এতদঞ্চলের আদিবাসী। কালক্রমে রাজনৈতিক উত্থান পতন আর ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে এই জনবিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে যেমন ভারত ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য বাঙালী হিন্দু পরিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জনবসতি গড়েছে, তেমনি আবার বাণিজ্যের প্রসার, বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় চা বাগিচা এবং কোচবিহার ও পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় তামাক পাতা চাষের ফলে ভিন্ন রাজ্য থেকেও শ্রমিক এসে বসবাস শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। স্বভাবতই এতদঞ্চলের আদি বা মূল ভাষা একটা হলেও সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি ভাষারও প্রচলন রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে মূলতঃ দুটি ধারা, একভাগ মঙ্গোলীয়, অন্যটি আদি অস্ট্রলয়েড বা আদি অস্ত্রাল। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম উপজাতি ভুটিয়া, এঁদের ভাষা ভুটিয়া বা তিব্বতি ভাষার পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষা। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্যান্য উপজাতি হল ঃ—

লেপচা—এঁদের ভাষা ভোট চীনীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত লেপচা বা 'রং' ভাষা। তবে এঁদের উপর বর্তমানে নেপালী ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাভা—রাভাদের দুটি বিভাগ—সমাজবন্ধ আর অরণ্যচারী। অরণ্যচারী রাভা সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব রাভা ভাষায় কথা বলেন কিন্তু সমাজবন্ধ রাভা সম্প্রদায়ের ভাষা বাংলার উপভাষা রাজবংশী ভাষা। অবশ্য আসামে যাঁরা বসতি স্থাপন করেছেন তাঁদের অধিকাংশই 'অহমিয়া' ভাষায় কথা বলেন।

মেচ—এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অংশে বাস করেন; অন্যরা দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলার অধিবাসী। এঁদের ভাষা ভোট-চীনীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত মেচ বা বোড়ো, তবে এঁরাও রাজবংশী ভাষায় কথা বলেন।

গারো—কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার এই সম্প্রদায়ের মূলভাষা ভোট-বর্মী বর্গের, গারো ভাষা। অবশ্য এঁরাও রাজবংশী ভাষায় কথা বলেন।

টোটো—জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট অঞ্চলে এঁরা 'টোটোপাড়া' নামে এক স্বতন্ত্র বসতি স্থাপন করেছেন, এঁদের ভাষাও ভোট চীনীয়বর্গের 'টোটো' উপভাষা। মঙ্গোলীয় জাতিবর্গের মধ্যে কোচ, রাজবংশী ছাড়াও উত্তরবঙ্গে বসতি রয়েছে বাঙালীদেরও। আর রয়েছে চা-শিল্প মালিকদের মধ্য-ভারত ও বিহার থেকে আনা আদি অস্ট্রেলয়েড গোষ্ঠীর উপজাতির বাস। এঁদের মধ্যে আছে, মুণ্ডা। এঁদের মূল ভাষা মুণ্ডারি হলেও খুব অল্প সংখ্যকই মুণ্ডারি ভাষায় কথা বলেন, বরং চা-বাগিচা এলাকায় নিজেদের মধ্যেও বাংলা হিন্দী ও মুণ্ডারি ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট 'সাদ্রি' ভাষায় কথা বলেন।

নাগেসিয়া—এঁরাও সাদরি ভাষায় কথা বলেন, যদিও এঁদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।

সাঁওতাল—এঁরা বর্ধমান, বীরভূম বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী এবং মূল ভাষা সাঁওতালী বা কুরুখ। তবে এঁরা মিশ্র বাংলাতেও কথা বলেন।

মাহালি ও কোড়া—এঁদের আদিভাষা মুণ্ডারি বা কুরুখ হলেও এঁরা মিশ্রবাংলায় কথা বলেন।

"আদি অস্ত্রাল ছাড়া দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দুটি উপজাতি উত্তরবঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিদ্যমান : (১) ওরাঁও : উত্তরবঙ্গে এঁরা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার চা-বাগান এলাকায় সন্নিবিষ্ট। এঁদের আদি মাতৃভাষা 'কুরুখ' দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবে এঁরা বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলা ও সাদরি এবং অন্যান্য উপজাতির লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় সাদরি ভাষা ব্যবহার করেন। (২) মাল-পাহাড়িয়া : উত্তরবঙ্গে এঁরা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি, :মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলায় উপনিবিষ্ট। * * * এঁদের আদি মাতৃভাষা 'মালতো' দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।"[২]

বিভিন্ন আদিবাসী ও উপজাতি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি থেকে প্রভূত পরিমানে বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারে পুষ্ট হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গে

'বঙালী খেদাও' আন্দোলনের ফলে আসাম থেকে উৎখাত বহু বাঙালী পরিবারও উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করেছেন। আন্দোলনে যেমন বহু-সংখ্যক বাঙালী পরিবার আসাম থেকে উত্তরবঙ্গে এসেছেন, তেমনি বেশ কিছু পরিমানে নেপালী-ভাষীও উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বসতি স্থাপন করেছেন।

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে পূর্বপাকিস্তানাগত বাঙালী পরিবার এবং আসামের বাঙালী পরিবারের উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করা ছাড়াও ব্যবসা এবং চাকুরী সূত্রে বিভিন্ন ভাষা ভাষীর লোক বিভিন্ন প্রদেশ থেকে উত্তরবঙ্গে এসে বসতি করেছে। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশ—ভাষা তেলেগু, আসাম—ভাষা অহমিয়া, গুজরাত—ভাষা গুজরাতী, জম্মু ও কাশ্মীর—ভাষা কাশ্মিরী, কেরালা—ভাষা মালয়ালম, তামিলনাড়ু—ভাষা তামিল, মহারাষ্ট্র—ভাষা মারাঠি, কর্ণাটক—ভাষা কন্নড়, উড়িষ্যা—ভাষা ওড়িয়া, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ—ভাষা হিন্দী, পাঞ্জাব—ভাষা পাঞ্জাবী, এছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল থেকে নেপালী ভাষা, তিব্বত থেকে তিব্বতি এবং ভুটান থেকে ভোট বা ভুটানীজ ভাষার বহু লোকই উত্তরবঙ্গে স্থায়ী বা অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছে।

স্বভাবতই বিভিন্ন ভাষাভাষীর জনসংখ্যা থাকায়, উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ভাষারই প্রচলন রয়েছে। ভাষাভিত্তিক বিশ্লেষণে চারটি মূলভাষা গোষ্ঠী যেমন আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়—প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীরই অস্তিত্ব রয়েছে উত্তরবঙ্গে। তবে মূলতঃ যে ভাষা এতদঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, তা বাংলা ভাষারই উপভাষা যাকে কেউ বলেছেন রাজবংশী ভাষা, কেউ অভিহিত করেছেন কামরূপী ভাষা বলে আবার কারো মতে তা কামতাপুরী বা কামতাবিহারী ভাষা। পরবর্তীকালে এই রাজবংশী ভাষারই রূপান্তর ঘটেছে বাংলা ভাষার বরেন্দ্রী ও পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে। প্রথম দিকের যেসব বাঙালী পরিবার দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে বসবাস করছেন তাঁরা বরেন্দ্রীয় বা রাঢ়বাংলার সঙ্গে রাজবংশী ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন আর পরবর্তী অধ্যায়ে দেশভাগের পর যে সব বাঙালী পূর্বপাকিস্তান থেকে উত্তরবঙ্গে এসেছেন তাঁরা বরেন্দ্রী ও রাজবংশী ভাষার সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় বাংলা উপভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এঁরা নিজেদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় কথ্য বাংলা ব্যবহার করলেও সর্বজন সমক্ষে মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। এই মিশ্রিত বাংলা ভাষার সঙ্গে অবশ্য দক্ষিণবঙ্গের প্রচলিত বাংলা ভাষার সামান্য

প্রভেদ রয়েছে। যদিও সমগ্র উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ভাষা বা কামরূপী ভাষারই প্রাধান্য। এই রাজবংশী ভাষা শুধু উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই এর ব্যাপ্তি উত্তরবঙ্গের বাইরে যেমন আসামের গোয়ালপাড়া, গৌরীপুর, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়, এমনকি বহির্ভারতের বাঙলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর ও মৈমনসিংহ জেলাতেও প্রসারিত। স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের ভাষা বললে এমন ভাষাকে বোঝায় যার সার্বজনীন আবেদন রয়েছে এবং এই ভাষায় যাঁরা কথা বলেন তাঁরা কেবল উত্তরবঙ্গের সীমানাতেই আবদ্ধ নন, উত্তরবঙ্গের বাইরেও এই ভাষার প্রচলন রয়েছে।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠের এই ভাষার নামকরণ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ভাষার নামকরণে অধ্যাপক গ্রীয়ারসন বলেন, **"The dialect is usually known as Rajbangsi, from the tribe of that name already alluded to. It is also frequently called Rangpuri from one of the districts in which it is spoken."**[২] অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে বলেছেন 'কামরূপী উপভাষা' (ODBL. 1926)। অধ্যাপক সুকুমার সেনও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন (বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৩৯)।

অন্যদিকে তৎকালীন কামতাবিহার সাম্রাজ্যের প্রচলিত ভাষা হিসাবে কেউ কেউ একে কামতাবিহারী ভাষা বলেও উল্লেখ করেছেন। "খেণ বংশীয় শেষরাজা নীলাম্বর সমগ্র গোয়ালপাড়া, কামরূপের অধিকাংশ এবং রঙ্গপুর, কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর পর্যন্ত স্বীয় রাজত্বের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজধানী কামতাপুরীর (অধুনা গোসানীমারী) ভগ্নাবশেষ হিন্দু রাজত্বের শেষ নিদর্শন রূপে হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্পের অতুলনীয় গৌরব কীর্তি বক্ষে ধারণ পূর্বক বর্তমান কোচবিহার রাজধানীর ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রশান্ত সলিলা ধরলা নদীর বামতীরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে যে কথ্যভাষা প্রচলিত ছিল, বর্তমান কোচ বা রাজবংশী ভাষা তাহারই পরিমার্জিত সংস্করণ। এরূপ অবস্থায় এই ভাষাকে কোচ বা রাজবংশী এই জাতিগত সঙ্কীর্ণ আখ্যার পরিবর্তে প্রাচীন সেন (খেণ) ও আধুনিক কোচ রাজত্বের নামানুসারে কামতাবিহারী ভাষা নামে অভিহিত করাই যেন অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।"[৩]

অবশ্য স্থানের বিচারে ভাষার নামকরণে অতিব্যাপ্তি দোষের শিকার হতে হয়। কারণ রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকারও বিচ্যুতি

বা সঙ্কুচন হয়। এছাড়া কামতাবিহারী অঞ্চলে রাজবংশী ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাভাষীর জনবসতি ছিল প্রথম থেকেই সেই কারণে সকলের ভাষাকে একীকরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। অন্যভাবে এই ভাষাকে কামরূপী ভাষা বলাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়, কারণ কামরূপ এলাকা বলতে বর্তমান আসাম অঞ্চলকেই বোঝায় এবং সেখানকার জনবসতি মূলত অহমিয়া ভাষাভাষী। অন্যদিকে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরেও এই ভাষার প্রচলন ছিল, স্বভাবতই রাজবংশী ভাষাকে কামতাবিহারী বা কামরূপী ভাষা বলার চেয়ে এই ভাষার অধিকাংশ জনসংখ্যার নামানুসারে রাজবংশী ভাষা বলাই যুক্তিযুক্ত ও সহজ বোধগম্য। যে হিসাবে বাঙালীর ভাষা বাংলা, ওড়িয়াদের ভাষা ওড়িয়া, অহমিয়াদের ভাষা অহমিয়া, সেই হিসাবেই রাজবংশীদের ভাষাকে রাজবংশী ভাষা বলাই শ্রেয়।

রাজবংশী ভাষার গঠনপ্রণালী সম্পর্কে বলা হয়, "কোচ রাজবংশের অভ্যুত্থানের পূর্বে যথাক্রমে পাল ও সেন রাজবংশীয় ভূপালগণ এ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। পালবংশীয় রাজন্যবৃন্দ প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সেইজন্য এ দেশের কথিত ভাষা পালি ভাষার যথেষ্ট সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। বলিতে কি পালি ভাষার অস্থি কঙ্কালের উপর প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতির রস-রক্ত-মেদ মজ্জার সংযোগে এ দেশের কথ্যমান ভাষার উদ্ভব বলা যাইতে পারে।"[৪]

বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও তার উচ্চারণ রাজবংশী ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন ভুটানের নিকটবর্তী অঞ্চলে সেখানকার আর্যেতর ভাষার প্রভাব; কোচবিহারের পূর্বাংশ অর্থাৎ আসাম সংলগ্ন অঞ্চলে কামরূপী ভাষার প্রভাব এবং বাঙলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার উচ্চারণের আঞ্চলিকতার প্রভাব পড়েছে পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় প্রচলিত রাজবংশী ভাষায়। পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কথ্যভাষার আবার কয়েকটি স্বতন্ত্র রূপ দেখা যায় আঞ্চলিকতা অনুযায়ী, যেমন ঃ

"ইসলামপুর মহকুমায় প্রচলিত লোকভাষা সাধারণভাবে 'কাইথী বাংলা' নামে পরিচিত। কেউ কেউ ঐ এলাকার সূর্যাপুর গ্রামের নাম অনুসারে সূর্যাপুরী আমে'র ন্যায় 'সূর্যাপুরী লোক ভাষা' নামকরণ করেছেন। কিন্তু মহাভারতের যুগে ঐ অঞ্চল অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় ইসলামপুর এলাকার লোকভাষা 'অঙ্গীয় উপভাষা' নামেই পরিচিত হওয়া সমীচীন।

"রায়গঞ্জ মহকুমা প্রাচীন পালিয়া রাজবংশী দেশী শ্রেণীর লোকগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল। এই অঞ্চলের লোকভাষা রঙে ও ঢঙে কোচ কামরূপী উপ-

ভাষার সমগোত্রীয়, এবং মহাভারতের যুগে এই অঞ্চল বিরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং রায়গঞ্জ অঞ্চলের লোকভাষা 'বিরাটী' বা 'উত্তরী উপ-ভাষা গোষ্ঠী'র অন্তর্ভুক্ত।

"আর বালুরঘাট মহকুমা মহাভারতের যুগে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ অঞ্চলের লোকভাষা 'কোটি বর্ষীয় উপভাষা' নামে পরিচিত।"[৫]

উচ্চারণ প্রকৃতির কারণে রাজবংশী ভাষাকে কেউ কেউ 'বাহে' ভাষা বলেও উল্লেখ করেন, এমনকি ঐতিহাসিক গ্রীয়ারসনও একে বাহে বিভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। "In the Darjeeling Tarai, the dialect is influenced by the neighbouring Bengali, and has a special name, as a subdia-lect, viz. Bahe."[৬] যদিও ভাষা সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের এটি অজ্ঞতা প্রসূত উক্তি, কারণ 'বাহে' কোন ভাষার নাম নয়, এটি একটি সম্বোধন সূচক শব্দ মাত্র। 'বাবাহে' কথার সংক্ষেপিত রূপ। ভোট চীনীয় ভাষায় 'বায়' শব্দের অর্থ দেবতা বা বন্ধু। আবার কোচ ভাষায় মধ্যমপুরুষে 'বায়' বা 'বাহে' যোগ করে সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। কোচ শব্দ 'বায়'+(তৎসম) হে (সম্বোধন সূচক অব্যয়) এইভাবে 'বাহে' শব্দটি গঠিত। "অন্যান্য অঞ্চলে অপরিচিত জনকে সম্বোধনকালে যেমন 'ওহে', 'ওগো' ইত্যাদি বলা হয়, তেমনি কোচ রাজ-বংশীয় ভাষায় পুরুষদের 'বাবাহে' এবং মেয়েদের 'মাওহে' বলে সম্বোধন করাই রীতি ও ভদ্রতাসূচক। তারই প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ 'বাহে' ও 'মাহে'।"[৭]

ভাষার উপর অন্যান্য ভাষার প্রভাব সত্ত্বেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সার্বজনীন-তার গুণে আজও রাজবংশী ভাষার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। অন্যান্য ভাষার প্রভাব পড়লেও রাজবংশী ভাষার কাঠামোগত পরিবর্তন খুব একটা হয়নি। এই কথ্য ভাষাকে লিখিত ভাষায় রূপান্তরের জন্য তৎকালীন কোচরাজন্যবর্গ মিথিলা ও আসাম বা তৎকালীন প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এনে-ছিলেন কোচবিহারে। স্বভাবতই রাজবংশী উপভাষাতে মৈথিলী ও অহমিয়া ভাষার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজবংশী ভাষা অহমিয়া ও মৈথিলী ভাষা থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই চলেছে।

রাজবংশী ভাষাতত্ত্ব[৮] **:** আঞ্চলিকতার প্রভাবে ভাষার ব্যতিক্রমী রূপ দেখা গেলেও রাজবংশী ভাষার মূল কাঠামোতে বাক্য গঠনের ও উচ্চারণের কতক-গুলি সাধারণ নিয়ম রয়েছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় এই বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে।

লিঙ্গ পরিবর্তন : সাধু ও চলতি বাংলা ভাষায় যে সব প্রত্যয় এবং

পদ্ধতিতে লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়, রাজবংশী ভাষায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না, তবে উচ্চারণ ও প্রয়োগের দিক থেকে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়।

ক) ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে লিঙ্গ নির্দেশ—আজু <সংস্কৃত আর্য) দাদু-বা ঠাকুরদা। আবো<সংস্কৃত অম্ব) দিদিমা বা ঠাকুমা। যেমন—'আবো নওদারীটা মরিয়া মোরছে হইসে হানি।'

খ) কয়েকটি শব্দের শেষে আ, ঈ প্রত্যয় যুক্ত হলেও সেগুলি পুংলিঙ্গ বাচক শব্দকেই বোঝায়। যেমন—নিদয়া (নির্দয়)। 'তুই মোর নিদয়া কালিয়ারে'।

গ) প্রত্যয় নিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দের লিঙ্গান্তরের রূপ ঃ

অনীয়া প্রত্যয় যোগে ঃ সাউদ—সাউদানীয়া। আনী প্রত্যয় যোগে ঃ গৃহস্থ>গিথানী। গৃহিনী অর্থে। নী প্রত্যয় যোগে ঃ কমবক্তা>কমবক্তানী। স্বর সঙ্গতিতে—কমবক্তিনী। হতভাগী স্ত্রী লোক অর্থে। ঈ প্রত্যয় যোগে ঃ হুদুমা>হুদুমী। হুদুমার স্ত্রী অর্থে।

বচন ঃ

ক) বহুবচন জ্ঞাপক যে সব প্রত্যয় সাধু ও চলিত বাংলা ভাষায় প্রচলিত তার মধ্যে 'এরা' (যেমন রামেরা) 'রা' (পাখিরা) এর প্রচলন ব্যক্তি নামের সংগে নেই। তবে 'রা' কখনও ইতর প্রাণীর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ছাগল>ছাগলীরা।

খ) 'গুলা'র প্রচলন সামান্য পাওয়া গেলেও 'গুলি'র প্রচলন একেবারেই নেই। 'গুলা' কখনও কখনও গিলা, গ্না, বা 'লা' প্রত্যয় হিসাবে ব্যক্তি, বস্তু ও ইতর প্রাণী, সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন—সতীনগুলা। 'আই মোর সতীনগুলা কয়, মুই বলে আন্দোন জানোঁ না।'

গিলা—চ্যাঙেড়াগিলা। 'আইতে যাইতে চ্যাঙেড়াগিলা দ্যাকে চায়া চায়া'।

গ্না—ইগ্না 'ইগ্না কাথা কননা, নেবা আগুন মোর জ্বালান না'।

লা—মানষিলা। মানুষগুলি অর্থে।

গ) প্রত্যয় ছাড়া বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ দিয়েও বহুবচন নির্দেশিত হয়। সাধু বাংলা ভাষার 'লোক' এবং 'সব' শব্দ দুটি এই উপভাষায় পাওয়া যায়। তবে এই উপভাষার ওষ্ঠ বর্ণের কণ্ঠ বর্ণ হওয়ার প্রবণতা বেশি। এর ফলে 'সব' শব্দটি হয় 'সগ' এবং আঞ্চলিক উচ্চারণের জন্য 'সগ' হয়ে যায় সউগ'। যেমন—'সউগ ফুল ফুটিলু রে মোর না ফুটিল মোর ব্যাল'। কখনও কখনও

ঘোষ ধ্বনি অঘোষ বর্ণে পরিণত হয়ে 'সগ' হয় সক্ বা 'সোগ্'। 'যত জ্ঞাতা সক্ আসিল আও দিয়া'।

নিশ্চয়ার্থে এবং ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপনে সকলের স্থলে হয় সগ্গার বা সগ্গারে। 'ওরে আগোত জনা চারেক পাছোত জনা চারেক সগ্গারে কানে কানে সনা।'

ঘ) রাজবংশী উপভাষায় বহুত্ব বাচক শব্দ 'ঘর'। এটি ব্যাক্তিবাচক এবং যে শব্দের পরে এটি ব্যবহৃত হয় সেই শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তি রূপের সঙ্গে 'ঘরের' ব্যবহার হয়। যেমন—হামার ঘর—আমরা। উয়ার ঘর—ওরা।

কারক ও বিভক্তি :

১। **কর্তৃকারক—প্রথমা বিভক্তি** ॥ বাংলায় সাধারণ ক্ষেত্রে কর্তৃকারক একবচনে যেমন কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না, এই উপভাষাতেও তদ্রূপ। যেমন—আম বাড়ী যাছে অর্থাৎ রাম বাড়ী যাচ্ছে।

কর্তা অনির্দিষ্ট হলে বাংলা ভাষায় এ, য়ে, য় ব্যবহৃত হয়, এই উপভাষাতে কর্তা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয় ক্ষেত্রেই এ, য়ে, য় প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—'রোজায় ঝাড়ে গুণিনে ঝাড়ে'।

গুলা, গিলা, লা এবং ঘর শব্দ দিয়েই এই উপভাষাতে বহুবচন নির্দেশিত হয়, তবে গিলা বা 'লা' র সঙ্গে 'য়' যুক্ত হয়। যেমন—চ্যাঙেড়াগিলায় যুক্তি করে।

২। **কর্তৃকারক—দ্বিতীয়া বিভক্তি :** সাধু ও চলতি বাংলা ভাষার ন্যায় আলোচ্য উপভাষাতেও বিভক্তি শূন্য কর্মপদ দেখা যায়। তবে এই উপভাষার বিশেষত্ব হল নির্দিষ্ট প্রাণীবাচক শব্দেও কর্মকারকের বিভক্তি কখনও কখনও অব্যাহত থাকে। যেমন—ক্যামনে দ্যাক্মো মা জননীরে। 'রে' এখানে বিভক্তি চিহ্ন নয়, সম্বোধন।

স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে কর্মকারক বোঝাতে কৃত<ক পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় এটির ব্যবহার হয় 'কে' রূপে। রাজবংশী উপভাষায় সমস্ত সর্বনামের সঙ্গেই 'ক' যুক্ত হয়। যেমন—মোক্—আমাকে। হামাক—আমাকে বা আমাদিগকে। তোক্—তোকে।

৩। **করণ কারক—তৃতীয়া বিভক্তি :**

বাংলা ভাষার তে, য়ে, য় এর ব্যবহার রাজবংশী উপভাষাতে অবিকৃত ও পরিবর্তিত উভয় রূপেই পাওয়া যায়। যেমন—

'তে 'ত' এর আকারে—'যে ভাসাত্ নাইয়ে কইতর কি করে তার খোপে'।

'য়ে' এর অপরিবর্তিত রূপ—সোমায়ে বান্দিচে টানি।

'য়' এর অপরিবর্তিত রূপ—সোনায় ঢালান্ চারি ঘাটো।

বাংলা ভাষার 'দ্বারা' এবং 'কর্তৃক' এই অনুসর্গ দুটির প্রয়োগ রাজবংশী উপভাষাতে নেই কিন্তু 'দিয়া' বা সংক্ষেপে 'দি' এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন—রামক দি বা রামের দ্বারা।

৪। সম্প্রদান কারক—চতুর্থী বিভক্তি :

বাংলা ভাষার চতুর্থী বিভক্তি 'কে' রাজবংশী উপভাষায় 'ক' হয়ে যায়, যেমন—'আই মোক্ ব্যাচেয়া খা হে খা'। উদ্দেশ্যমূলক সম্প্রদান কারকে বাংলায় যেখানে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়, এই উপভাষায় সেটিও 'ক' রূপে ব্যবহৃত। যেমন—'তিন কইন্যা জলোক যায়'।

৫। অপাদান কারক—পঞ্চমী বিভক্তি :

বাংলা ভাষার বিভক্তি স্থানীয় প্রত্যয় 'হইতে' বা 'হতে' 'থাকিয়া' বা 'থেকে' রাজবংশী উপভাষায় 'হাতে' রূপ নেয়। যেমন—'ভাটি হাতে আইলেন ভারী'।

৬। সম্বন্ধ পদ—ষষ্ঠী বিভক্তি :

সাধু ও চলিত বাংলা ভাষার ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'এর, য়ের, র' আলোচ্য উপভাষায় হলন্ত শব্দে 'অর' হয়ে যায়। স্বরান্ত শব্দ এবং কাব্যের ভাষায় অবশ্য এর, র—অবিকৃতই থাকে।

হলন্ত শব্দ : কোপালর নেকা—কপালের লেখা।

স্বরান্ত শব্দ : মানষির দ্যাকা পাঁও—মানুষের দেখা পাই।

কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির অকারণ প্রয়োগ এই উপভাষার এক বিশেষত্ব। সাধারণতঃ হলন্ত শব্দের সঙ্গে 'এর' এবং স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে 'র' যুক্ত হয়।

হলন্ত শব্দ : কতয় নোকে হলেক খুন

স্বরান্ত শব্দ : 'আইস্তে, আইস্তে, খসিয়া পইরবে ও তোর দোলান কোটা বাড়ীরে'।

৭। অধিকরণ কারক—সপ্তমী বিভক্তি :

বাংলা ভাষার অধিকরণ কারকের চিহ্ন 'তে, এতে' এই উপভাষাতে 'অত, ওত, ত, ততে' রূপ নিয়েছে। 'ত' কেবল স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, অন্যগুলি ব্যঞ্জনান্ত শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত।

হলন্ত শব্দে অত, ওত—সরকারের হাতোত না দ্যান বেটি

হলন্ত শব্দে ততে—আইততে আইস

স্বরান্ত শব্দে ত—দেহাত্‌ দিয়া ঠ্যাসা

ষষ্ঠী বিভক্তি থেকে আগত 'টে ঠে তি থি' প্রভৃতি অনুসর্গ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন—উয়ারঠে—ওর কাছে। ওইতি—ওইখানে। 'ওইতি'র হুত্তি বা হুথি রূপও পাওয়া যায়। যেমন—'হুত্তি থো তোর নাঙ্গল জোয়াল বারা বানেক আসিয়া'।

'টে ঠে, তি, থি' এর পরও স্থানবাচক ফার্সি 'খানা' যুক্ত হয়। যেমন—'কোণ্ঠেখানায় গেইলে এলা হুদুমার দ্যাকা পাওঁ'। আবার উচ্চারণ বিকৃতিতে 'খানা' কখনও 'কেনা' বা 'কোনা'তে পর্যবসিত হয়। যেমন—'মুককোনা তোর ডিব ডিব ও ভাউজী'।

ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ :

নিত্য বর্তমান

	একবচন	**বহুবচন**
উত্তম পুরুষ	মুই করোং/করোঁ/করু	হামরা/হামারঘর/হামারলা করোঁ
মধ্যম পুরুষ	সাধারণ—তুই করিস	তমরা/তোমরা করোঁ
	সম্ভ্রমার্থে—তমরা/ তোমরা করেন	তমরা/তমারঘর/তমারলা করেন
প্রথম পুরুষ	সাধারণ—তায় করে	তারঘর/তারলা করে
	সম্ভ্রমার্থে—তামরা করেন	তামরা/তামারঘর/তামারলা করেন

সাধারণ অতীতকাল

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	মুই করিনু/কনু/করিলোং	হামরা/হামারঘর/হামারলা/করিলো করলো/কল্লো
মধ্যম পুরুষ	সাধারণ—তুই করিলু/ কইল্লো/কল্লু	তমরা/তোমরা করিলু/করলু
	সম্ভ্রমার্থে—তোমরা/তমরা করিলেন/কইল্লেন	তোমরা/তমরা করিলেন/কইল্লেন
প্রথম পুরুষ	তায় করিলু/করিলেক/কইল্লেক	তারঘর করিলু/করিলেক

উত্তম পুরুষের একবচনে করিনু, করলু ইত্যাদির প্রচলন গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায়। মধ্যস্থিত-'র' লুপ্ত হয়ে 'কইনু'র ব্যবহার রয়েছে। যেমন, 'ধার করিয়া কইনু বিহো ওহোগে নোদারী'।

সাধারণ ভবিষ্যত কাল

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ	মুই করিম্‌	হামরা/হামারঘর/হামারলা করিমো
মধ্যম পুরুষ	সাধারণ—তুই করিবু	তমরা/তোমরা করিবোঁ/করিবু
	সম্ভ্রমার্থে—তোমরা করিবেন	তমারলা করিবেন

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ—সাধারণ—	তায় করিবে/করিবেক	তায়ঘর করিবে/করিবেক
সম্ভ্রমার্থে—	তামরা করিবে/করিবেক	তামারঘর করিবে/করিবেক

উত্তম পুরুষের একবচনে এই উপভাষায় 'ম' এবং বহুবচনে 'মো' ব্যবহৃত হয়। যেমন একবচনে—'কার হস্তে পাঠাইম্ বন্দুর গুয়া' বহুবচনের রূপ—'দোনোজনে শিতান দেমো'।

কিন্তু কাব্যে সুরের প্রয়োজনে বা কথ্যভাষায় নিশ্চয়ার্থে প্রায়ই উত্তম-পুরুষের একবচনেও 'মো'এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—'বন্দুয়া মলে হমো আড়ি' বা 'এহেনা যৈবন সাগরে ভাসামো'।

সর্বনাম :

পুরুষবাচক সর্বনাম—উত্তম পুরুষ

(ক) উত্তম পুরুষের একবচনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় 'মুই'। 'মুঞি, মই, মো'র ব্যবহার খুব কম। 'হামি'র ব্যবহার নেই, তবে কোচবিহারে 'আমি'র প্রচলন আছে যদিও জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় 'আমি'র প্রচলন নেই। এই উপভাষায় কাব্যে উত্তম পুরুষের একবচনে গৌরবার্থে বহুবচনের রূপ প্রয়োগ করা হয়। যেমন—'যখন তমরা বাজান রে বাঁশী তকোন হামরা আন্দোন রে আন্দি।'

(খ) কাব্যে ক্বচিৎ একবচনে 'হাম' ব্যবহৃত হয়, নয়তো 'হাম' বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দ। 'হাম' এই প্রাতিপাদিক দিয়েই উত্তম পুরুষের সব কারকের দ্বিবচনের রূপ হয়। কাব্যে 'মুই' এর পরিবর্তে কখনও 'মুইও' বা 'মুইয়ো' ব্যবহৃত হয়। যেমন—'মুইয়ো নারী ভর যুবতী'।

(গ) 'হামা' এই উপভাষায় মূলতঃ উত্তম পুরুষের বহুবচনাত্মক রূপ, তবে কাব্যে একবচনেও ব্যবহৃত হয়। উত্তম পুরুষের প্রথমার বহুবচনের সর্বাধিক প্রচলিত রূপ হল 'হামরা'। 'মোরা' সেই তুলনায় বিরল। কোচ-বিহারে বহুবচনে 'হামরা'র চেয়ে 'আমরা' বেশি চলে, দার্জিলিং ও জলপাই গুড়িতে 'হামারলা' (সমীভবনের ফলে হামাল্লা) এবং 'হামারঘর' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।

(ঘ) উত্তম পুরুষের দ্বিতীয়ার একবচনে সর্বাধিক প্রচলিত 'মোক্'। অধুনা 'আমাকে'র প্রভাবে 'মোকে'র প্রচলনও দেখা যায়। মোক্ থেকে মোখ্ বা মোগ্ এবং কাব্যে 'মোকো' বা মোখো'তে পরিণত হয়।

'হামা' এবং 'হামার' সঙ্গে গুলা, গিলা, লা, ঘর প্রভৃতি বহুবচনাত্মক প্রত্যয় এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির 'ক' জুড়ে উত্তম পুরুষে দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলায় 'হামারলাক্' এবং দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলায় 'হামারঘরক' বেশি প্রচলিত।

(ঙ) উত্তম পুরুষের তৃতীয়ার একবচনে 'মোক্‌দিয়া' এবং 'দিয়া'র সংক্ষেপিত রূপ 'দি' ব্যবহৃত হয়। কোচবিহারে আবার 'হামাকদিয়া' প্রচলিত।

(চ) অপাদান কারকের অর্থজ্ঞাপক অনুসর্গ 'হইতে', 'থেকে' এই উপ-ভাষায় যথাক্রমে 'হাতে', বা শুধু 'তে' এবং 'থাকি' রূপে ব্যবহৃত। যেমন— 'মোরহাতে', 'মোরতে', 'হামারতে'। 'মোরথাকি,' 'হামারথাকি' ইত্যাদি।

(ছ) ষষ্ঠীর একবচনে 'মোর' বেশি প্রচলিত। কোচবিহারে 'হামার'ও চলে, তবে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় 'হামার' কেবল বহুবচনেই ব্যবহৃত।

(জ) সপ্তমী বিভক্তির একবচনে 'মোত্', 'মোতে, 'হামাত্' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কথ্যভাষায় এগুলি আবার 'মোরটে', 'মোরঠে' 'মোরতি', 'হামারতি, রূপেও পাওয়া যায়।

পুরুষবাচক সর্বনাম—মধ্যম পুরুষ

(ক) আলোচ্য উপভাষায় 'তুই' মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক ও সাধারণ রূপ নির্দেশ করে। বাংলার মত 'তুমি', 'তোমা', সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত। বহুবচনে 'তমহারা / তোমরা / তমরা'র ব্যবহার হয়। 'তুমি' ব্যবহারের পর সম্ভ্রমার্থে ক্রিয়াপদে 'ন' যুক্ত হয়। যেমন—'তুমি ফান্দি চলি যাবেন শিকার করিতে'।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তির সাধারণরূপে একবচনে 'তোক্' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। কাব্যে পাওয়া যায় 'তোকো'। মহাপ্রাণতার ফলে 'তোকো' হয় 'তোখো' বা 'তোখ্'। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় 'তমাক্' আর কোচবিহারে 'তোমাক্' বহুবচনে ব্যবহৃত হয়।

(গ) মধ্যম পুরুষের তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ উত্তম পুরুষের ন্যায়।

(ঘ) ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনে 'তোর,' 'তর' বা 'তোহোর' ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে 'তুমহার' বা 'তোমরার' ব্যবহার হয়।

পুরুষবাচক সর্বনাম – প্রথম পুরুষ

(ক) প্রথমার একবচনের সাধারণরূপে বেশি ব্যবহৃত 'তায়'। 'তাঁয়' বা 'তাঞ' রূপও পাওয়া যায়। প্রথম পুরুষের একবচনের সম্ভ্রমার্থক রূপ 'তামরা'—এটি বহুবচনেরও রূপ। তবে বহুবচনে সাধারণতঃ গুলা, গিলা, লা, ঘর প্রভৃতির ব্যবহার হয়।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তির 'তাক্' একবচন ছাড়াও বহুবচনে এবং সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়।

(গ) ষষ্ঠীর বহুবচনে সম্ভ্রমার্থক রূপ 'তাম্মার'।

সাকল্যবাচক সর্বনাম : 'উভয়' এবং 'সকল' বাংলার এই দুটি সাকল্য-বাচক সর্বনামের ব্যবহার আলোচ্য উপভাষাতেও রয়েছে। হিন্দী 'দনো' বা 'দোনো' আলোচ্য উপভাষায় 'দুই' এবং 'উভয়'—দু' অর্থেই ব্যবহৃত। যেমন—'দোনোজনে শিতান দেমো'।

বাংলার অপর সাকল্যবাচক সর্বনাম 'সকল' এবং 'সব' এই উপভাষায় 'সগ, সউগ, সোগ্, সৌগ' রূপে উচ্চারিত। যেমন—'সউগ ফুল ফুটিল মোর না ফুটিল্ ব্যাল'। ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারণ হয় 'সক্, সোক্' ইত্যাদি রূপে। শব্দের উপর জোর দেওয়ার ফলে বাংলার 'সব্বাই' এর মত রাজবংশী উপভাষাতেও প্রচলিত রয়েছে 'সগ্গায়' এর।

আরবী ভাষার 'তামাম' সর্বনামটির প্রচলন রয়েছে, তবে উচ্চারণ হয় 'তামান' রূপে। 'তামানে'র সঙ্গে গিলা, লা প্রভৃতি যুক্ত হয়।

প্রশ্নাত্মক সর্বনাম : একবচনের রূপ 'কায়' 'কাঁই' 'কাঁয়'। বহুবচনে 'কারঘর' বা 'কারলা'। তবে 'কায়ে'র ব্যবহারও কাব্যে চলে, যেমন—'কায়ে আর হাঁকাবে পাংখা বগলত্ বসিয়া'।

'কেন' সর্বনামটি উচ্চারিত হয় 'কানে' হিসাবে। এই উপভাষায় আরও একটি সর্বনাম 'কিতায়'। কথ্যভাষায় 'ক্যানে' আর কাব্যে 'কিতায়' বেশি চলে। যেমন—'কিতায়রে তুই নাই আসিলো'।

স্থানবাচক সর্বনাম : স্থানবাচক সর্বনামীয় ক্রিয়াবিশেষণের অধিকাংশই এসেছে ঠাঁই শব্দ থেকে। 'ঠাঁই' উচ্চারণে এতদঞ্চলে হয়েছে টে, ঠে, থে, থি, তি প্রভৃতি। 'তি'র দ্বিত্বরূপ ত্তি'। নির্দেশক 'এ, ও'র রূপ যথাক্রমে 'হে' এবং 'হো'। তদ্রূপ 'ই' হয় 'হি'। যেমন—হেটে, হেঠে, হেথি, ইত্তি, হেতি, হিতি, হিত্তি (এখানে বোঝাতে)। নির্দেশক 'উ' হয় 'হু'। হুত্তি হুথি প্রভৃতি। যেমন—'হুত্তি থো তোর নাঙ্গল জোয়াল বারা বানেক আসিয়া'।

কালবাচক সর্বনাম : কালবাচক সর্বনামীয় ক্রিয়াবিশেষণের 'বেলা' 'সময়' এই উপভাষায় উচ্চারণের জন্য হয় লা। যেমন—এবেলা থেকে হয় এলা, সেবেলা—সেলা। বাঁকা উচ্চারণে এর সঙ্গে বিভক্তি চিহ্ন 'য়' যুক্ত হয়ে উচ্চারণ হয় অ্যালায়, (এখনই) স্যালায় (তখনই) যেমন—'স্যালায় না কহিছুঁরে দাদা মইষালক্ না দিস্ জাগা'।

আবার এলা ও সেলার সঙ্গে 'ও' বিভক্তি যুক্ত হয়ে উচ্চারণ দাঁড়ায় অ্যালাও (এখন) স্যালাও (তখন)। যেমন—'অ্যালাও ন্যাদাও পিরীতের মাতাত্'।

অব্যয়রূপে 'ও' যুক্ত হলে তার উচ্চারণ 'এলাও' (এখনও) 'সেলাও' (তখনও)। যেমন—'এলাও না আইসে মোর নিলাজী চোর'।

পরিমানবাচক সর্বনাম : পরিমাণগত বিশেষণ 'ত' আলোচ্য উপভাষায় 'তো' হিসাবে ব্যবহৃত। আবার উচ্চারণকালে এর রূপ দাঁড়ায় 'এতোয় কতয় যতয়' ইত্যাদিতে। যেমন—'কতয় দেকিম্ ভাই ভোটের ভেকধারী'। 'এতো'র মহাপ্রাণিত রূপ 'হেত' বা 'হেতো'। বহুবচনাত্মক প্রত্যয় 'লা' পরিমান জ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত। যেমন—এতলা, যতলা, কতলা ইত্যাদি।

রাজবংশী উপভাষায় ব্যাকণগত গঠনপ্রণালী ব্যতীত বেশ কিছু শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় যেগুলি কেবল এতদঞ্চলের আদিবাসীদের কাছেই বোধগম্য। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এইরকম বহুশব্দই রয়েছে যা ব্যাকরণগত নিয়মকানুন বহির্ভূত। আবার অহরহ ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলির বুৎপত্তিগত অর্থ না জানলে এই ভাষা সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়না। বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন সঙ্গীতের শেষে বিভিন্ন শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে, তৎ সত্ত্বেও বহুল প্রচলিত কিছু শব্দের বঙ্গার্থ দেওয়া হল রাজবংশী উপভাষা সহজে অনুধাবনের জন্য।

অং—রং, আতি—রাত, আদ-আতি—মাঝরাত, আবো—ঠাকুমা, আবু—দাদু, আমাসু—অমাবস্যায় জন্ম যার, অঘন—অগ্রহায়ণ, আগিনা—অঙ্গন> উঠোন, অ্যালা—এখন, অ্যালাও—এখনও, ইগ্‌লা—এইসব, এত্তি—এখানে, কুকিল—কোকিল, কাকুলি—বগল, কোপাল—কপাল, কান্দুরা—যে বাচ্চা বেশি কাঁদে, কমড়—কোমর, কাটোল—কাঁঠাল, কুশিয়ার—আখ, কইন্যা—কন্যা, কাউয়া—কাক, গুয়াবাড়ি—সুপারিবাগান, গচ বা গছ—গাছ, গীদাল বা গীতাল—মূল গায়ক, গাড়ীয়াল—গরু বা মোষের গাড়ী চালক, গাবুর—যুবতী, ঘর ভুন্দুরা—ঘরকুনো, চান—চাঁদ, জার—শীত, জাওই—জামাই, জোতদার—জমিদার, জোনাকু—শুক্লপক্ষে জন্ম যার, ডাঙ্গর আই—বড়রাণী, ডাঙ্গাভুঁই—উঁচু জমি, তেতলি—তেঁতুল, ঢাল কাউয়া—দাঁড়কাক, ঢ্যাপা—মোটা, দহলা বা দোলা ভুঁই—নীচু জমি, দেহা—শরীর, দুদ—দুধ, ধত্তি—পৃথিবী, নেঙ্গুল—আঙ্গুল, নিধুয়া পাতার—ধুধু প্রান্তর, নওদারী বা নোদারী—নতুন বউ, পাটাবাড়ি—পাটক্ষেত, পাকি—পাখী, প্যাট—পেট, পাও—পা, পুষ—পৌষ, পারো—পায়রা, পচিমা বা পচ্চিয়া—পশ্চিম,

পানুয়া—পানবিক্রেতা, প্যাট পাকিয়া—কুচক্রী, পোহাতু—সকালে জন্ম যার, বাও—বাতাস, বগিলা—বক বা সারস, বৈষালী দিন—বর্ষাকাল. বিধুয়া—বিধবা, বান—বন্যা, বোয়ালি—বোয়াল মাছ, বানিয়া—বেনে, ব্যাপারী—দোকানদার, ব্যাচেয়া খাওয়া—বিয়ে দেওয়া, বাউদিয়া বা বাউরিয়া—ভবঘুরে বা ছন্নছাড়া, বিষাদু—বৃহস্পতিবার জন্ম যার, বুধারু—বুধবার জন্ম যার, বানাসু—বন্যার সময় জন্ম যার, বাইগোন—বেগুন, ভাটিব্যালা—বিকেল, ভাউজী বা ভোজী —বউদি, ভাওয়াইয়া—উদাসী বা বিবাগী, ম্যাগ—মেঘ, মৈষাল—মোষপালক, মরুচ—লঙ্কা, মাচুয়া—জেলে, শাউন—শ্রাবণ, শনারু—শনিবার জন্ম যার, সাকাল—সকাল, সাঁঝ—সন্ধ্যা, সমারু—সোমবার জন্ম যার, সাজো আয়ো—সধবা নারী, হালুয়া—চাষী, হলুদিয়া—হলুদ রঙের। ইত্যাদি

অন্য ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হলেও এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে গঠনগত পার্থক্য থাকলেও রাজবংশী উপভাষার অক্ষর কিন্তু বাংলা। ইদানীং দক্ষিণ-বঙ্গের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ এবং বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রভাবের ফলে রাজ-বংশী উপভাষারও পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ভাষার মূল কাঠামো বজায় থাকলেও শহরাঞ্চলে বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজবংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে দক্ষিণবঙ্গের প্রচলিত বাংলা ভাষায় রপ্ত হয়ে উঠছেন। দক্ষিণবঙ্গীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের ফলে মূল রাজবংশী উপভাষারই অস্তিত্ব হয়তো একদিন লোপ পাবে। রাজবংশীয়েরা নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথা বললেও বৃহত্তর পরিবেশে ও সাহিত্যের দরবারে বাংলা ভাষাই প্রচলিত। উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যও বাংলাতেই পুষ্টিলাভ করছে। বাংলাভাষাই ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সার্বজনীন ভাষায় পরিণত হচ্ছে। একদিন হয়তো কয়েকশ বছরের প্রাচীন রাজবংশী উপভাষা বিলীন হয়ে যাবে বাংলা ভাষার প্রবল স্রোতে।

৪. উত্তরবঙ্গের লোকধর্ম ও লোকাচার :

আদিম যুগে মানুষের জীবন ছিল পদে পদে অনিশ্চিত, এ কারণে অজ্ঞতা-প্রসূত ভয় এবং সম্ভ্রমজাত মনোভাব থেকে সৃষ্টি হয়েছিল প্রকৃতির সাকার উপাদান বৃক্ষ, পাহাড়, নদী প্রভৃতির উপাসনা, অন্যদিকে নিরাকার রূপে ভূত, প্রেত, দানো প্রভৃতির স্তুতি। যেসব অশুভ শক্তি আদিম মানুষের জীবনে কল্যাণকর ও যেসব অশুভ শক্তির অমূলক আশঙ্কায় জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটতো, উভয়কেই সন্তুষ্ট রাখাই ছিল আদিম মানুষের জীবনধর্ম। তুষ্টি সাধন, প্রসাদন, তোষণ ইত্যাদিতেই নিহিত ছিল অবচেতনমনের প্রকাশ। প্রতিকূল শক্তিকে প্রসন্ন করে অনুকূলে আনা আর শুভ শক্তিকে ভজনা করে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করাই ছিল সকল ধর্মবিশ্বাসের মূলমন্ত্র। দিনরাত্রির পরিবর্তন, ভূকম্পন, খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল দৈব ঘটনার প্রতীক, সুতরাং ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানোর অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং এই সবের তুষ্টি সাধন করে এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াসও ছিল ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত। আদিম মানবের ধর্মবিশ্বাস যে এই সব অকারণ ভয় ভীতি, কুসংস্কার নিয়েই গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এইসব ভয়-ভীতি ও অন্ধ কুসংস্কারের শিকড় কেবল আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই নিহিত ছিল তাই-ই নয়, এর মূল আমাদের বংশ পরম্পরায় এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে এই বিজ্ঞানের যুগে বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসেও মানব সমাজের মধ্যে এইসব কুসংস্কারের কিছু কিছু ধারা আজও প্রবাহিত।

স্বভাবতই এককালের পাহাড়, জঙ্গল, নদী-বিধৌত উত্তরবঙ্গের আদি-বাসীরাও আপ্লুত হয়েছিল বিভিন্ন লোকাচার, লোকায়ত সংস্কার আর সংস্কারাবদ্ধ ধর্মাচরণে। ভারতবর্ষে আর্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে নানা ধর্মাচরণ ও লোকাচারের প্রাধান্য দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের আদি বাসীরা বিভিন্ন সময়ে আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। এই কারণে এখানকার জনসমাজ দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক আর্য, মঙ্গোলীয় প্রভৃতিজাতির মিশ্র ধর্মমতে সৃষ্ট বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসক। আর্যগণ মূর্তি পূজা করেন না, তাঁরা দেবতার সন্তুষ্টি-বিধানে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। মহেঞ্জোদারো নিবাসী দ্রাবিড় জাতি শিবমূর্তি পূজা করেন আর অষ্ট্রিকগণ পান, সিঁদুর দ্বারা পাথর, গাছ ইত্যাদির পূজা করেন। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীগণ তাই সব ধরণের প্রক্রিয়া থেকেই কিছু না কিছু সংগ্রহ করেছেন, তাই তাঁরা একাধারে গাছ, পাথর, নদী প্রভৃতির যেমন পূজা

করেন, তেমনি আবার পূজা করেন নানা দেব দেবীরও। পূজার অঙ্গ হিসাবে ধূপ প্রদীপ জ্বালানো ছাড়াও যাগ-যজ্ঞ ও হোমাগ্নিরও প্রচলন রয়েছে। রাজ-বংশীরা যেমন আর্য ও অনার্য উভয় জাতিরই লোকাচার গ্রহণ করেছেন, তেমনি আবার শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের উপাসনার ধারাকেও গ্রহণ করেছেন। পাল রাজন্যবর্গের কালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের যে ঢেউ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রভাব এতদঞ্চলেও পড়েছে। তৎকালীন সময়ে এরই প্রভাবে গড়ে উঠেছিল প্রচুর বৌদ্ধ বিহার, যে কারণে এক সময় এই অঞ্চলকে 'বেহার' রাজ্যও বলা হত।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব পশ্চিম কামরূপ তথা পরবর্তী-কালের কামতাপুর রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন, অন্যদিকে পূর্ব কাম-রূপ বা পরবর্তীকালের কামরূপ রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন শঙ্করদেব, তিনি কামতাপুরের মহারাজ কর্তৃক কামরূপ অধিকারের পর কামতাপুরেও ধর্ম-প্রচার করেন। শঙ্করদেবের পর মাধবদেব তারপর দামোদরদেব কোচবিহার রাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। "এই সমস্ত ধর্মপ্রচারকগণের চেষ্টায় কামতা-পুর তথা কোচবিহার রাজ্যের তথা উত্তরবঙ্গের অধিবাসীগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী হন। প্রতি হিন্দু গৃহে তুলসী স্থাপিত হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীগণ হরি পূজা করেন। অবশ্য চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এই দেশে বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। খুব কম সংখ্যক গৃহে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত 'রাধা-কৃষ্ণ' বিগ্রহ পূজিত হন। * * * কোচবিহার রাজ্যে তথা উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রচারের জন্য মহারাজ বিশ্বসিংহ (১৪৯৬-১৫৫৩ খৃঃ অঃ) মিথিলা, গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ভূমিদান করিয়া স্বরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসতি করান এবং দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার আরম্ভ করেন"।[২]

এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মমত ও লোকাচারপুষ্ট উত্তরবঙ্গ সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অপরূপ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদঞ্চলের আদি-বাসীরাও এইসব ধর্মমতে প্রভাবিত হয়ে গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন আচার ও সংস্কার, আর আদিবাসীদের মধ্যে যেহেতু রাজবংশীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই তাদের লোকাচার ও লোকধর্মই উত্তরবঙ্গের সার্বিক লোকাচার ও লোকধর্ম হিসাবে পরিগণিত। যদিও কোন কোন আদিবাসীর নিজস্ব লোকাচার অদ্যাপি প্রচলিত, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া নিতান্তই দুর্লভ।

'বন কেটে বসত' গড়ার সেই প্রথমক্ষণে অনুদার প্রকৃতিকে মানুষ এক-দিকে তার শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বশ করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে প্রসন্ন করতে

চেয়েছিল স্তুতি গানের দ্বারা। জল জীবনের অন্যতম অঙ্গ, তাই প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীকে আরাধনা করতে শুরু হয় নদী পূজা। বৃষ্টির অভাবে তখন কৃষিকাজ ছিল অসম্ভব, তাই বৃষ্টির দেবতা বরুণদেবের পূজার নামে শুরু হয় 'হুদুমদ্যাও' পূজা। তান্ত্রিকমতে লোকাচারে মারণ-উচাটনের যেমন প্রচলন ছিল, তেমনি আবার শান্তি-স্বস্ত্যয়নেরও অভাব ছিল না। এইভাবেই সৃষ্টি হল ব্রতকথা, লোকাচার আর লোকধর্ম। 'কোম' বা গোষ্ঠী অনুযায়ী এইসব লোকাচারের নানা রূপ, আর পালনের নানা বিচার বিবেচনা। "উত্তর-বাংলার ব্রতকথাগুলি দক্ষিণ বাংলার ব্রতকথার মত শুধু কথা নির্ভর নয়। এখানকার ব্রতকথা অনুষ্ঠান কিছুটা কথা নির্ভর হলেও সঙ্গীত এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ব্রতকথার অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়। এ কারণেই এখানকার ব্রতকথাকে প্রায় পুরোপুরি সঙ্গীত নির্ভর বলা যায়"।[২]

এইসব ব্রতকথা আর নানা লোকাচারের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীতের, যে সঙ্গীতে দেবস্তুতি যেমন রয়েছে তেমনি আছে প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম-নিবেদনের আকুতি। ব্রতকথার মধ্যে 'সাইটোল' ব্রতের আখ্যানে আছে নীলা বা লীলার বন্ধ্যাত্ব ঘুচে গিয়ে 'ধনাই ও মনাই' নামে দুই পুত্রলাভের কথা। এই ব্রতের বিভিন্ন অংশে রয়েছে জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক। লীলার স্বামী মণিহারের বাণিজ্য যাত্রার অংশ ভাওয়াইয়ার অন্যতম প্রচলিত গান ঃ

'বাণিজ-বাণিজ করেন পাণ সাদুরে
সাদু বাণিজের কিবা রীতি।' (সঙ্কলন পৃঃ ৫০)

শুধু ব্রতকথাতেই নয়, জীবনযাত্রার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধর্মবিশ্বাস বা লোকাচার উত্তরবঙ্গবাসীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষির দেবতা হিসাবে এখানে হয় শিবের পূজা। শিব অন্যতম কৃষি দেবতা। উত্তরবঙ্গের কোচ, মেচ, গারো, রাভা, লেপচা, সর্বোপরি রাজবংশী, প্রত্যেক জাতি ও উপজাতির মধ্যেই শিব ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাস্য দেবতা। লোকায়ত শিবের আর এক পূজা 'শাল-শিরি' বা শালেশ্বরী পূজা। খাদ্য ও জ্বালানী সংগ্রহের আশায় অরণ্যে প্রবেশের অনুমোদন এবং অরণ্যের মধ্যে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় অরণ্যের এক প্রাচীন বৃক্ষকে পূজা করা হয়। শিব পূজার ভিন্নতর রূপ, নীলের গাজন, বিশুয়া অনুষ্ঠান, সোনারায়ের পূজা। দক্ষিণবঙ্গে সোনারায় অবশ্য ব্যাঘ্র-দেবতা। ক্ষেতের ফসল ও গোয়ালের গরুর মঙ্গল কামনায় করা হয় গোরক্ষনাথের পূজা। এটিও শিবপূজা। আতপচাল, কলা, গুড় প্রভৃতি দিয়ে পূজারী বা অধিকারী

পূজা করেন, মন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ সঙ্গীত, হাতে তালি বাজিয়ে পাঁচালী সুরে গাওয়া হয় গোরক্ষনাথ পূজার গান, পূর্ববঙ্গের 'ত্রিনাথের মেলার' মত। এই গানের অংশ বিশেষঃ

"শিবের মাগন ভাই শিবের মাগন
ভাটি হাতে আইল পীর হাতে কঙ্কণ।
হাতে কঙ্কণ পীরের মুখোত্ চাপোদাড়ি
দই দুদ্ মাগিতে গেইল্ নন্দ গোয়ালের বাড়ী
হাই চাওরে কপিলা গাই, তোর কোপালে দুদ্ ভাত খাই।"

শিবের লোকায়ত আর একটি রূপ পাওয়া যায় মালদহ জেলার 'গম্ভীরা গানে।' এখানে শিব পুরাণোক্ত শিব মহেশ্বর নন, তিনি যেন এদেরই ঘরের মানুষ। এই অঞ্চলে সমস্ত জীবনযাত্রার অন্যতম প্রতীক শিব, তা সে কৃষি দেবতা হিসাবেই হোক বা গ্রামের অত্যাচারী মহাজন বা জোতদারের রূপেই হোক, শিবই সবকিছুর কেন্দ্র বিন্দু। তাই খরা জনিত আকালের সময় গম্ভীরা গানের মাধ্যমে শিবকেই জানায় তাদের দুঃখের নালিশ—

'শিব কি করিব হে এবার, বাঁইচবেনা পরাণ
ট্যাহা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেইল্ টান্।' (সংকঃ পৃঃ ৭৮)

আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্মূল্যের জন্য শিবকেই দায়ী করে গম্ভীরার কবিয়াল গেয়ে ওঠেন—

'ধর ধর দিস্নে ছ্যাড়া, লিয়া চলেক সঙ্গে কর্যা
ওই বুড়হাটা দিলেক্ বড়য় দুখ্ হে।' (সংকঃ পৃঃ ৬৫)

মালদহের গম্ভীরা গান আর জলপাইগুড়ি জেলার গমীরা গান—শিবেরই গান, তবে মালদহের গম্ভীরা গানে শিবকে জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া হয়েছে কিন্তু গমীরা গানে শিবকে দেবতার আসনে বসিয়ে তার পূজার আয়োজন করা হয়েছে। গোরক্ষনাথের পূজায় গমীরা গান গাওয়া হয়, যদিও গোরক্ষনাথ পূর্ববঙ্গের নাথ সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। জলপাইগুড়ি জেলার গমীরা গানের নমুনা—

'শিব নাচোরে শিব সাজে
কানা কড়িটা ঝুমুর বাজে।' (সংকঃ পৃঃ ৬৫)

রাজবংশী সমাজে আরও একরূপে শিবের পূজা হয়, তাহল 'গারাম পূজা'। অবশ্য এখানে শিবের স্বতন্ত্র পূজা হয় না, প্রতীক হিসাবে অন্যধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় দেবতার সঙ্গে শিবের পূজা হয়। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এ এক

অনবদ্য উদাহরণ। সমস্ত আনুষ্ঠানিক পর্বেই এই গারাম ঠাকুরের পূজা হয়। "Garam is a curious combination of deities of all faiths forming one omnibus village deity. This deity is worshipped on all ceremonial occasions."[৪] সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই 'গারাম ঠাকুরে'র মধ্যে আছে নদীর দেবী—তিস্তাবুড়ি, ইসলাম ধর্মের—মাদার ও সত্যপীর, বৈষ্ণব ধর্মের—হরিবোলা, শৈব ধর্মের—শিব বা সন্ন্যাসী ঠাকুর এবং শাক্ত ধর্মের—থানকালী, হাওয়াকালী বা ভদ্রকালী। অত্যন্ত 'ক্ষমতাশালী' এই দেব সম্প্রদায়ের প্রতীক 'গারাম ঠাকুরে'র অবশ্য নিজস্ব কোন মূর্তি নেই, তবে কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর ছবি এঁকে পূজাস্থানে রাখা হয়। পূজাও হয় গ্রামের একপ্রান্তে, সাধারণতঃ কোন বাঁশ বাগানে।

জনজীবনে জলের অবদান অনস্বীকার্য, জীবনের অন্যতম অঙ্গই জল। তাই জলের দেবতা তথা জলবাহী নদী রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসীদের জীবন ধারায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এবং সার্বিক কল্যাণের দেবতা হিসাবে সমাদৃত। তিস্তানদীর পূজাকে তিস্তাবুড়ি পূজা বা 'মেচেনী খেলা' বা 'ভেদেই খেলা' বলে। এখানে 'খেলা' বলতে পূজার অঙ্গ হিসাবে নৃত্য ও গীত বোঝায়। তিস্তাবুড়ি পূজা মেচ সম্প্রদায় কর্তৃক উদ্ভূত এবং তিস্তানদী মেচ সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত পবিত্র নদী। তিস্তাবুড়ি পূজাকে 'মেচেনী খেলা' বলার পিছনে এক পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। প্রাচীনকালে হিমালয়ের পাদ-দেশে ছিল এক মেচ বসতি (বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে উত্তর ফুলবাড়ি অঞ্চল)। একবার শিব কৈলাশে যাওয়ার পথে মেচ বসতির দুই সুন্দরী মেচ রমণীর রূপে আকৃষ্ট হন, এবং কৈলাশে না গিয়ে শিব মেচ বসতিতে বাস করতে থাকেন। এই সংবাদ জানতে পেরে শিবের দুই স্ত্রী পার্বতী ও গঙ্গা মেচ রমণীর বেশ ধারণ করে শিবের সঙ্গে মেচ পল্লীতে মিলিত হন। এখানেই কার্তিক ও গণেশের জন্ম হয়। মেচ পল্লীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত তিস্তানদী মেচ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী পার্বতী ও গঙ্গার মিলিত রূপ, এই কারণেই তিস্তানদী মেচ ও অন্যান্য আদিবাসীদের কাছে এত পবিত্র। তিস্তাবুড়ি পূজার একটি গান—

'নাহি জল নাহি থল নাহি তারা আকাশ' (সংকঃ পৃঃ ৬৬)

জলপাইগুড়ি জেলায় মেচেনী খেলা ও ভেদেই খেলা এক হলেও কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী অঞ্চলে ভেদেই খেলা বলতে স্বতন্ত্র পূজাকে বোঝায়। সেখানে মাদারপীরের প্রতিভূ হিসাবে এক বাঁশের মাথায় নানা রঙের কাপড়

বেঁধে সেটিকে নিয়ে ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ছেলেরা নাচ-গান করে ও গৃহস্থের দেওয়া চাল ডাল কলা ইত্যাদি সংগ্রহ করে ভেদেই খেলা হয়। মদনকাম বা বাঁশ পূজা থেকে এই পূজাও স্বতন্ত্র।

জলবাহিকা নদীর পূজা যেমন প্রচলিত তেমনি অনাবৃষ্টি হলে বৃষ্টি-দেবতার তুষ্টি বিধানে প্রচলিত আছে নানা লোকাচার ও লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস। লোকায়ত এই পূজার নাম 'হুদুম দ্যাও'-এর পূজা। এই পূজার ব্রতকথায় আছে—দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় বসুমতী অন্তঃসত্ত্বা হলে বসুমতীকে ঘৃণাভরে বিতাড়িত করলেন সকল দেবতা। কারও কাছে আশ্রয় না পেয়ে আটিয়া কলার (বিচি কলা) গাছের আশ্রয়ে জন্ম হয় বসুমতীর সন্তান 'হুদুমে'র। কিন্তু জলাভাবে হুদুমকে পরিষ্কার করতে না পারায় বসুমতী বৃষ্টি কামনায় ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানান। বরুণের দয়ায় হল বৃষ্টি, তাপিত বসুমতী শীতল হন, মৃতপ্রায় হুদুম বেড়ে ওঠে নবকলেবরে। বৃষ্টি কামনায় তাই পালিত হয় 'হুদুম দ্যাও'-এর পূজা বা লোকাচার।

'হুদুমা' শব্দটির অর্থ 'উলঙ্গ'। অমাবস্যা তিথিতে অথবা অন্ধকার রাত্রে বাড়ী থেকে কিছু দূরে সধবা কৃষক বধূগণ সমবেত হন। রমনীগণ বিবস্ত্রা হয়ে পূজার অনুষ্ঠান করেন। দু-জন স্ত্রীলোকের কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল জুড়ে দেওয়া হয়। অপর একজন স্ত্রীলোক হাল চালান। সমবেত মেয়েরা নৃত্যের তালে তালে গান করেন ঃ

'হিল্‌হিলাইছে কমরটা মোর শিরশির‍্যাছে গাও।
কোন্ঠে কোনা গেইলে এলা হুদুমার দ্যাকা পাও।

নারী উর্বরতার প্রতীক। বৃষ্টি ফসলের প্রতিশ্রুতি। তাই নগ্ন নারীর সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক কল্পনা অনেক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য"।[৪]

বৃষ্টি কামনায় 'হুদুম দ্যাও' এর পূজা ছাড়াও 'ব্যাঙের বিয়ে'র অনুষ্ঠান চলে আসছে রাজবংশী সমাজে। কৃষক রমণীগণ খোলা মাঠে দুটি ব্যাঙকে বর কণে সাজিয়ে বিয়ে দেন আর গান করেন—

'ব্যাঙের বিটির বিয়া গো, গালায় হাসুলি দিয়া গো
ও ব্যাঙি ম্যাগ দিচোনা কেনে।'

সংসারের সুখ ও শান্তি কামনায় এবং রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তির আশায় উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা আরও একটি লোকায়ত ধর্ম পালন করেন, তাহল 'মদনকাম পূজা বা বাঁশ খেলা।' ধান কাটার পর বৈশাখ মাসে এই পূজা হয়। সাতটি বাঁশের মাথায় চামর বেঁধে সবগুলিকে রঙীন কাপড়ে

জড়িয়ে নানা পোষাকে সজ্জিত হয়ে ছেলেরা এই বাঁশ নিয়ে বাড়ী বাড়ী যায় নাচগান করতে। এই সাতটি বাঁশ হল সাতটি ধর্ম বা লোকাচারের প্রতীক, যেমন শালশিরি, গারাম, সন্ন্যাসী, কালী, তিস্তাবুড়ি, বিষহরি ও মদনপীর। পূজোর অন্যতম অঙ্গ গান, ছেলেরা গায় একবাড়ী হতে অন্য বাড়ী গিয়ে,

'ভাটি হাতে আইল কুচুনী হাতে পিতলের খাড়ু
তায় সেনে বানাইতে পারে মদনকামের নাড়ু।'

এছাড়াও রয়েছে নানা লোকাচার, লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস ও পূজো পার্বণ। ধরম ঠাকুরের পূজো, জগন্নাথ পূজো, বিষহরি পূজো বা মনসা পূজো, ওয়া গাড়া বা বীজবপনের পূজো, বাস্তুপূজো বা ধাত্তি (ধরিত্রী) পূজো—যাতে ফসলের কামনায় জমির পাশে কলাগাছ রোপণ করে সেখানে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। আছে সত্যনারায়ণ পূজো, নিতুয়া দেবী পূজো, ভান্দানী বা ভাণ্ডানী পূজো—ভান্ডানী দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী, ফসল বোনা ও কাটার সময় এই পূজোর চল রয়েছে বিশেষতঃ মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ী অঞ্চলে।

বিয়ে সংক্রান্ত নানা আচার অনুষ্ঠান বাদ দিলেও উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ছড়িয়েরয়েছে অসংখ্য লোকাচার ও ধর্মানুষ্ঠান। মারণ-উচাটনের জন্য এখানে ওঝার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সব লোক-অনুষ্ঠানের পরও ভূত, পেত্নী, দৈত্য, দানোর ভয়ে ভীত হয়ে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীবৃন্দ ওঝার উপর নির্ভরশীল। হাতীধরা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পুরুষদের অন্যতম জীবিকা, কিন্তু বুনো হাতীকে পোষ মানানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এজন্যও ওঝার শরণাপন্ন হন উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়। হাতীকে বশ করতে গান গাওয়া হয় মন্ত্রোচ্চারণের সুরে—

'বাহমতী ফির মোর ময়লানী
বাহমতী ছাড় মোর ময়লানী গে।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৭১)

এ-গুলিকে বলে বিরুয়া গীত। এই গান বা মন্ত্র যেমন বুনো হাতী বা মোষ বশ করতে বা তার অশুভ শক্তিকে বিতাড়ন করে শুভ শক্তির অভ্যুদয় ঘটাতে গাওয়া হয়, তেমনি আবার অশুভ আত্মার হাত থেকে রোগীর আরোগ্য লাভের জন্যও গাওয়া হয়।

এতদঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বেশ কিছু অংশই ধর্মসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত বা অন্যভাবে বলা যায়, এখানকার ধর্মাচরণ এবং মন্ত্রপাঠ সঙ্গীতের রূপে প্রকাশিত। তবে ধর্মসঙ্গীত হলেও সেগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে সমাজচিত্রের একটা দিক ফুটে ওঠে। সাধারণভাবে এইসব ধর্মসঙ্গীত দেবদেবীর বন্দনাগীতি

হলেও গ্রামীণ কবিয়াল বা গায়ক তাদের মনের কথা বা সমাজচিত্রের কথাও প্রকাশ করতেন অত্যন্ত কৌশলে কখনও বা স্পষ্ট করেই। তাঁরা এইসব ধর্ম-সঙ্গীতের মাধ্যমেই প্রতিকার চেয়েছেন নানা অভাব-অভিযোগের। তাঁদের কাব্যগীতিতে যেসব দেবদেবীর কথা বলেছেন সেইসব দেবদেবীকে সমাজের সাধারণ ঘরেরই একজন হিসাবে দেখিয়েছেন, ফলে এরই মধ্যে ফুটে ওঠে কৃষক ঘরের ছবি, দেশের অনাহার, দুর্ভিক্ষের করালছায়ার ছবি, আবার অন্যদিকে অত্যাচারী জোতদার আর জমিদারের কথা।

কালস্রোতে উত্তরবঙ্গে এসে মিশেছে নানা বর্ণ, জাতি ও সংস্কৃতির ধারা, পারস্পরিক সম্পৃক্ততার ফলে গড়ে উঠেছে এক অভিন্ন মিশ্র লোকাচার ও লোকায়ত ধর্মবিশ্বাস। কোচ, মেচ, রাভা, অহোম, নেপালী এবং পরবর্তীকালের বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর থেকে আসা বিভিন্ন চা-বাগিচার শ্রমিক এবং দেশ বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানাগত বাঙালী উদ্বাস্তু পরিবার, সকলের স্বতন্ত্র লোকাচার ও অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের লোকাচার ও লোকধর্ম। অবশ্য বিভিন্ন জন মানস ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সংস্কৃতিরই প্রাধান্য। শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক-না কেন, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় অবিচল রয়েছেন তাঁদের লোকাচার আর লোকধর্মে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তা মৌলিকত্ব হারিয়ে পরিমার্জিত হয়েছে। বিয়ের বিভিন্ন রীতি-নীতি বা আচার অনুষ্ঠান আজও অবিকৃত রয়েছে। গায়ে হলুদ, জলসওয়া (ভরা), কনেদেখা হলুদ কোটা, জামাই-বরণ, বাসর ঘরের গান কন্যা বিদায়ের গান সবই প্রচলিত আজও। এছাড়া সাধভক্ষণ, সন্তানের নামকরণ, নবজাতকের মঙ্গলকামনায় আটকড়াই ফুটকড়াই, বিদ্যাশিক্ষার প্রথম ধাপে হাতেখড়ি, ব্রাহ্মণ-সন্তানের ক্ষেত্রে উপনয়ন প্রভৃতি লোকাচার আজও অকৃত্রিমরূপে পালিত হচ্ছে। নবজাতকের নামকরণে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন,

দুপুরে জন্ম হলে নাম রাখা হয়			'দুখুর'
সন্ধ্যায়	”	”	সান্ধু
অন্ধকার রাতে	”	”	আন্দারু
পূর্ণিমা রাতে	”	”	পূর্ণিমা
সোমবার	”	”	সোমারু বা সোমারী (স্ত্রী অর্থে)
মঙ্গলবার	”	”	মঙ্গলা বা মঙ্গলু/মঙ্গলী (স্ত্রী)

বুধবার জন্ম হলে	নাম	রাখে	বুধারু বা বুধু বা বুধারী (স্ত্রী)
বৈশাখ মাসে	"	"	বৈশাখু
জ্যৈষ্ঠ মাসে	"	"	জেঠিয়া বা যতিয়া
আষাঢ় মাসে	"	"	আষাঢ়ু
ঝড়ের দিনে	"	"	ঝড়ুয়া বা ঝড়ু
বন্যার সময়	"	"	বানাতু
দুর্ভিক্ষের (আকালের)	"		আকালু

জনবসতির আদিম পর্যায়ে প্রকৃতিকে যেভাবে পেয়েছে আদিবাসীরা, সেইভাবেই তার অর্চনা করেছে। বসতির প্রথম পর্যায়ে মানুষের প্রতি প্রকৃতি ছিলনা উদার, তাকে কঠোর শ্রম আর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বাসযোগ্য করে তুলেছে মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে অজানা আশংকায় ভয়-তাড়িত আদিম মানব প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করতে তাকে বন্দনাও করেছে, নিজের ভাষায়, 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে'। আদিবাসীদের তখনও মুখস্থ হয়নি বেদার্চনা তাই নিজের মনের কথা দিয়েই নিজেদের সুরে সৃষ্টি করেছে বন্দনাগীতি। এই বন্দনা-গীতিই লোকজীবনের গান, এই গানই ভাওয়াইয়া বা চট্‌কা রূপে পরবর্তী-কালে পরিচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসঙ্গীতের পরিচয়

১. লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয় :

"ফোক' শব্দটি গ্রাম্য সাধারণের জন্যেই শুধু প্রযোজ্য হবে—এমন কোন বিধি নেই। বরং শব্দটির আচ্ছাদনে নাম গোত্র নির্বিশেষে ঐতিহ্যস্নাত সকল মানুষ এসে দাঁড়াতে পারে। গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে এলেই ফোকলোর রাজ্যে অপাংক্তেয় হয় না কেউ। মনে রাখা দরকার, গেল কয়েক দশকে গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ পৃথিবীর রাজধানীগুলোতে এসে ভীড় করেছে। অন্যদিকে, শহর এলাকায় জন্মেও মানুষ লোকসৃষ্টির অংশীদার হতে পারে—যেমন তার আচার-ব্যবহারে, পোষাকে-আষাকে, রান্না-বান্নায়, কথা-বার্তায় এবং আরো গভীরে ইহকাল পরকালগত দৃষ্টিভঙ্গীতে।

"Popular antiquities-এর জায়গায় Oral Culture অথবা Traditional Culture অথবা Unofficial Culture ব্যবহার করলে ফোকলোর পণ্ডিতের যথার্থ সান্নিধ্যে আসা যাবে। Tradition-এরও নবমূল্যায়ন প্রয়োজন। কেননা, এর ঐতিহ্যকেই সাম্প্রতিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলতে হয়। উর্ধ্বতনবাদী Hartland খুব সুন্দর করে বলেছেন : ঐতিহ্য ক্রমাগত নতুন করে সৃষ্ট হচ্ছে; প্রাক-পুরাণের অব্যয় নাগরিকত্বে নজরবন্দী নই আমরা। ক্রমবর্ধিষ্ণু সমকালও আমাদের জিজ্ঞাসার বস্তু।"[১]

সুতরাং লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে এই ক্রমবর্ধিষ্ণু সমকালকে সামনে রেখেই বিচার করতে হবে। লোকসঙ্গীত লোকায়ত জীবন-সঙ্গীত বা জীবনাশ্রয়ী সঙ্গীত। জীবন গতিশীল, সমকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা পরিবর্তনশীল। জীবনমুখী সঙ্গীতও তাই পরিবর্তনশীল, কারণ জীবনের 'ঘট' থেকেই সঙ্গীত তার রস আহরণ করে জীবনের তাগিদেই তা পরিবেশন করে জনগণের মাঝে। সঙ্গীত যেখানে জীবনের সঙ্গে যোগ হারায়, সেখানে তা অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তা আমাদের অতীত-চর্চার স্বাদ মিটালেও প্রাণের রসে সিক্ত হয় না। পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গীতও পরিবর্তনশীল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানস রাজ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও রূপ বদলায়, রূপের পরিবর্তন হয় সঙ্গীতের ভঙ্গিমায়, ভাব ও ভাষায় এমনকি তার গায়কীতেও। এই পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত না হলে লোকসঙ্গীত তার জীবনমুখীনতা হারায়, সে সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত থাকে না।

নদীর স্রোতের মতই সহজ ও স্বাভাবিক গতিই লোকসঙ্গীতের অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। লোকজীবনের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতও পরিবর্তিত হতে থাকে, কারণ জনজীবনের শৈল্পিক চেতনাই লোকসঙ্গীতের ধারক ও বাহক। পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয় লোকসঙ্গীত এক ধারা থেকে অন্য ধারায়, নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে। লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে বলা হয়, "Folk Song is a music that has been submitted to the process of oral transmission, it is a product of evolution, and is dependent on the circumstances of continuity, variation and selection "[2] এই সংজ্ঞা আরও বিশদ করে বলা হয়েছে—"Folk songs are transmitted through oral tradition which continue to live in the memory of the people through ages. These are created by individuals or groups, but generally without the identity of the authors, and are the products of a society or region "[3]

সাধারণভাবে সমস্ত লোকসঙ্গীতের স্বরূপ এক হলেও বাংলা লোকসঙ্গীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তার সুর ও ভাবের অকৃত্রিমতা এবং গায়কীর অভিনবত্বে। লোক অর্থাৎ জনগণ। সাধারণ জনজীবনের মধ্য থেকে উৎসারিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলেখ্য ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের প্রেম, বিরহ, হাসি, কান্না, আচার আচরণই লোকসঙ্গীতের রূপে প্রকাশিত। এই রূপের নানা বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতায়, সুর কাঠামোর পরিবর্তনে আর বক্তব্যের গভীরতার তারতম্যে এই বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। ভাবপ্রধান সঙ্গীত এতই ব্যঞ্জনাময় যে আপাতদৃষ্টি বা শ্রুতিতে যে সঙ্গীত সাধারণ জীবননাট্যের আখ্যায়িকার প্রকাশ করেছে বলে মনে হয়, হয়তো বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে তারই মধ্যে সুপ্ত রয়েছে কোন ঊর্ধ্বচেতনা-সম্পন্ন দার্শনিক মতবাদ। লোকসঙ্গীত যেমন লোকরঞ্জন করে তেমনি আবার লোকশিক্ষাও দেয়।

অধিকাংশ লোকসঙ্গীতই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার নির্ভর করে। এই ধর্মবিশ্বাস বা পূজার্চনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আদিযুগের সঞ্চিত সংস্কার ও ধ্যান-ধারণা। প্রকৃতিকে একাত্ম করে নিয়ে প্রকৃতিরই নানা সম্পদকে দেবার্চনার উপাচার করা হয়েছে। ধান-দূর্বা, কলা হলুদ, পান-সুপারী ইত্যাদি তাই মঙ্গলের প্রতীক। জীবনের এইসব দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠানের সূচনাতেই সঙ্গীতের প্রকাশ। কোন কোন সঙ্গীত কেবল এই সব

আচার অনুষ্ঠানেই গীত হয়,কোন সঙ্গীত আবার আচার অনুষ্ঠানের বাইরের জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট করে। ধর্মীয় জীবন, ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন—জীবনের বিভিন্ন ছন্দেরই প্রকাশ ঘটে লোকসঙ্গীতে। জীবনের রসে আপ্লুত বলে লোকসঙ্গীত অনুভূতি ও ভাবরসের বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে অপূর্ব। রচনার সরল পদ বিন্যাস, স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সুর আর সাধারণ তাল ও লয়ে নিবন্ধ। জটিল তত্ত্বকথাও সহজ সরল কথায় প্রকাশিত, যাতে তা সাধারণের বোধগম্য ও হৃদয়-গ্রাহী হয়।

জীবনবোধের এই বহুমুখী ধারাই বাঙলার লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। জীবনযাত্রার প্রতিটি ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রচিত হয়েছে লোকসঙ্গীত, গ্রামীণ জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক দিকের উপর যেমন আলোকপাত করেছে, আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকাশেও লোকসঙ্গীত পিছিয়ে পড়েনি। জড় ও জীবন উভয় পর্যায়েই সমভাবে বিধৃত হয়েছে লোকসঙ্গীতে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, সৃষ্টির এই তিন অমোঘ অবস্থা নিয়ে স্থানভেদে যেমন সৃষ্টি হয়েছে নানা লোকসঙ্গীত তার ধর্ম ও আচার অনুযায়ী,তেমনি প্রতিটি লোকসঙ্গীতও রচিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সুরে ও ভাবনার ব্যঞ্জনায়। শ্রমসঙ্গীত, নদীর গান, ধূ ধূ প্রান্তরের গান, উদাসী বিবাগীর গান যেমন আছে, তেমনি রয়েছে প্রেমের গান, বিরহের গান, আর বিচ্ছেদের গান। উত্তরবঙ্গের মাহুতের গান, মৈষালের গান, গাড়ীয়াল ভাইয়ের গান নিয়ে যেমন ভাওয়াইয়া গান, তেমনি আবার বাঙলাদেশের ভাটিয়ালী আর মধ্যবঙ্গের বাউল গানও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের বাউল, শ্রীহট্টের মারফতী বা মুর্শিদা, মালদহের গম্ভীরা,বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার ঝুমুর আর ভাদু গান—সবই লোকসঙ্গীত, কিন্তু প্রত্যেকটিই একে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। আচার-নিষ্ঠ-বিয়ের গানই দেশা-চার ও ধর্মাচার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন।

"সাঙ্গীতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাঙলার লোকসঙ্গীতের কত রূপ, কত ছক, কত প্রথা যে জড়িত আছে বলে শেষ করা যায় না। কোন গান গাওয়া টানা সুরে, কোন কোন গান আবার আবৃত্তির অনুরূপ। কোন গানের ভাব সহজ, কোন গান জটিল তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন তত্ত্বভাবে পুষ্ট। একক, দ্বৈত, সম-বেত ও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে লোকসঙ্গীত গাওয়ার রীতি। গান ভাবে অকৃত্রিম, সুরে-স্বতঃস্ফূর্ত। সামাজিক রীতিনীতি, পল্লীবাসীর ধ্যান-ধারণা এবং তাদের বিবিধ প্রথা ও ভাব—তাদের গানে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হয়।"[৪] বিভিন্ন

জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা লোকসঙ্গীতের মূল কাঠামো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তদুপরি শ্রুতিনির্ভর হওয়ার ফলে আদি রূপের নকশা প্রায় বিলুপ্তির পথে, কারণ পারিপার্শ্বিকতার চাপে এবং পরিবর্তনশীল জীবনধারায় সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীত তার মূল অবস্থা থেকে সরে এসেছে অনেকখানি। "লোকসংগীতের জন্মদিন সূর্য-শশী-নক্ষত্রের মতই হারিয়ে গেছে। উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ থেকে শুরু হলেও শ্রুতিনির্ভর বলে হয়ত তার অনেকগুলি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আজ শিক্ষাবিস্তারের ফলে যে ইতিহাসের তথ্য আমাদের আয়ত্ত, আমাদের জ্ঞানগম্য কেবল তারই সৃষ্টিগুলিকে আমরা পাই। অবশ্য বিস্মৃতির ফসিল আজকের গানের সুরে, কথায় উপমায় কতখানি প্রস্তর স্বাক্ষর রেখে গেছে তাও নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই।"[৫]

বহতা নদীর স্রোতের ন্যায় লোক সংস্কৃতির ক্রম পরিবর্তনশীল ধারা অবলম্বন করে এগিয়ে চলাই লোকসঙ্গীত বিকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রুতিনির্ভর হওয়ার ফলে সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে এককালের প্রচলিত সঙ্গীত তার ভাবের পরিবর্তন ঘটায়, চিন্তা ও মননশীলতায় আনে প্রগতির নতুন আলোর আভাস। তাই বর্তমান লোকসঙ্গীতের কথায় ও পরিবেশনায় ধরা পড়ে নতুনত্বের ছাপ। চিন্তাধারার পরিবর্তনে বা নতুন অগ্রগতির প্রবাহে লোকসঙ্গীতও স্নাত হয়ে ধারণ করছে নতুন বেশ, যদিও তার শারীরিক পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্যই। এই প্রবহমানতা বা গতিশীলতাই লোকসঙ্গীতের প্রাণ-ভোমরা। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ যেভাবে এগিয়ে চলে, সেই একই পদক্ষেপে এবং সমতালে এগিয়ে চলাই লোকসঙ্গীতের ধর্ম।

"লোকসঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা মৌখিক রচিত হইয়া মৌখিক প্রসার লাভ করে, সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলেও কোনদিনই ইহার লিখিয়া রাখিবার সংস্কার গড়িয়া উঠে না। লিখিত হইবামাত্রই সাহিত্য একটি বিশেষ অনমনীয় (rigid) রূপ লাভ করে, কিন্তু যাহা কেবলমাত্র সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করিয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে তাহার মধ্যে কখনও একটি সুনির্দিষ্ট (rigid) রূপ গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রবহমানতার মধ্য দিয়াই লোকসঙ্গীতের প্রাণশক্তি রক্ষা পায়। নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে নূতন নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয় এবং তাহার ফলেই ইহার কোন অংশেই জীর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না।"[৬]

লোকসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয়ে তার আঞ্চলিকতার প্রভাব অনস্বীকার্য।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবনের স্বাভাবিক প্রভাবেই প্রভাবিত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকসঙ্গীত। অরণ্য পরিবেষ্টিত অঞ্চলে প্রিয়জন পরিত্যক্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন বাস করার বেদনার বহিঃপ্রকাশ, বন্ধুর পথে গরুর গাড়ি চালনায় বা খরস্রোতা নদীবক্ষে নৌকা চালনায় শরীরে যে ঝাঁকুনি পড়ে,তারই প্রভাবে উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়ায় দেখা যায় স্বরভঙ্গ বা সুরে ভাঙনের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে উদার নদীবক্ষে অবকাশকালীন সময়ে ভাটায় নৌকা ভাসিয়ে মাঝি যে গান গায় তাতে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ টানা সুরের যা বাংলাদেশের ভাটিয়ালী রূপে প্রচলিত, তেমনি আবার রাঢ় বাংলার মাটিতে গাওয়া বাউলের গানের চলন তার চলার ছন্দের মতই ছন্দোময়। রাঢ় বাংলার ঊষর শুষ্ক ও প্রান্তরময় ভূপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সৃষ্ট বাউল গানেরও প্রকৃতি উদাস এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ। "বাংলা লোকসঙ্গীতের সঙ্গে আঞ্চলিকতার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অঞ্চলভেদে তার এক এক প্রকার রূপ। অঞ্চল বিশেষের ভৌগোলিক প্রকৃতি, জীবনযাত্রার ছাঁচ, শ্রম ও কৃষির স্বরূপ, বিশেষ বিশেষ সমস্যা—এর সবই ছাপ ফেলে লোকগীতির উপর। এগুলির মধ্যে ভৌগোলিকতার ভূমিকাই সবচেয়ে প্রধান।"[৭]

লোকসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে তার আঞ্চলিক উচ্চারণের বিভিন্নতাতেও। যে অঞ্চলের লোকসঙ্গীত তাতে সেই অঞ্চলের ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাব পড়বেই। ভাষার আঞ্চলিক বিশেষত্ব অনুযায়ী একই লোকসঙ্গীতের অঞ্চলভেদে ভিন্ন-রূপী প্রকাশভঙ্গী দেখা যায়। গায়কীতে এই আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গী বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য (Intonation) থাকবেই, এর বিচ্যুতি ঘটলেই সংশ্লিষ্ট লোকসঙ্গীতের আসল রূপটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষার প্রকাশভঙ্গী অনুযায়ী তাই সঙ্গীতেরও সুরের বিন্যাস বা গায়কী স্বতন্ত্র হয়। সেই কারণে এক অঞ্চলের গায়কের পক্ষে অন্য অঞ্চলের গান যথাযথ গাওয়া প্রায়শই অসুবিধা-জনক হয়। হয়তো গায়কী যথাযথ হয়, কিন্তু স্বরভঙ্গীতে পার্থক্য ধরা পড়বেই। অঞ্চলভেদে লোকসঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যই পারস্পরিক পার্থক্যের সূচনা করে। লোকসঙ্গীতে এই আঞ্চলিকতার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায় না। ভৌগোলিক পরিবেশ এবং অঞ্চলগত ভাষার প্রভাব ও উচ্চারণ রীতির প্রভাব লোকসঙ্গীতে পড়বেই। সামগ্রিকভাবে বাংলা লোকসঙ্গীত বাংলা ভাষায় গীত হলেও অঞ্চলগত ভাষার তারতম্য এবং নৃতাত্ত্বিক বিচারে জনগোষ্ঠীর মানসি-কতা, তাদের কৃষ্টি এবং উচ্চারণের পার্থক্য—সব কিছুর প্রভাবই পড়ে লোকসঙ্গীতে। এই আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে কোন লোকসঙ্গীত পুষ্টি লাভ

করতে পারে না, কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষাই লোকসঙ্গীতের ভাষা, তাই এই ভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি অতিক্রম করে গড়ে-ওঠা-সঙ্গীত প্রকৃত লোকসঙ্গীত না হয়ে সেগুলি পর্যবসিত হয় মিশ্র বা মার্জিত (Improvised) সঙ্গীতে।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, বাঙলাদেশের ভাটিয়ালী এবং মধ্যবঙ্গের বাউল—তিনটিই টানা সুরের লোকসঙ্গীত, কিন্তু এগুলির গায়কীর পার্থক্য যেমন আছে তেমনি রয়েছে উচ্চারণের বিভিন্নতাও। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে যেমন 'ঘরাণা'র ব্যবহার হয়, লোকসঙ্গীত সেই রকম কোন ঘরাণায় আবদ্ধ না হলেও একই গান আঞ্চলিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। "লোকসঙ্গীতের কোনো 'ঘরাণা' নেই, আছে 'বাহিরাণা'। এই আঞ্চলিকতাকেই আমি 'বাহিরাণা' বলছি। কোন অঞ্চলের গান গাইতে গেলে সেই অঞ্চলের জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রয়োজন। তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের স্বর প্রক্ষেপে এমন এক প্রকার 'গলা ভাঙা' yodelling গলার খোঁচ বা 'লৌকিক অলংকার' যুক্ত হয় যা কোনো শহুরে ওস্তাদ হাজার রেওয়াজ করেও আয়ত্ত করতে পারে না। * * * লোকসঙ্গীত গুরুমুখী বা বিদ্যালয়মুখী নয়। ঘরে বসে রেওয়াজ করে লোক সঙ্গীত আয়ত্ত করা যায় না। একটা বিশেষ অঞ্চলের জনসমাজের জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকালের identification সেজন্য প্রয়োজন। লোকসঙ্গীতের স্টাইলটা আঞ্চলিক জীবনধারা থেকে উদ্ভূত। এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ স্বরসমষ্টি বা ঠাটকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে মিশেছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি এবং পারিভাষিক উচ্চারণভঙ্গি।"[৮]

লোকসঙ্গীতের দুটি দিক। এক তার কথা আর তার সুর। মার্গসঙ্গীতে যেমন সুরেরই প্রাধান্য, লোকসঙ্গীতে কথা ও সুর দুয়েরই সমান গুরুত্ব। সুর যেখানে কথাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে, সেখানেই সুরের উৎকর্ষ। সেই সুরই স্থায়ী সুরে পরিণত হয়। আবার কথায় আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকায় একই গানের সুরের প্রয়োগ স্বতন্ত্র হয়, বিশেষতঃ উচ্চারণের পার্থক্যই এই সুরের কাঠামো নির্দিষ্ট করে। যেমন ভাওয়াইয়ার একটি গান রাজবংশী উপভাষায় লেখা হয় এই ভাবে—

'ওকি গাড়ীয়াল ভাই

কত রবু মুঞি পন্থের দিকে চায়ারে'। এই গানের যে শব্দ প্রয়োগ বা তার উচ্চারণ পদ্ধতি, তার সঙ্গে মধ্যবঙ্গের এবং বাঙলাদেশের বাংলা ভাষার মিল নেই। ফলে শব্দের পার্থক্য ছাড়াও উচ্চারণ রীতির পার্থক্যের জন্যও সুরগত কাঠামোর পরিবর্তন হয়। একই গান মধ্যবঙ্গের নাগরিক বাংলা

ভাষায় লেখা হলে তার রূপ দাঁড়ায়, অনেকটা এই রকম—

ওহে গাড়োয়ান ভাই

কত রইবো আমি পথ পানে চাহি। এই একই গান বাঙলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারণ দাঁড়ায় এইরকম—

কিওবা গাড়ীয়াল বাই

কতয় রইমু মুই ফথের ফানে চাইয়া রে। স্বভাবতই শব্দ চয়ন ও তার উচ্চারণ পার্থক্যের জন্য গায়নরীতিরও পরিবর্তন হয়। কথাই হল লোক-সঙ্গীতের প্রাণ-ভোমরা। লোকসঙ্গীতের এই প্রাণ-ভোমরার গুঞ্জন তুলতে প্রয়োজন আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, নাহলে একস্থানের ভাষা ও উচ্চারণ রীতি জোর করে অন্য অঞ্চলের গানের উপর চাপিয়ে দিলে সেই সঙ্গীত মূলানুসারী হয়না এবং জনগণের সঙ্গে সাযুজ্য না থাকায় সেগুলি কালক্রমে লোকসঙ্গীতের চরিত্র হারায়।

লোকসঙ্গীতের আনুষঙ্গিক যন্ত্র যেমন ব্যানা, দোতারা, একতারা, গুবগুবি বাঁশী, সারিন্দা প্রভৃতি সুরকে ধরে রাখতে সাহায্য করে কিন্তু মূল অভিব্যক্তি প্রকাশে প্রয়োজন কথা। কথার বিচারে লোকসঙ্গীতের মূলতঃ দুটি ভাগ—বহিঃরূপ প্রধান আর অন্তঃরূপপ্রধান সঙ্গীত। সাধারণরতঃ গভীর তত্ত্ব ও ভাব-বর্জিত সহজ কথায় নিবন্ধ যে সব গান, সেগুলিকে বহিঃরূপ প্রধান, অন্যদিকে যে সব গান গভীর তত্ত্বমূলক ও ভাবসমৃদ্ধ, যেগুলির ভাবার্থ আপাতদৃষ্টিতে সহজবোধ্য হলেও যার অন্তর্নিহিত ভাব গভীর ব্যঞ্জনাময়, সেইগুলিকে অন্তঃ-রূপ প্রধান গান বলা যায়। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের একটি বহিরঃরূপ প্রধান গান—যাতে মৈষালের মোষের গলার ঘণ্টাধ্বনি শুনে প্রেমিকার মন অস্থির হয়ে উঠেছে তার প্রেমিক মৈষালের কাছে ছুটে যাওয়ার জন্য।

'পাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্দুরে।' (সংকঃ পৃঃ ১০)

অন্যদিকে দ্ব্যর্থ অর্থবোধক একটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণ—

'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' (সংকঃ পৃঃ ৫) এখানে বাহ্যত মনে হয় শিকারীর ফাঁদে কোন বকের আটকে পড়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই গানের অন্তর্নিহিত অর্থে মানব জীবনের অনিত্যতার কথাই বলা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা যেন সামান্য সুখের টোপ দেখিয়ে মানুষকে ভোগবাসনার জালে আটকিয়ে রেখে-ছেন, সেই বেড়াজালের কথা মানুষ যখন জানতে পারে তখন আর তার বেরিয়ে আসার পথ থাকে না, কারণ সে জাল তখন যেন লোহ-পিঞ্জরে পরিণত হয়েছে।

এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় লোকসঙ্গীতে কথারই প্রাধান্য, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ন্যায়

সুরের প্রাধান্য নয়। নিছক সুরের জাল বুনে মার্গসঙ্গীত সম্পূর্ণ হতে পারে কিন্তু লোকসঙ্গীতে তা সম্ভব নয়, সুরের সঙ্গে বাণীর মেল-বন্ধন না ঘটলে লোকসঙ্গীত রসোত্তীর্ণ হয়না। কথার প্রাধান্য থাকলেও লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক রূপ বিশ্লেষণে সুর কাঠামোর যে ব্যাকরণ রয়েছে তাকেই মাপকাঠি হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ লোকসঙ্গীত কোন রাগ বা ঠাটের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, কেবল গায়কী অনুযায়ীই লোকসঙ্গীতের চরিত্র বিচার করা হয়। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সাতটি স্বরে সমগ্র সুরমণ্ডলকে ভাগ করা হয়। এই স্বরগুলি দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছে। যদিও সুরসৃষ্টির আদি পর্বে মাত্র দুটি কি তিনটি স্বরেরই প্রকাশ দেখা যায়। এখনও আদিবাসীদের গানের সুরে ত্রিমাত্রিক স্বরেরই প্রাধান্য। অবশ্য সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং পারস্পরিক যোগসূত্রতা বৃদ্ধির ফলে আদিম সমাজের গানেও চতুঃস্বরিক বা পঞ্চস্বরিক সুরের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মেয়েলী গানে চতুঃস্বরিক সুরেরই প্রাধান্য। বিয়ের গান, ঘুমপাড়ানী গান বা ছড়া জাতীয় অধিকাংশ গানই চতুঃস্বরিক। এমনকি এই গানগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রচলিত মূল সঙ্গীতের সুর-কাঠামো অতিক্রম করেই টিকে রয়েছে। সুর সঙ্গতির আদি পর্বের এই সুর কাঠামোই আজও অব্যাহত, পাশাপাশি চলিত ঔড়ব বা ষড়ব জাতীয় গানের প্রচলন সত্ত্বেও। লোকসঙ্গীতের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য, ক্রমবিবর্তনের সুরমণ্ডলে সুরের আরোহণ, অবরোহণ, বাদী সম্বাদীর টানা পোড়েনে আদি সুর কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি।

সুর কাঠামোর গঠনরীতি অনুযায়ী লোকসঙ্গীতকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। "(১) যে সব সুর 'স র ম প' এমনি করে আরোহণ করে, (২) সেগুলো 'স গ ম প' করে, (৩) যেগুলো 'স ব গ প' করে ও (৪) যে সব সুর 'স র গ ম প' এমনি করে পঞ্চম পর্যন্ত সোজাসুজি সরলভাবে আরোহণ করে যায়।"[৯] সুরের পর্ব বিভাজনে দেখা যায় লোকসঙ্গীতের অঙ্গ হলেও এবং মূলতঃ টানা সুরের গায়কীতে নিবন্ধ হলেও উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া মধ্যবঙ্গের বাউল আর বাংলাদেশের ভাটিয়ালীর মধ্যে রয়েছে বিশেষ পার্থক্য।

সুর এবং তালের বিচারে লোকসঙ্গীত সহজ তাল ও সরল সুরে নিবন্ধ। যে গানের সুর সহজ ও সরল এবং তালও জটিলতা মুক্ত সেই গানই লোকের মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। অধিকাংশ লোকসঙ্গীতই টানা সুরের, যদিও

লয় বা মাত্রাহীন নয়। দীর্ঘটানের মাঝির গান ভাটিয়ালী, মৈষাল ও মাহুতের গান ভাওয়াইয়া আর বিবাগীর কণ্ঠে ভেসে ওঠা বাউল গান—সবই দীর্ঘ টানের গান। প্রেমের গানই হোক আর আত্মনিবেদনের গানই হোক, সব কিছুতেই প্রকাশ পায় গায়কের আর্তি, তাতে না পাওয়ার বেদনা বা পেয়ে হারানোর বিচ্ছেদ সবই প্রকাশ পায়। বিস্তীর্ণ নদী বা গভীর জঙ্গলের মাঝে, মাঝি বা মাহুত যখন গান করে তাতে তার একাকীত্বই প্রকাশ পায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যখন প্রাণের কথা সোচ্চারে প্রকাশ করায় কোন সঙ্কোচ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, সেখানে তাল লয় বজায় রেখে গান করার প্রায়ই কোন তাগিদ থাকেনা, গানের মাধ্যমে প্রাণের আকুতি প্রকাশই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

"পল্লীগীতির বৈচিত্র্যের আর একটি বিশেষ লক্ষণ বিশেষ মাত্রায় যতি বা উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত মাত্রার ঝোঁক দ্বারা ছন্দের সৃষ্টি। ছন্দের প্রয়োজনে এক ধরণের স্বরাঘাত পল্লীগীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ১২৩৪/ ৫৬৭৮-এই চারটি মাত্রা ছন্দে উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি নিয়মিতভাবে ১ বা ৫, অথবা ৪ বা ৮ বারবারই অনুচ্চারিত করা যায় বা শব্দটিকে বাদ দিয়ে ছন্দটাকে রক্ষা করা হয়, তাতে এই চতুর্মাত্রিক ছন্দেই বিচিত্র ভঙ্গি হয়। তেমনি গান গাইবার সময়ে প্রতিবারে ১/৩/৫/৭ মাত্রাগুলোকে যদি ধাক্কা (স্বরাঘাত) দিয়ে উচারণ করা যায় তাহলে অন্য রকমের ফল পাওয়া যায়। তেমনি তিনমাত্রার ছন্দ। পল্লীগীতিতে ছন্দের এই ধরণের রকমারী প্রয়োগ গানকে তালের দ্বারাই বিশেষ করে তোলে, ছন্দের সম্পদটা আদিমতম উপাদান।"[১০]

বিশেষত্বের বিচারে লোকসঙ্গীত হয় বিভিন্ন পর্যায়ের, যা সাধারণতঃ অন্য সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। পর্যায়ক্রম অনুযায়ী ভাগ করলে লোকসঙ্গীতের কয়েকটি রূপ প্রতিভাত হয়, যেমন (ক) আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত-বা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Calenderic বা Ritual songs. এই সঙ্গীতগুলি মূলতঃ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত; বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেই গাওয়া হয়, যেমন মনসার-ভাসান গান, শিবের-গাজনের গান, ওয়াগাড়া বা বীজ বপনের গান, মদনকামের গান। আনুষ্ঠানিক কিছু গান আছে যা সচরাচর গাওয়া হয়না বা সকলের গাওয়ায় নিষেধ রয়েছে, এইরকম একটি আনুষ্ঠানিক গান উত্তরবঙ্গের 'হুদুম দ্যাও'-এর গান। এই গান কেবল মেয়েরাই বৃষ্টি কামনায় গেয়ে থাকেন, পুরুষের এই গান করা এমনকি শোনাও নিষেধ। এছাড়া

রয়েছে ব্যবহারিক গীত বা Functional Songs. বিশেষ আচার অনুষ্ঠানেই এগুলি গাওয়া হয়, যেমন সাধভক্ষণের গান, বিয়ের গান, জন্মকালীন সন্তানের মঙ্গলকামনায় গাওয়া গান।

লোকসঙ্গীতের অন্য এক রূপ কর্মসঙ্গীত বা শ্রমসঙ্গীত। ইংরেজীতে এগুলিকে Work Songs বলে। সাধারণতঃ জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে এগুলি সম্পর্কযুক্ত, যেমন ছাত পেটার গান, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, পাট কাটার গান। শ্রম প্রক্রিয়া বিকাশের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ, সেই সমাজের ভাষা, তাল, ছন্দই প্রতিফলিত হয় সঙ্গীতে। যুথবন্ধ মানব সমাজ রচনা করে তাদের শ্রমের ছন্দে মিলিয়ে নানা সঙ্গীত। সার্বিক বিচারে হয়তো সমস্ত লোকসঙ্গীতই শ্রমের প্রেরণা সঞ্জাত। তবু শ্রমের রকমফের অনুযায়ী এই সঙ্গীতকে বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রম-সঞ্জাত সঙ্গীতের অন্য একটি পর্যায় গড়ে উঠেছে বৃত্তিমূলক পেশার সঙ্গে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Professional Songs যেমন বেদেনীর গান, সাপুড়ের গান, পটুয়ার গান ইত্যাদি। জীবনের নানা অবস্থা অনুযায়ী লোকসঙ্গীতের নানা রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে লোকসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত তাই প্রকৃতঅর্থেই 'লোক' বা জনগণের সঙ্গীত। এ সঙ্গীত নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারায় সুরের গজদন্তমিনারে বসে সুরসাধনা নয়,আপামর জনগণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অন্তর্নিহিত রূপেরই প্রকাশ, লোকমানসের মূর্ত প্রকাশই প্রকৃত লোক-সঙ্গীত। জনগণের বাস্তব জীবনের ছবিই লোকসঙ্গীতের প্রকৃত রূপ। "লোক-সঙ্গীত কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, সমস্ত মানুষের। কোনো ব্যক্তি বিশেষের গায়নরীতি বা দক্ষতার সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক নেই। সঙ্গীতের পরিশীলিত অনুশীলন, সুর বৈচিত্র্য এবং শিল্প চাতুর্য এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত।"[১১]

লোকসঙ্গীতের আর একটি বৈশিষ্ট্য তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, যে পরিবেশ বা অঞ্চলের গান, সেই অঞ্চলে এবং সেই পরিবেশেই সংশ্লিষ্ট লোকসঙ্গীত পরি-পূর্ণতা লাভ করে। কেবল একটি একতারা, দোতরা বা খমক বাজিয়েই গায়ক তার গানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন, এজন্য তার অন্য যন্ত্রানু-ষঙ্গের প্রয়োজন হয় না। অসংস্কৃত কণ্ঠে নৌকার বৈঠায় তাল ঠুকে বা বিনা তালে প্রশান্ত নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে গাওয়া মাঝির ভাটিয়ালী গান বা নির্জন বনে আগুন জ্বালানোর দুটি কাঠে তাল রেখেই বাথানের মৈষাল তার ভাওয়াইয়া গানকে করে তোলে অপূর্ব মূর্ছনাময়। জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনেরই গান হয়ে ওঠে লোকসঙ্গীত।

২· লোকসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয়সঙ্গীত :

ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতঃ দুটি ভাগ। একটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অন্যটি কর্ণাটক সঙ্গীত। এই দুই সঙ্গীতেরও আবার দুটি বিভাগ, একটি রাগ বা শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীত, অন্যটি দেশী বা লোকসঙ্গীত। এই দুই ধরনের সঙ্গীতের পার্থক্য বোঝাতে বলা যায়, যে সঙ্গীত রাগ-ভিত্তিক অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট রাগাশ্রয়ী সেই সঙ্গীতই রাগসঙ্গীত বা মার্গসঙ্গীত, অন্য দিকে প্রধানতঃ রাগ-রাগিণী বহির্ভূত গ্রামীণ চিন্তাভাবনা সঞ্জাত প্রাণের আকুতিতে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি তাইই দেশী বা লোকসঙ্গীত। সঙ্গীত শাস্ত্রকারের মতে মার্গ সঙ্গীত হল—

'মার্গ দেশীতি তদ্বেধা তত্র মার্গঃ স উচ্যতে।
যো মার্গিতো বিরঞ্চ্যদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাভি॥'[১]

অর্থাৎ, ভরত প্রমুখ মুনি যে সঙ্গীত পরমপিতা ব্রহ্মার সামনে দেবস্তুতিতে পরিবেশন করেছিলেন তাইই মার্গসঙ্গীত আর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতে পারে যে সঙ্গীত সেই সঙ্গীতই দেশী সঙ্গীত।

'তত্তদ্দেশস্থয়া রীত্যা যস্যা লোকানুরঞ্জনম্।
দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।"[১]

অবশ্য বৈদিক যুগে মার্গসঙ্গীত ও দেশীসঙ্গীত বলে স্বতন্ত্র কোন ভাগ ছিল না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তন হতে থাকে এবং এই বিবর্তনের পথে এমন একটা সময় আসে যখন মার্গসঙ্গীত আর দেশী সঙ্গীত এই দুই স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। এই দুই ধারার রূপ পরিগ্রহণে অতিক্রান্ত হয়েছে বহু শতাব্দী এবং আজও এই বিবর্তন সমানে চলেছে। প্রথম অবস্থায় মার্গসঙ্গীত ছিল স্তব জাতীয় বন্দনাগীতি, তারপর ধ্রুপদের রূপে প্রকাশ এবং পরবর্তীধাপে খেয়াল এবং সবশেষে টপ্পা ও ঠুংরী গানে এসে থেমেছে। মার্গসঙ্গীতের ন্যায় দেশী সঙ্গীতও বর্তমান রূপে এসেছে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। প্রাকৃত(রীতি অনুসরণ করে যে সঙ্গীত সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, মনের স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ভাবাবেগকে আশ্রয় করে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে, সেই সঙ্গীতই দেশী বা লোকসঙ্গীত। একদিকে দেবার্চনার সঙ্গীত অন্যদিকে জীবনের সঙ্গীত দুই ধারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হয়ে বর্তমান মার্গ ও দেশী সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। আদি বা মৌলিক সঙ্গীত এইভাবে বিবর্তিত হতে হতেই বর্তমান কায়া লাভ করেছে। ক্রমাগত বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতেই মার্গসঙ্গীতের

গুণগত পরিবর্তন হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী সঙ্গীতেরও পরিবর্তন হয়েছে এবং পাশাপাশি চলতে চলতে একের প্রভাব অন্যের উপর স্বাভাবিক রূপেই পড়েছে। "রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের মধ্যে দৃশ্যতঃ দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তাদের একটিকে অপরটির থেকে একেবারে গোত্র সম্পর্ক-বর্জিত বলে মনে হয় না—কোথায় যেন তাদের মধ্যে একটা অলক্ষিত যোগ-সূত্রের আঁচ মেলে।"[২]

মানুষের মুখে কথা সৃষ্টির পূর্বে ছিল বিভিন্ন আওয়াজ আর অঙ্গভঙ্গী যা দিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হত। পশুপাখীর নানা আওয়াজ অনুকরণের মধ্য দিয়েও মনোভাব প্রকাশ পেত। সেই ভাবপ্রকাশের আওয়াজই কালক্রমে পরিণত হয়েছে সঙ্গীতে, সেই আদিম সঙ্গীত মার্গ বা রাগ সঙ্গীতও নয়, এমনকি তাকে দেশী সঙ্গীতও বলা যায় না। মানুষ ঘর বাঁধতে শেখার অনেক পরে শিখেছে সঙ্গীতের 'ঘরাণা' বাঁধতে বা সঙ্গীতের কাঠামো তৈরী করতে—সেই সঙ্গীতই চলছে দীর্ঘকাল। কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ সঙ্গীতের পাশাপাশি চলছে কাঠামো-বিহীন সঙ্গীত—যে সঙ্গীত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক ভাবপ্রকাশের বহিরঙ্গ সঙ্গীত। তাই মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আর দেশী বা লোকসঙ্গীতের মধ্যে কোন সঙ্গীত কার উপর নির্ভরশীল সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছানো যায়নি, হয়তো বা যাবেও না কোনদিন। কারণ পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তিতেই কালের গণ্ডী অতিক্রম করে বর্তমানের সঙ্গীত বিভাজনের রূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাগসঙ্গীত ও দেশী সঙ্গীত একে অন্যের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে চলার ছন্দ বা গতিপথ স্বতন্ত্র হলেও। বাহ্যিক রূপ ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য দুই ধারার সঙ্গীতের স্বতন্ত্র নামকরণ হয়েছে, এক ধরনের সঙ্গীতকে মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অন্য ধরনের সঙ্গীতকে দেশী বা লোকসঙ্গীত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ধারণে বলা যায়—

"ভারতের আর্য সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহার রাগদেহ চারিটি স্বরের অধিক সংখ্যক স্বর অবলম্বনে গঠিত হয়, যথা ঔড়ব, ষড়ব, সম্পূর্ণ অর্থাৎ পাঁচ ছয় এবং সাতটি স্বরের সাহায্যে গ্রথিত রূপেই আর্যসঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীতের বিশেষত্ব। সুতরাং যে রাগ বা রাগিণী চার স্বরের সমষ্টি তাহা আর্য সঙ্গীতের পরিধির বাহিরে পড়ে এবং তাহার জন্ম আদিম নিবাসীদের সঙ্গীতের রাজ্যে অর্থাৎ চার স্বরের রাগ অনার্য সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে।

ইহার প্রমাণ হইল প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রামানিক গ্রন্থ 'বৃহৎদেশী'র বচন : 'চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি-মার্গ : শবর-পুলিন্দ-কাম্বোজ-বঙ্গ-কিরাৎ-বাহ্লীক-অন্ধ্র-দ্রাবিড়-বনাদিষু প্রযুজ্যতে (বৃঃ দেঃ, পৃঃ ৫৯)। অর্থাৎ, চতুঃস্বরের রাগ মার্গ সঙ্গীত নহে, এই জাতীয় রাগ রাগিণী, শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, বাহ্লীক, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি বন্য এবং আদিমনিবাসী জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত।"[৩]

কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিচারে এককালের আদিম বা অনার্য জনসমষ্টি যেমন কালপ্রবাহে নিঃশেষিত না হয়ে প্রগতির নতুন ধারাকে অধিগ্রহণ করে আর্য জাতিকুলের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে এমন কি তার শাখা-প্রশাখায় আরও পল্লবিত রূপের প্রকাশ ঘটিয়েছে, তেমনি আদিম জাতির সঙ্গীতও কালগর্ভে বিলীন না হয়ে তা আরও গভীরভাবে বয়ে চলেছে আপন আবেগে। তাই আর্য সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত এখন সমান্তরাল খাতে বইছে মানব সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ প্রবাহে। আদিম মানবের সৃষ্ট দেশী বা অনার্য সঙ্গীত, যেমন আভীর জাতি থেকে সৃষ্ট আহিরী, মালব জাতি সৃষ্ট মালব কৌশিকি বা মালকোষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগে পরিণত হলেও অনার্য বা দেশী সঙ্গীত শেষ হয়ে যায়নি ; বরং তা নতুন খাতে বয়ে চলেছে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। 'অনার্য' সঙ্গীতের চার স্বর পরবর্তীকালের দেশী সঙ্গীতের পঞ্চস্বর ষষ্ঠস্বর এমনকি সপ্তস্বরেও বিস্তার লাভ করেছে ; যদিও সেগুলির সাঙ্গীতিক কাঠামো ও গীতরীতি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে বিকাশ লাভ করেছে। আজও ভাষাভিত্তিক অধিজাতিগুলির মধ্যে তাদের লোকসঙ্গীতের সুরকাঠামোতে বিভিন্ন নৃকুল, উপজাতি বা অর্ধ-উপজাতীয় সুরের এক বিচিত্র রূপকল্পের সমাবেশ দেখা যায়।

স্বভাবতই রাগসঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যেখানে রাগ-রাগিণীর সুস্পষ্ট প্রকাশ, সেখানে লোকসঙ্গীত বা দেশী সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর প্রকাশ প্রকট না হলেও অনেক লোকসঙ্গীতই রাগ-রাগিণী নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে, তাই কোন কোন লোকসঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে লোকসঙ্গীতের যে বাঁধনহারা দুর্বার গতি, সেই গতির বেগই প্রভাব ফেলে জনমানসে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে লোকসঙ্গীতের বাণীরূপে। রাগসঙ্গীত যদি হয় দেবতার ধ্যানকল্প, তবে লোকসঙ্গীত দেবতার পূজা উপাচার। সঙ্গীতের বৃহৎ পরিমণ্ডলে রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত পরস্পরের পরিপূরক সর্বার্থেই পরস্পরের সহযোগী, প্রতিযোগী

নয় কোন ক্ষেত্রেই। দুটি স্বতন্ত্র ধারার সঙ্গীত হলেও কোনটাই একমুখীধারা নয়। রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, এই দুই ধারার সঙ্গীতকে কখনই নিচ্ছিদ্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে (water-tight compartment) বন্দী করে রাখা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় গ্রামের বিয়েতে যে সানাই বাজে তাতেও ফুটে ওঠে রাগ-রাগিণীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব, যাত্রায় বিবেকের গানও রাগাশ্রয়ী যদিও সঙ্গীতের বিচারে উভয়েই দেশী সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। ভাটিয়ালী গানের রূপকাঠামোয় সঙ্গীতবেত্তা সুরেশ চক্রবর্তী ঝিঁঝিঁট রাগের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন আবার কীর্তনেও দেখা গেছে খাম্বাজ ঠাটের প্রচ্ছন্ন প্রভাব।

"কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাংলার লোকসঙ্গীতের ওওর মার্গ সঙ্গীত যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি আবার ঐ মার্গ সঙ্গীতের ওপরেও লোকসঙ্গীত প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি দুটি ধারা প্রবহমান থাকলে এমন ঘটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ সত্ত্বেও লোকসঙ্গীত এবং শাস্ত্রীয় বা মার্গ সঙ্গীতের ধারা পাশাপাশিই চলছে।"[৪] লোকসঙ্গীতের সুরের কাঠামোতে যেমন মার্গ সঙ্গীতের প্রভাব রয়েছে, তেমনি অনেক মার্গ সঙ্গীতই সৃষ্টি হয়েছে লোকসঙ্গীতকে ভিত্তি করে; বিভিন্ন অনার্য জাতির সুর সঞ্চয় করে: বিভিন্ন কোম বা গোষ্ঠীর নামানুযায়ী মার্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামকরণ থেকেই একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। লোকসঙ্গীতের সুর কাঠামোয় যেমন মার্গ সঙ্গীতের খাম্বাজ,কাফি,পিলু,কঁসোলী ঝিঁঝিঁট,তিলক কামোদ, পটদীপ, মাঢ় প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর ছাপ ধরা পড়ে, তেমনি আবার প্রাচীন জনগোষ্ঠী সৃষ্ট নানা আঞ্চলিক সুরের প্রভাব ছাড়াও রাগ-রাগিণীর নামকরণও আদিম বা অনার্য জাতির নামানুসারে হয়েছে। যেমন, ভীরবা জাতির সঙ্গীত থেকে ভৈরবী, পুলিন্দ জাতির নামানুসারে পুলিন্দী, কলিঙ্গ দেশের অনার্য জাতি থেকে কালিন্দী বা কালেংড়া, মালব জাতির সঙ্গীত থেকে মালব কৌশিক বা মালকোষ, বা মালশ্রী, গুর্জর জাতি থেকে গুর্জরী বা গুজরি (টোড়ি), আভিরী জাতি থেকে আহিরী, অন্ধ্রজাতি থেকে অন্ধ্রী বা আন্ধ্রী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং একথা সহজেই বলা যায় যে, আর্য সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীত-আর অনার্য সঙ্গীত বা দেশী সঙ্গীতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের প্রাচীর সব সময় তোলা যায় না। এক সময় যে সঙ্গীত ছিল দেশী কালক্রমে সুসংস্কৃত হয়ে সেই সঙ্গীতই রূপ নিয়েছে মার্গ সঙ্গীতের। তাই বর্তমানে মার্গ সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের পার্থক্য কেবল এ দুটির

কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্যে, মার্গ ও লোকসঙ্গীত একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও লোকসঙ্গীত এবং মার্গ সঙ্গীত স্বকীয়তায় ভাস্বর। লোকসঙ্গীত উৎসারিত জনজীবনের জীবনধারা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, তাই সে সঙ্গীত নির্দিষ্ট নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়েনা কখনই। রাগসঙ্গীত যে গণ্ডীবদ্ধতার আবর্তে ঘুরপাক খায় লোকসঙ্গীত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

রাগ সঙ্গীত এক নির্দিষ্ট সরগম অবলম্বন করে এক নির্ধারিত লয়ে বা গায়কীতে গাওয়া হয় যাকে অন্য কথায় 'ঘরাণা' বলে। এই ধরনের গায়কী নির্দিষ্ট গান বাংলাতেও পাওয়া যায়, যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান দ্বিজেন্দ্রগীতি প্রভৃতি। এই সব সঙ্গীত নির্দিষ্ট স্বরলিপি অনুসরণ করে শিক্ষকের কাছে তালিম নিয়ে আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু লোকসঙ্গীতে কেবল তালিম নেওয়াই সব নয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে গায়কের একাত্মতা না থাকলে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকসঙ্গীত গাওয়া যথাযথ হয় না। মার্গ সঙ্গীত বা অন্যান্য বাংলা গানে গুরুমুখী শিক্ষার দ্বারা পটুত্ব অর্জন করা যায়. কিন্তু লোকসঙ্গীতে তা সম্ভব নয়, এজন্য গায়কের প্রয়োজন গায়কী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাবানুষঙ্গ বা বিশেষ ঢঙ ও উচ্চারণ রপ্ত করা। এই বৈশিষ্ট্যই লোকসঙ্গীতকে অন্য সঙ্গীত থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। লোকসঙ্গীত কোন সঙ্গীত চর্চা নয়, এ হ'ল প্রাণের আকুতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই কোন নির্দিষ্ট ছকে সব সময় একই লোকসঙ্গীত গাওয়া নাও হতে পারে। গায়কের মেজাজ, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ও পরিবেশের উপরই লোকসঙ্গীতের গায়নরীতি অনেকটা নির্ভর করে। নিত্য নৈমিত্তিক সুরের চলনে সীমাবদ্ধতার স্থান নেই লোকসঙ্গীতে,প্রবহমানতার মধ্যেই লুক্কায়িত লোকসঙ্গীতের প্রাণ-ভোমরা। লোকসঙ্গীত বহতা নদীর মত. আবদ্ধ জলের মলিনতা তাকে স্পর্শ করে না। এই নিরন্তর প্রবহমানতাই লোকসঙ্গীতের প্রাণ. যা মার্গ সঙ্গীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্গ সঙ্গীতের চলাচল এক নির্দিষ্ট রাগ বা রাগিণীর নিয়ন্ত্রিত পথে। অন্যদিকে লোকসঙ্গীত গীত হয় গায়কের আপন মনের মাধুরীতে। "প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক যেমন বলেছিলেন, এক নদীতে একজন দুবার স্নান করে না, ঠিক সেভাবে বলা যায় একজন লোকসঙ্গীত গাইয়ে একই গান দুবার একই ভাবে গান না। কেউ হয়ত বলবেন একজন খেয়াল-গাইয়ে বা ঠুংরী গাইয়েও একই গান একইভাবে দুবার গান না, improvisation-টাই তার আসল বাহাদুরী। কিন্তু তফাতটা হলো ক্ল্যাসিক্যাল গাইয়ে অত্যন্ত সচেতন ভাবে improvise করেন আর লোকসঙ্গীত গাইয়ে এ ব্যাপারে অচেতন। অথচ

তার মূল local musical mode বা ঠাটের ভেতরেই সেটা করেন।"[৫]

লোকসঙ্গীত আর রাগসঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায় দুয়ের প্রকাশ-ভঙ্গীতে। মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরই সর্বস্ব, অর্থাৎ সুরের আরোহণ, অবরোহণ, বাদী, সম্বাদী, শুদ্ধ, কোমল, কড়ি স্বরের সাঙ্গীতিক ব্যাকরণের চুলচেরা বিচারই প্রধান, বাণীর ভূমিকা সেখানে নিতান্তই গৌণ, অপরদিকে লোকসঙ্গীত বাণী-প্রধান সঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের অবয়ব তার বাণী, সুর তার অলঙ্কার। শুধু সুরের চর্চাতেই লোকসঙ্গীত সম্পূর্ণ হয়না, সুর ও বাণীর মেলবন্ধন ঘটলেই লোকসঙ্গীত হয় রসোত্তীর্ণ। কথা ও সুর উভয়ের সুসামঞ্জসের ফলেই লোকায়ত সঙ্গীত চিরায়ত হয়ে ওঠে। "রাগ সংগীতের গানের ভাষা এমন সহজ ও ব্যবহার্য যে রচনার প্রতিটি শব্দকে ভেঙে সহজে সুরের দ্বারাই উচ্চারিত, অনুক্ত, খণ্ডিত, দমপ্রযুক্ত, রৌদ্র রস-চিহ্নিত, করুণ ও গম্ভীরতায় পরিণত করা যেতে পারে। বাণী বা কথার পূর্ণ উচ্চারণের প্রয়োজন এখানে গৌণ হয়ে পড়ে। সুর প্রয়োগের প্রাধান্যই এখানে বিশেষ। কোন ধ্রুপদ ও খেয়াল গান যদি গায়ক সমাজে আদরণীয় হয় তা বিশেষ করে হয় গীতিভঙ্গি বা কায়দার জন্যে। রাগ সঙ্গীতের শ্রোতা ঢং-এর সমাদর করেন। রাগ-সংগীতের ভঙ্গি বা কায়দা বাংলা গানের কায়দার সঙ্গে সমগোত্রীয় নয়। বাংলা রচনায় উচ্চারণ রূপান্তর অথবা সুরের ক্ষেত্রে সামান্য হেরফেরও গ্রাহ্য নয়। সুর এখানে অবলম্বন মাত্র। বাংলা গান কথাকে কোনো প্রকারে ক্ষতবিক্ষত হতে দিতে প্রস্তুত নয়।"[৬]

লোকসঙ্গীত ও মার্গ সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তার শিক্ষা প্রণালীতেও। লোকসঙ্গীত সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে উৎসারিত, তারজন্য কঠোরভাবে 'সরগম' শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে মার্গ সঙ্গীত রীতিমত সাঙ্গীতিক ব্যাকরণের নিয়ম মেনে শিক্ষা করতে হয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কাঠামোতে ভুল হলে তা শুদ্ধ রাগসঙ্গীত হয় না, এই সঙ্গীত শিক্ষার জন্য গুরুর কাছে 'নাড়া' বেঁধে তালিম নিতে হয়, কিন্তু লোকসঙ্গীত শিক্ষার এমন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, লোকসঙ্গীত গায়কের গুরু তার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এর ফলে পরিশীলিত কণ্ঠ না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট গায়কের গান হয়ত অমার্জিত ও অসংস্কৃত মনে হতে পারে, কিন্তু জনজীবনের প্রাণের আকুতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই প্রকৃত লোকসঙ্গীত। "লোক সংগীত বুদ্ধিজাত গান নয়, জীবনের সব কিছু আটপৌরে ব্যাপার এতে জড়িয়ে

আছে। যা কিছু সাধারণ মানুষের মনকে নাড়া দেয়, জীবনের মুখোমুখি হয়ে সে যা কিছু দেখেছে, অনুভব করেছে সে সবকেই মানুষ সুরের বাঁধুনী দিয়ে গানের রূপ দিয়েছে। সুরের দিক থেকে লোকসংগীত রাগ-রাগিণীর বাঁধনমুক্ত। অনেক দিন থেকে চলে আসা গান গাইবার বিশেষ ভঙ্গীটি লোক-সংগীতের বিশেষত্ব। ভাবকে অনুকরণ করে বয়ে চলে।”[৭]

মার্গসঙ্গীতকে ‘উচ্চাঙ্গ’ সঙ্গীতও বলা হয়। উচ্চাঙ্গ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের বা উচ্চবর্গ সমাজের সঙ্গীত। আর্থনীতিক বিচারে সমাজে উচ্চবিত্তের মধ্যে প্রচলিত অর্থেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নামকরণ হয়েছে। কারণ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার প্রথম দিকে রাজদরবারে বা উচ্চবিত্তের আসরেই শাস্ত্রীয় বা রাগ সঙ্গীতের অনুশীলন হত। সেই সঙ্গীতই গুণীজনের পক্ষপাতিত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে সমাজের দেশজ অভিব্যক্তির প্রকাশে যে সঙ্গীত আম-জনতার মনোরঞ্জন করত, তাকে বলা হয় দেশী বা লোকসঙ্গীত।

শাস্ত্রীয়সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য রয়েছে, উভয়ের গীত-রীতি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞায়। মার্গসঙ্গীতের অনুশীলন এবং এই সঙ্গীত পরিবেশনায় কোন বয়স বা নারী পুরুষের উপর নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু লোকসঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ গানে এই ধরণের বিধি নিষেধ বিদ্যমান। যেমন ‘হুদুমদ্যাও’-এর গান, বিয়ের গান, সাধভক্ষণের গান কেবল মেয়েরাই গায়, কোন পুরুষ এ গান গায় না। এমনকি ‘হুদুমদ্যাও’-এর গান পুরুষের শোনাও বারণ, আবার তারার ব্রত, পুণ্নিপুকুর ব্রত, সূর্যপূজোর গান—ইত্যাদি কুমারী মেয়েদের গান। কিন্তু শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে এই ধরণের কোন বিধি-নিষেধ নেই তবে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে যা আছে তা সময়ের বিভাজন। দিন রাত্রির বিভিন্ন সময় অনুযায়ী বিভিন্ন রাগ-রাগিণী পরিবেশিত হয়। অবশ্য এই বিধি নিষেধও ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে।

লোকসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাব থাকলেও উভয় ধরনের সঙ্গীত প্রবাহ বয়ে চলেছে স্ব স্ব ধারায়। সঙ্গীত সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কোন সঙ্গীতের উপর কোন সঙ্গীতের প্রভাব পড়েছে তার পরিচয় আজ হারিয়ে গেছে অন্তহীন কালের অতল গহ্বরে। স্বমহিমায় আপন সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়িয়ে উভয় ধরনের সঙ্গীতই জনমানসে স্থান করে নিয়েছে সুস্পষ্টভাবে। লোকসঙ্গীত আর শাস্ত্রীয়সঙ্গীত পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবিত হলেও শ্রোতার শ্রুতিতে এই দুই সঙ্গীতধারা সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত।

৩. লোকসঙ্গীতে জনজীবনের প্রতিফলন ঃ

নগর সভ্যতার বাইরে যে বিশাল জনসমাজ রয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত সঙ্গীতকেই লোকসঙ্গীত বলা হয়। 'ফোক' বলতে ইংরেজীতে অবশ্য unsophisticated বা অসংস্কৃত জনসমাজকেই বোঝায়। এই সরল ও অসংস্কৃত জনসমাজের প্রতিফলনই লোকসঙ্গীতের প্রাণ। অবশ্য এই লোকসঙ্গীত কেবল গ্রামীণ জীবনচর্চাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে দূর থেকে দেখা নাগরিক জীবনের কল্পনাময় ছবির কথাও বলে। ফলে যে সঙ্গীত মূলতঃ উদ্ভূত হয়েছে লোকজীবনের কথায় তাকে বর্তমান সভ্যতার প্রভাবে শহুরে জীবনের মোহময় হাতছানিও প্রলুব্ধ করেছে নানাভাবে। নাগরিক জীবনের অজানা সুখের হাতছানিতে তাই গ্রামীণ জীবনেও ওঠে ঢেউ, উত্তরবঙ্গের দোতারার ডাং-এ আর চট্‌কা গানের কলিতে তারই আভাস—

'আমার বাংলায় করে মোন ফাপর
চল যাই কইলকাত্তা শহর।'

অন্য একটি লোকসঙ্গীতে পাওয়া যায় ঢাকার তৈরী মস্‌লিন শাড়ীর কথা। এই শাড়ী দিয়ে অভিমানী প্রিয়ার মানভঞ্জনে গ্রামের নায়ক গেয়েছে—

'গা তোল গা তোল কইন্যা ফিন্‌দো ঢাহাই শাড়ী
ঢাহাই শাড়ী ফিন্‌দা কইন্যা যাইবে শউর বাড়ী'

নাগরিক জীবনের প্রতি এই আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্যের কারণেই। শহুরে জীবনের জৌলুষ চোখ ধাঁধিয়ে দেয় গ্রাম জীবনের তাই সাধারণ মানুষের মনে এক অদম্য কামনা তীব্র হয়ে ওঠে নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ উপভোগের আশায়। অন্যথা গ্রামীণ জীবনযাত্রা বয়ে চলে আপন খাতে নিজস্ব সংস্কৃতি ও লোকাচারের পথ ধরে, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের সুসংস্কৃত বা মার্জিত জীবনধারা প্রবাহিত স্বতন্ত্রখাতে, দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

লোকসমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার, পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি, নিয়ম-নিষ্ঠা সব কিছুই লোক-বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। লোক-জীবনের হাঁচি-টিকটিকির বাধা, নাগরিক জীবনের বৈজ্ঞানিক জীবনধারার সঙ্গে মেলেনা, মেলেনা ভূত-পাওয়া, বাতাস-লাগা বা খরা, বন্যা, কলেরার প্রাদুর্ভাবে, কোন দেবতার রোষের বিশ্বাসও। মানুষের আদিম সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ে তাই একদিকে বয়ে চলেছে লোক-বিশ্বাস, অন্যদিকে চলেছে সুসংস্কৃত নাগরিক জীবনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুযায়ী সব

কিছুর বিচার-বিশ্লেষণ। লোকায়ত এই বিশ্বাসের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায় জনজীবনের গানে বা লোকসঙ্গীতে। লোকসঙ্গীত এই লোকজীবনের ভাব, ভাষা, ধর্ম, সংস্কার, আচার ও বিশ্বাসের অদ্বিতীয় সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে লোকসঙ্গীত সাধারণ গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রাত্যহিক ক্রিয়া কলাপের বিচিত্র অভ্যাস, আচরণ ও বিশ্বাসের এক কাব্যিক ও ছান্দিক বহিঃ-প্রকাশ। এর ভাব, ভাষা ও সুর তাই অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত।

"লোকসঙ্গীত মানবচিত্তের আদি ও সহজ ধর্ম। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পৃথিবীর সবদেশের মানুষ অশরীরী শক্তি, ভূত-প্রেত, দেব-দেবী, পীর-পীরাণী ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রভৃতির প্রতি পূজা-অর্চনা, প্রার্থনা বা নৈবেদ্য প্রকাশ করে আসছে গানের মাধ্যমে। অতি-প্রাকৃত শক্তির কাছে মানুষের এই যে বিনম্র মনোভাব তা যুগ যুগ ধরে বিধৃত হয়েছে এদেশের মানুষের ধর্মীয় চেতনায়, আচার-আচরণে, বিশ্বাস-সংস্কারে এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের পরতে পরতে।"[১]

সাধারণ মানুষের এই লোকাচার ও ধর্মশিবাসেরই বাণীরূপ লোকসঙ্গীত। জীবাণুর দ্বারা রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি পায় এবং উপযুক্ত প্রতিষেধক গ্রহণ করলে বা সময়ে চিকিৎসা করালে সেই রোগের উপশম হয়, এ সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণের ধারণা স্পষ্ট নয়, ফলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে তারা দেখতে পায় দেবতার রোষদৃষ্টি, আর তাই দেবী ওলাওঠা বা শীতলার পূজা দেওয়া হয় গ্রামে গ্রামে—কলেরা বা বসন্তরোগ দেখা দিলে। রোগমুক্তির আশায় বা গ্রামে মহামারীর হাত থেকে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় শুরু হয় শীতলা পূজার গান বা ওলাওঠা বা ওলাবিবির গান ঃ—

'পদ্মের আসন পদ্মের চাটন পদ্মের সিংহাসন।
পদ্মের পাতায় জন্ম নিলেন সত্যনারায়ণ ॥
ঘট কেন নড়েরে দেবীর আসন কেন টলে।
ঐ আইতাছেন মা শীতলা এই আসনের পরে ॥'

জীবনে চলার পথে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এইসব মানুষের কণ্ঠে ঝরে পড়ে কেবল আবেদন আর নিবেদনের গান, দেবদেবীকে তুষ্ট করে জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানুষ চায় স্বীয় সমস্যার সমাধান ও অভয়বাণী। আজও গ্রামীণ জনগণ প্রকৃতি বা অজানা দেবতার কাছে নিজেদের জীবনকে বাঁধা রেখে দিন গুজরাণ করে। তাই মনের আকুতি প্রকাশ করে গানে গানে। বর্ষাকালে খানা গর্ত সব জলে ভরাট হলে সাপের উপদ্রব বাড়ে, তাই তখন গ্রামাঞ্চলে মা মনসার কাছে সকলের কাতর আবেদন ফুটে ওঠে

মনসামঙ্গল বা ভাসান বা বিষহরী গানের মধ্যে, যাতে সর্প দংশনে কারও প্রাণ না যায়।

যান্ত্রিক উপায়ে জলসেচ ব্যবস্থা গ্রামীণ জীবনের সর্বত্র আজও পৌঁছায়নি, প্রথম অবস্থায় বর্তমানের অগভীর নলকূপ খনন বা খাল কেটে জলসেচেরও ব্যবস্থা ছিলনা, তাই কৃষিজীবী মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল প্রাকৃতিক জলসেচ অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের উপর। সময়ে বৃষ্টি না হলে দেখা দিত খরা, কৃষকের পড়ত মাথায় হাত। তখন বৃষ্টি কামনায় কৃষক রমণীগণ পালন করতেন নানা আচার, যার প্রতিফলন দেখা যেত সঙ্গীতের উপরেও। উত্তরবঙ্গের কৃষক রমণীগণ পালন করেন এক বিশেষ সংস্কারবন্ধ অনুষ্ঠান, 'হুদুম দাাও'-এর পূজা ও গান। 'হুদুম দ্যাও' অনুষ্ঠানের একটি গান—

'হিলহিলাচে কমরটা মোর শিরশিরাচে গাও'
কোন্‌ঠেখানায় গেইলে এলা হুদুমার দ্যাকা পাঁও' (সংকঃ পৃঃ ৭২)

উত্তরবঙ্গের মালদহ ও পশ্চিমদিনাজপুর অঞ্চলে পালিত হয় মেঘ বা ম্যাগারাণীর ব্রত। এই ব্রতের অন্যতম গান—

'হ্যাদে লো বুন ম্যাগারাণী
হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানি।" (সংক পৃঃ ৭৩)

জনগণের যে অংশ আজও প্রকৃতির বা অজানা শক্তির কাছে নিজেদের ভাগ্যকে বাঁধা রেখে জীবনধারণ করে, তাদেরই গান লোকসঙ্গীত। বঙ্গদেশের লোকসমাজে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায় অতিবাহিত হয় কতকগুলি রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার আলোক কিছুটা প্রভাব ফেললেও আজও সাধারণ-ভাবে গ্রাম-জীবনে অপ্রতিহত গতিতে বয়ে চলেছে প্রাচীন ঐতিহ্যের বা সংস্কারের ধারা। আজও তাই বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত নানা লোক উৎসব, আর এই লোক-উৎসবকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে লোকসঙ্গীত। আধুনিক পপ, জ্যাজ, ট্যাঙ্গো প্রভৃতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব গ্রামজীবনকে খানিকটা গ্রাস করলেও গ্রামীণ মূল সংস্কৃতিতে এখনও লোকসঙ্গীতের সুর বয়ে আনে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ; যা কোন 'লোকাধুনিক' সঙ্গীতে পাওয়া যায়না। যে সঙ্গীত লোকসঙ্গীতও নয় আবার আধুনিক সঙ্গীতও নয়, অথচ এই দুয়ের মিশ্রণে গঠিত এক সঙ্কর জাতীয় সঙ্গীত, তাকেই আমি 'লোকাধুনিক' আখ্যা দিয়েছি। এইসব সঙ্গীতে না আছে গ্রাম জীবনের কথা, না নাগরিক জীবনের ছবি, সুরের বিচারেও তা কোন সঙ্গীতেরই অনুসারী নয়। সেই সঙ্গীতেই জনজীবনের প্রতিফলন দেখা যায় যাতে জনজীবনের কথা রয়েছে, যে

সঙ্গীতে জনজীবনের চিন্তা ভাবনা-প্রসূত স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন রয়েছে।

"প্রতিদিনের আটপৌরে জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মের জীবন, ধর্ম-নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক জীবন, সব কিছুর ছবি ধরা পড়েছে লোকসংগীতে। সাধারণ মানুষের জীবনের সামাজিক ইতিহাস অনাগত কালের জন্যে ধরা রয়ে গেছে লোকসংগীতের অনেক গানে।"[২] জীবনযুদ্ধের এই চিরন্তন ঘটনাই মূর্ত হয়ে ওঠে লোকসঙ্গীতে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন বৃত্তির, সেবৃত্তি নানা ধরণের। প্রকৃতির মানস-সন্তানেরা প্রকৃতি থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে। তাই জনজীবনে প্রকৃতির অরণ্য সম্পদ লোকায়ত জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অরণ্যে কাঠ সংগ্রহ করে কাঠুরিয়া বা বাওয়ালিয়া, মধু সংগ্রহ করে মউল্যা, হাতী ধরতে যায় মাহুত, মোষ চরায় মৈষাল। সকলের জীবনেই রয়েছে পদে পদে বিপদাশঙ্কা। এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য নিবেদিত হয় নানা অর্ঘ্য, বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর উদ্দেশে। বনদেবী, বনবিবি, শালেশ্বরী, ধামসেবা, বাঘের দেবতা দক্ষিণরায় বা বুনো হাতীর উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন নিবেদনে সঙ্গীতেরই বাহুল্য। যেমন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় হাতীর উদ্দেশ্যে নারী কাতর আবেদন জানায়—

'আরে ও মোর জোঙ্গলিয়া হাতীরে, মিনতি করুরে তরে
ওভাগোনীটাক আড়ি না করিস এ ভোব সইংসারে।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৬১)

কৃষিজীবীর পক্ষে তার জীবন ধারণের অবলম্বন জমি। এই জমিতে ফসল ফলিয়ে সে সারাবছরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। সেই জমিপূজো বা ভুঁই-পূজো উপলক্ষেও গীত হয় লোকসঙ্গীত। মূলতঃ মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচলিত একটি গান—

'হারে ও আমার কাতিশাল, বছর বছর থাকিসরে বহাল
ভুঁই আমাদের মাতাপিতা ভুঁই আমাদের নাতি ছাওয়াল'। (সঙ্কঃ পৃঃ ৭৭)

ভূমি-পূজো যেমন কৃষক সমাজের জীবনধারণের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে, তেমনি নদী পূজোও কৃষিজীবীদের এক আবশ্যিক সংস্কার বিশেষ। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে নদী পূজো শুধু আচার-প্রধানই নয়, ধর্মের সঙ্গেও জড়িত। নদী পূজার মধ্যে তিস্তা নদীই প্রধান ও পবিত্র। এজন্য তিস্তাবুড়ি পূজো, ভেদেই খেলা বা মেচেনী খেলা মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পবিত্র অনুষ্ঠান। তিস্তাবুড়ি পূজার বন্দনা গানের নমুনা—

'শূন্যের মইদ্যে পন্নাম করি বুড়াবুড়ি
পাটের মইদ্যে পন্নাম করি মহামায়ী তিস্তাবুড়ি।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৬৬)

লোকজীবনে মাঝি বা নাইয়ার বৃত্তিও সুপ্রচলিত। জীবন ধারণের অন্যতম উপায় হিসাবে অনেকেই দূরদেশে পাড়ি জমায় নৌকার মাঝি-বৃত্তি নিয়ে। এই বৃত্তিও লোকসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।

'আরে ও সলঙ্গা নায়ের মাজি
কোনদিন ভাটাইবেন নৌকা আমরাও যেন জানি মাজিরে।' (সংকঃ পৃঃ১২)

বৃত্তিগত সঙ্গীতের আর এক দিক শ্রম বা কর্মসঙ্গীত। ব্যক্তিগত বৃত্তি ছাড়াও সমষ্টিগত কাজের মধ্যে ছড়িয়ে আছে গ্রামীণ জনজীবন। জনজীবনের এই দিকের প্রতিফলনও হয়েছে লোকসঙ্গীতে। যেমন ছাতপেটানোর গান, (বর্তমানে অবশ্য ঢালাই ছাতের প্রবর্তন হওয়ায় ছাত পেটানোর গান অবলুপ্তির পথে), টিউবওয়েল বসানোর গান, ভুঁই নিড়ানোর গান, পাটকাটার গান, ধান-ভানার গান ইত্যাদি কর্ম সাধারণতঃ দলবন্ধভাবেই করা হয়। জীবনের এই-সব বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষ অবসর বিনোদনে বা শ্রমের লাঘব করতে সমবেত কণ্ঠে গান করে, এতে কর্ম-প্রেরণাও আসে। সময়, অবস্থা ও বক্তব্যের বিষয়ানুযায়ী এইসব গানের ভাব, ভাষা ও সুরেরও পরিবর্তন হয়। ভুঁই-নিড়ানো বা জমি পরিষ্কার করার সময়ে সাধারণতঃ গাওয়া হয় এমন একটি গান—

'আয়রে তরা ভুঁই নিড়ইতে যাই।
ভুঁই মোগো মাতা পিতা ভুঁই মোগো পুত
ভুঁইয়ের দৌলতে মোগো আশিকাটা সুক।' (সংকঃ পৃঃ ৮২)

শ্রমসঙ্গীতের পাশাপাশি আবার অবসর বিনোদনেরও লোকসঙ্গীত রয়েছে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত মাঝি শ্রম থেকে বিরাম নিয়ে ভাটিতে নৌকা ছেড়ে পরম পিতার কাছে জানায় প্রাণের আকুতি।

'মোন মাজি তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পারলাম না।' (সংকঃ পৃঃ ২)

বঙ্গে, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু পরিবারে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। বর্তমানে অবশ্য আরও নতুন নতুন পার্বণ যুক্ত হয়েছে। বিবাহ-বার্ষিকী, জন্মদিন, চাকুরীতে উন্নতি প্রভৃতি উপলক্ষে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠান যোগ হয়েছে সাধারণের জীবনযাত্রাতেও। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম বিবাহ অনুষ্ঠান। গ্রামবাংলায় এই বিয়েতে গীত হয় নানা গান। হলুদ কোটার গান, গায়ে হলুদের গান, জল সইবার (ভরার) গান, জামাই বরণের গান, বাসি বিয়ের গান, বাসর ঘরের গান এবং সবশেষে কন্যার শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সময় কন্যা ও পিতামাতার বিচ্ছেদের করুণ গান—

'ওকি ও গাড়ীয়াল ভাই—।
ওরে আইস্তে বোলান গাড়ীয়াল ওরে ধেরে বোলান গাড়ী
ওরে একনজর দ্যাকিয়া লই মোর দয়াল বাপো বাড়ী' (সঙ্কঃ পৃঃ ৬৮)

অন্যদিকে রয়েছে গর্ভবতী কন্যার সাধভক্ষণ, সন্তানের জন্ম, সন্তানের নামকরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত। গর্ভবতী বধূর সাত মাসের সময় একটি বিশেষ দিনে তাকে পছন্দমত খাদ্য সম্ভারে আপ্যায়িত করা হয়; সেই অনুষ্ঠানই সাধভক্ষণ। এই উপলক্ষে গীত একটি গান।

'লাউলোর বউলো সাধন্তি, কি কি খাইতে সাদ
ঘরের ছাইঞা কাজলা সীম, তাই খাইতে সাদ' (সঙ্কঃ পৃঃ ৭৪)

শিশু জন্মের সাতদিনের দিন অনুষ্ঠিত হয় 'হাটইর‍্যা বা আটকড়াই ফুটকড়াই' অনুষ্ঠান। এদিনে শিশুর নামকরণও হয়। উত্তরবঙ্গের নানা-স্থানে অনুষ্ঠিত এই নামকরণ অনুষ্ঠানের একটি ছড়া জাতীয় গান—

'লাউলোর ঘরে পোলা আইছে কি নাম থুইমু
আম গা হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু'।

জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানই এইভাবে লোকসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। জনজীবনের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, জীবনযুদ্ধের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন সংশ্লিষ্ট লোকসঙ্গীতেও পড়েছে। সমাজ জীবনের এই সঙ্গীতে ফুটে ওঠে সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির ছবি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাজনীতিরও আভাস পাওয়া যায় লোকসঙ্গীতে। যেমন একটি ভাওয়াইয়া গানে রয়েছে—

'আমরা ধান কাটিরে—।
সগায় মিলি খাটিখুটি কি পাইলোংরে ধান
(হায়রে)প্যাটের ভোকত্ দিন কাটে শুন্যা দোত্‌রার গান'। (সঙ্কঃ পৃঃ৭৬)

একদিকে জীবনযুদ্ধ অন্যদিকে দেহমনে যৌবনের আকুতি—যা কালক্রমে বিকশিত হয় গভীর গোপন প্রেমে। এই প্রেমের গানও জীবনের গান, লোক-সঙ্গীতে তারও অভাব নেই। প্রকৃতির সঙ্গে অহরহ জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত থাকা সত্বেও এইসব সহজ, সরল সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রেমের হাতছানি দেখা যায়, তাদের প্রাণের ভালবাসা আর সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ হয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গের সরল বালিকা তার প্রেম নিবেদন করে তার স্বপ্নের নায়ক মৈষাল, মাহুত, নাইয়া, গাড়ীয়াল, কবিরাজ বা ঘরের পাশের চ্যাংড়া বন্ধুকে। মৈষালের প্রেমিকার মন তাই হয় উচাটন, সঙ্গীতের মধ্যেই প্রকাশ পায় নারীর মনের বেদনা!

'পাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্দুরে।
মৈষ চরান মৈষাল বন্দু ঘাটের উজানে
(ওরে) বাঙর ভৈষের ঘণ্টির বাইজে
মোন মোর উড়াং বাইরং করে রে।' (সঙ্কঃ পৃঃ ১০)

নিষ্কলুষ প্রেম নিবেদন ছাড়াও পরকীয়া প্রেমেরও ঘাটতি নেই লোকসঙ্গীতে। দেবরের প্রতি বৌদির প্রেম সমাজব্যবস্থায় নিন্দনীয় হলেও প্রেমের এই বিচিত্রগতির কথা অপ্রকাশিত থাকেনা। ভাওয়াইয়া লোকগীতিতে তারই আভাস—

'ওরে সোনার দ্যাওরা।
তোক্ দিয়া মোর নাই হয় ক্যানরে বিয়া।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৫৩)

জীবনযাত্রার বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাবেই পুষ্ট লোকসঙ্গীত। জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, সংগ্রাম ও জয়লাভের আনন্দের বার্তাই ফুটে ওঠে লোকসঙ্গীতের পরতে পরতে। লোকজীবনের সঙ্গীত বলেই তা লোকসঙ্গীত, লোকজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে সঙ্গীত হয় স্বধর্মচ্যুত, সে সঙ্গীত পরিণত হয় 'লোকাধুনিক' সঙ্গীতে। শ্রুতিনির্ভর এই সঙ্গীতের নেই কোন স্বরলিপি, প্রকৃতি ও জনজীবনই লোকসঙ্গীত শিক্ষার প্রথম ও একমাত্র গুরু, জনজীবনের গতির সঙ্গে সে সঙ্গীত সতত প্রবহমান। লোক পরম্পরায় প্রচলিত এই সঙ্গীত চলে আসছে যুগ থেকে যুগান্তরে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, ফলে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এবং স্মৃতি-বিস্মৃতির প্রভাবে একই সঙ্গীতেরও রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। সব কিছুর প্রভাবেই প্রভাবান্বিত লোকসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত লোকজীবনের দর্পণ, জনজীবনের বাঙ্ময় প্রকাশ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ভাওয়াইয়া গানের ইতিহাস বিচার

১. 'ভাওয়াইয়া' গানের নামকরণ

'ভাওয়াইয়া' গানের নামকরণের ইতিহাস পর্যালোচনায় সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারার। 'ভাব' সম্বলিত সঙ্গীত বলেই এই গানের নাম 'ভাওয়াইয়া' হয়েছে—সাধারণভাবে ব্যক্ত এই অভিমত সম্পর্কে বলা যায় ভাওয়াইয়া কেন বাংলার যেকোন সঙ্গীতই ভাব-সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুল-প্রসাদের গান, কান্তগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুলগীতি এমন কি আধুনিক গান—সব ধরণের সঙ্গীতই ভাব সমৃদ্ধ, কিন্তু এগুলি ভাওয়াইয়া নয়। 'ভাব' শব্দটি এক অর্থে ভাব বা ভালবাসা বোঝায় সেক্ষেত্রেও ভাওয়াইয়া কেবল প্রেম-সঙ্গীতই নয়, এই সঙ্গীতে প্রেমের অভিব্যক্তির প্রকাশ থাকলেও এই গানে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার ছবিই ফুটে উঠেছে।

'ভাওয়াইয়া' নামকরণে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেন যে উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন বিহারের 'ভাও' শব্দ থেকেই ভাওয়াইয়া নামকরণ হয়েছে, কিন্তু এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ হিন্দীতে 'ভাও' বলতে দরদাম বোঝায় সেক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গীত ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে কেনাবেচার মত নিকৃষ্টভাবের কোন সম্পর্ক স্থাপন কষ্ট কল্পনামাত্র। তাছাড়া ভাওয়াইয়া গানের বিস্তৃতি মূলতঃ উত্তরবঙ্গ ও মৈমনসিংহ এবং রংপুর জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে, এর সঙ্গে বিহারের জনসমাজ ও তাদের ভাষা রাজবংশীদের লোকায়ত জীবনের গানের নামকরণে প্রভাব ফেলবে একথা স্বীকার করা যায়না। আবার উত্তরবঙ্গে চা বাগিচার জন্য বিহারী শ্রমিক আনা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে—অর্থাৎ রাজ-বংশীদের গানের প্রচলন হওয়ার অনেক পরে, সেই বিচারেও 'ভাও' শব্দটির 'ভাওয়াইয়া' নামকরণে কোন ভূমিকা নেই।

রাজবংশী উপভাষায় 'ভাওয়াইয়া' শব্দের অর্থ উদাস বা 'ছন্নছাড়া' যেমন রাজবংশীরা কথায় বলে, 'মানষিডা এক্কেবারে ভাওয়াইয়া হইচেরে'—অর্থাৎ মানুষটা একেবারে উদাসী বা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। সুতরাং দেশজ শব্দগত অর্থের বিচারে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের অর্থ উদাসী বা বিবাগীর গান। কিন্তু এ গান কেবল উদাসী বা বিবাগীদেরই গান—একথাও ঠিক নয়, সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষের কথাই ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তু। আবার ভিন্নমতে বলা হয় 'ভাওয়া' বা নীচু জমিতে গাওয়া মৈষালের গান বলেই ভাওয়াইয়া নামকরণ হয়েছে। "ভাওয়া—মহিষের চারণক্ষেত্র, মরা নদীর দোলা জমিতে-জাত

মধ্যুয়া কাশিয়ার বন—মাসের পর মাস যখন মইষালেরা মহিষের পিঠে চড়িয়া মহিষ চরাইয়া বেড়াইত তখন তাহাদের নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সঙ্গী ছিল হাতের দোত্‌রা। এই দোত্‌রা বাজাইয়া তাহারা স্বরচিত বা অন্য কোন মইষাল রচিত বিরহগান গাহিত। * * * আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, ভাওয়া থেকেই ভাওয়াইয়া গানের উদ্ভব হইয়াছে, ভাব হইতে কখনও নয়।”[১]

এই মতবাদ সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক গ্রহণযোগ্য। কারণ যদি কেবল 'ভাওয়া' অঞ্চলের গানই ভাওয়াইয়া নামে পরিচিত হত, তাহলে সে গানের সার্বজনীনতা থাকতো না। আর গানে নারীর দুঃখ বেদনার প্রাধান্য থাকায় একথা নিশ্চিত যে ভাওয়া অঞ্চলে নারীর যাওয়ার অধিকার ছিলনা স্বভাবতই কেবল ভাওয়া অঞ্চলেই উদ্ভূত গান এ নয়, তাই এর নামকরণে ভাওয়া শব্দটির প্রভাব থাকলেও কেবল ভাওয়া অঞ্চলের গান বলে এ গানের নামকরণ ভাওয়াইয়া হয়েছে এমন সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়না। অনেকে এমন অভিমত প্রকাশ করেন যে এই গানের প্রকৃত নাম 'বাওয়াইয়া' উচ্চারণ বিকৃতি ঘটায় রাজবংশী ভাষায় 'ব' 'ভ' হওয়ার প্রবণতা থাকায় 'বাওয়াইয়া' কালক্রমে 'ভাওয়াইয়া' হয়েছে। দূরে দোলা অঞ্চল 'ভাওয়া' বা 'পাতার' (মাঠ) থেকে গাওয়া গানের সুর 'বাও' অর্থাৎ বাতাসে ভেসে লোকালয়ে আসতো, সেই কারণেই এই গানকে বাওয়াইয়া বা উচ্চারণ বিকৃতিতে ভাওয়াইয়া বলা হয়। এই অভিমতও আংশিক গ্রাহ্য হলেও এ প্রশ্ন থেকেই যায় যে যখন নারীর বিশেষতঃ অবিবাহিতা নারীর দূরে দোলা জমিতে একলা যাওয়ার অধিকার ছিলনা সেই সময় উদ্ভূত গানে নারী মনের যন্ত্রণার ছাপ এত প্রকট হয় কিভাবে।

ভাওয়াইয়া নামকরণ সম্পর্কে আরও একটি অভিমত হল, “ভাওয়াইয়া বা 'ভাওইয়া' শব্দটি প্রাকৃত 'ভাও' অর্থাৎ ভাব এবং সংস্কৃত 'আওয়াই' অর্থাৎ জনরব শব্দ দুটি হতে উদ্ভূত হয়েছে। বস্তুত ভাবযুক্ত জনরব পরবর্তী ভাবোচ্ছ্বাসময় কথা ও সুরের সমন্বয়ে ভাওয়াইয়া সংগীতের রূপ নিয়েছে।”[২] এখানেও ভাবসমৃদ্ধ সঙ্গীতের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু কেবল ভাবপ্রধান সঙ্গীত হলেই তা ভাওয়াইয়া নয়। ভাওয়াইয়ার নামকরণ সম্পর্কে আর একটি অভিমত হল, “রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার অঞ্চলে দোত্‌রার সঙ্গে একশ্রেণীর গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ভাওয়াইয়া'। আর যারা এ গান গায় তাদের বলে 'বাউদিয়া'। * * * এই খেয়ালী বাউদিয়া আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে যে গীত ও লহরী তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাওয়াইয়া'।”[৩] বাউদিয়ার গান বলেই একে ভাওয়াইয়া নাম দেওয়া হয়েছে—এই সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কেবল বাউদিয়ার

গান হলে এতে সাধারণ সুখ দুঃখ এবং প্রেমের এই প্রকাশ এত ব্যাপক হত না। বাংলার বাউল ও বৈরাগীর মত বাউদিয়ার কণ্ঠেও ধর্মমূলক ও আধ্যাত্মিক চেতনার গানেরই প্রাধান্য। ভাওয়াইয়া কেবল বাউদিয়ার গান নয়, সমগ্র সমাজের গান, মূলতঃ নারী হৃদয়ের বেদনার গান।

ভাওয়াইয়া নামকরণ নিয়ে আরও একটি অভিমত হল, "পূর্বরাগ লইয়াই প্রথম ভাওয়াইয়া গানের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য 'ভাব' শব্দের প্রাকৃত 'ভাও' রাজবংশী ভাষায় ভাওয়াইয়া নামে গানের নামকরণ হইয়াছে।"[৪] কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে কেবল পূর্বরাগই নেই, এই গানে রয়েছে বিচ্ছেদ-বেদনার হতাশ্বাস, রয়েছে পতির জন্য বিয়োগ-বিধুরা যুবতীর বিলাপ, সেই সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মাচার ও লোকাচার ও লোকসাংবাদিকতার ভাবও। রয়েছে আনন্দের গান আবার পরকীয়া প্রেমের আর্তি—সব মিলিয়েই ভাওয়াইয়া সমৃদ্ধ। কোন এক বিশেষ শ্রেণী বিভাগে এই সঙ্গীতকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ভাওয়াইয়া নামকরণ সম্পর্কে আরও একটি অভিমত, "নিশীথ আঁধারে সবার অলক্ষ্যে প্রেমিক প্রেমিকার গোপন অভিসার শুরু হোত নদী-বক্ষে ভাসমান ছোট্ট নৌকো 'ভাউলে'য়। যে গান এই "ভাউলে' থেকে সৃষ্ট হয় তার নাম ভাওয়াইয়া।"[৫] কিন্তু এই অভিমত নিছকই কল্পনা বলে মনে হয়। কারণ উত্তরবঙ্গে নদীর প্রাচুর্য থাকলেও সাধারণভাবে নদীগুলি নাব্য নয়, কারণ অধিকাংশ নদীই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তীব্রগতিতে সমতলে প্রবাহের ফলে অত্যন্ত খরস্রোতা, এই নদীতে নৌকা সামাল দেওয়াই কষ্টকর, সেই অবস্থায় নিশীথে অভিসারিকার সঙ্গে প্রেমালাপ বা সঙ্গীতের সুরে মনের কথা ব্যক্ত করার প্রয়াস নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা। তাই ভাউলে থেকে সৃষ্ট হয়েছে বলে এই গানের নাম ভাওয়াইয়া হয়েছে এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ঠিক কি কারণে ভাওয়াইয়া নামকরণ হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে বিভিন্ন বিষয় ও অবস্থাই যে সামগ্রিকভাবে ভাওয়াইয়া নামকরণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কোন একটিমাত্র কারণে ভাওয়াইয়া নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয় না। বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করে কেবল এক যুক্তিগ্রাহ্য অভিমতই দাঁড় করানো যায়, যদিও নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণায় মানব সমাজের আদি ইতিহাসের পরিচিতি পাওয়া গেলেও লোকসাহিত্য বা লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি বা তার নামকরণের সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। তাই প্রমাণাভাবে যা কিছু বলা হয় তা অনুমান ভিত্তিক হলেও এক যুক্তিগ্রাহ্য অভিমতে উপনীত হওয়া সম্ভব।

উত্তরবঙ্গ ও বর্তমান আসামের গোয়ালপাড়া ও গৌরীপুরে এমনকি, পশ্চিমবঙ্গ ও অধুনা বাংলাদেশেও 'ভাব' বলতে বোঝায় প্রেম ও ভালবাসা। যেমন 'তার লগে মোর ভাব হইচে'—অর্থাৎ তার সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়েছে বা 'ওমোর ভাবের দ্যাওরা'—অর্থাৎ ও আমার ভালবাসার দেবর, ইত্যাদি উদাহরণে ভাব অর্থে ভালবাসা বোঝানো হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক ভাওয়াইয়া গানই ভালবাসা বা প্রেমের গান। প্রেমিকের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে প্রেমিকাকে না পেয়ে যে ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়েছে, রাজবংশী সম্প্রদায়ে সেও বাউদিয়া। প্রেয়সীকে না পেয়েই হয়তো এইসব বাউদিয়ার কেউ হয়েছে বাথানের মৈষাল, আবার কেউবা বেছে নিত ছন্নছাড়া বাউদিয়ার জীবন। হাতের দোতারা সম্বল করে জীবনের ফেলে আসা দিনের কথা স্মরণ করে তারা গেয়ে ওঠে,

'আরে ও ভাবের দোত্‌রা—
নবীন বয়াসে মোক্ করিলরে বাউদিয়া।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৭)

অন্যদিকে জীবিকার তাগিদে গভীর অরণ্যে বাথান তৈরী করে যে মৈষালরা দিন কাটাতো তাদেরও জীবনের সাথী হাতের দোত্‌রা, ফেলে আসা জীবনের কথা গুমরে গুমরে উঠতো গলার সুরে। গায়ক যেন কল্পনায় নিজেকে প্রেমিকা সাজিয়ে নারী হৃদয়ের কান্না ফুটিয়ে তুলতো আপন কণ্ঠে। উঁচু-নীচু জমিতে মোষের পিঠে চলতে চলতে এই মৈষালের গাওয়া গানে দেখা দিত গলা ভাঙা বা ভাঙন। ভাওয়া অঞ্চলের বাউদিয়া (উদাসী) মৈষালের গাওয়া ভাবের (প্রেমের) গান বাওয়াইয়া আসে (বাতাসে ভেসে আসে) লোকালয়ে, আপ্লুত করে নারী হৃদয়কে। প্রেমিকার হৃদয়তন্ত্রে আঘাত করে সেখানে তোলে সুরের অনুরণন। অন্যদিকে বিবাগী বাউদিয়ার কণ্ঠেও ঝঙ্কার ওঠে তার আরাধ্য দেবতাকে না পাওয়ার বেদনার সুর। সব অভিমত নিষিক্ত করে 'ভাওয়াইয়া' নামকরণের কারণ হিসাবে বলা যায় ভাওয়া অঞ্চলের বাউদিয়া মৈষাল বা বিবাগী বাউদিয়ার কণ্ঠ-নিঃসৃত বাওয়াইয়া আসা ভাবের গানেরই নাম হয়েছে ভাওয়াইয়া।

২· ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি ও প্রতিবেশ :

জনজীবনের পারিপার্শ্বিকতা নিয়েই প্রতিবেশ। প্রতিবেশে রয়েছে মনুষ্য-সৃষ্ট সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ আর তারই পাশাপাশি প্রাকৃতিক অবস্থা। এই প্রাকৃতিক অবস্থাই ভৌগোলিক পরিবেশ। মনুষ্যসৃষ্ট সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং প্রকৃতি সৃষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ এই দুই অবস্থা একযোগে প্রভাবিত করে জনজীবনকে। প্রকৃতি-সৃষ্ট ভূপৃষ্ঠ, জলবায়ু, বনাঞ্চল, নদনদী, পশুপক্ষী সব কিছুরই প্রভাব তাই মানুষের জীবনে অপরিহার্য।

"সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই মানুষ তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন, আশা-নৈরাশ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে একান্তভাবে জড়িত। আদিম, অজ্ঞ ও অসহায় মানুষ প্রতিপদেই প্রকৃতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের সুখেও প্রকৃতি, অসুখেও প্রকৃতি, উৎসবেও প্রকৃতি বিপদেও তাই। এককথায় প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাদের জীবন-ভাবনা ছিল অসম্ভব। কালক্রমে শিক্ষা-সভ্যতার বিচিত্র জ্ঞান বিকাশের প্রসারে সেকালের একান্ত প্রকৃতি-নির্ভর মানুষ একটু সরে এসেছে, প্রকৃতির কোল থেকে। কিন্তু তাহলেও একালের অধিকতর মনোজীবী মানুষ দেহের প্রয়োজনে না হলেও মনের তাগিদেই নিসর্গের আরতি অর্চনাচায় একান্তভাবে। তাই তাদের লোক-সংগীতও একান্তভাবেই প্রাকৃতিক নিসর্গের প্রচ্ছন্ন প্রভাবসঞ্জাত।"[১]

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবমুক্ত নয়। জীবনযাত্রার ধারা যে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে ওঠে, জীবনের গান তথা লোকসঙ্গীতও সেই পরিবেশের প্রভাব-সঞ্জাত। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর একদিকে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণী অন্যদিকে গভীর বনাঞ্চল। এতদঞ্চলের বুক চিরে যেমন বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদ-নদী, তেমনি আবার দিগন্ত-বিস্তৃত 'দোলা' জমিরও অভাব নেই। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এখানকার জনজীবন, এই জনজীবন তাই প্রকৃতির প্রভাব এড়াতে পারেনি কোনক্রমেই। এরই ফলে এখানকার জনজীবনের গান ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতেও ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে বনাঞ্চল, খরস্রোতা নদ-নদী আর দিগন্ত বিস্তৃত দোলা জমি। উত্তর-বঙ্গের জনজীবনের গান ভাওয়াইয়াতে তাই বারবার আসে বনাঞ্চলের মাহুত, দোলাজমির মৈষাল আর খরস্রোতা নদীর নাইয়ার কথা। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ আর সার্বিক জীবনযাত্রাই ভাওয়াইয়া গানের উৎস।

"ভাওয়াইয়া গানের আদি উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই

অঞ্চল—জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার। এ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যই এখানে এ জাতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব ও কেন্দ্রায়নসম্ভব হয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ তরাই অঞ্চলের তিস্তা, তোরষা, মনসা, ধরল্লা নদীগুলো সংকীর্ণ ও খরস্রোতা। দ্রুত প্রবাহিত এই নদ নদীর ক্ষিপ্র গতির মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশিষ্ট চরিত্রগুণ প্রকাশ পেয়েছে।"[২]

এতদঞ্চলের ক্ষিপ্রগতির নদ-নদীতে প্রশান্তির চেয়ে উচ্ছৃলতাই বেশি, এখানকার মাঝি বা নাইয়ার গানে তাই টানা সুর বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনা, সে সুর নদীর ঘূর্ণিপাক আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ভেঙে ভেঙে উচ্চারিত হয়। এই সুরের মধ্যে খাঁজ বা ভাঙনই ভাওয়াইয়া গানের বৈশিষ্ট্য। এখানকার নদী সম্পর্কে ভাওয়াইয়া গানেই আছে—

"ওকি কানাইরে—।

আটো[১] নদীর খরো ধার[২], মইদে মইদে[৩] কানাই বালুচরো রে।

আপন হাতে শক্ত করি ধইরো নায়ের হাল রে॥"

[১—আবর্ত>আটো অর্থাৎ ঘূর্ণীপাক পূর্ণ। ২-খরস্রোতা ৩-মধ্যে মধ্যে] উত্তরবঙ্গের এইরকম ঘূর্ণীপাক পূর্ণ খরস্রোতা সংকীর্ণ পাহাড়ী নদীতে নৌকা সামাল দিতে মাঝিকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই এখানকার মাঝির গলার গানে আসে ভাঙন, কারণ ঘূর্ণাবর্তে নৌকা সামাল দেওয়ার সময় তার গায়ে যে ঝাঁকুনি লাগে তারই প্রভাবে টানা সুর যায় ভেঙে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের বৈশিষ্ট্য যে ভাঙন বা গলাভাঙা তার সৃষ্টির অন্যতম কারণ খরস্রোতা নদীর প্রভাব।

উত্তরবঙ্গের নদ-নদী যেমন এতদঞ্চলের সঙ্গীতে প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক অরণ্য বিশেষ করে দুর্গম তরাই অঞ্চলও এখানকার সঙ্গীতে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিস্তীর্ণ তরাই অঞ্চলের স্তব্ধতা এখানকার আদিবাসীদের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। অরণ্য প্রকৃতির নিস্তব্ধতা এখানকার সঙ্গীতে দীর্ঘটানের সুরের প্রকাশ ঘটিয়েছে, যদিও এই দীর্ঘটান ভাটিয়ালী বা বাউল গানের মত নয়, কারণ বাউল বা ভাটিয়ালীতে সুরে কোন ভাজ বা খাঁজ নেই, যা আছে ভাওয়াইয়ায়। তরাই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিচরণ করে বন্য হাতী ও মোষ, এই হাতী ও মোষ ধরে প্রতিপালন করার বৃত্তিতে নিযুক্ত রাজবংশী সম্প্রদায়। এই মারাত্মক বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়ে সেগুলির প্রতিপালন করতে গভীর বনাঞ্চলে দীর্ঘকাল প্রিয়জনকে ছেড়ে থাকার বেদনা গুমরে গুমরে উঠতো এইসব মাহুত আর মৈষালের কণ্ঠে। উদাত্ত কণ্ঠে নির্জন বনাঞ্চলে চলাকালে হাতীর পিঠের

মাহুত আর দোলা জমিতে মোষ চরানোর মৈষালের শরীরে যে ঝাকুনি লাগে তার ফলে তার গলার গানের সুরে আসে ভাঙন, এই ভাঙনই উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া মোষ খুঁজতে গিয়ে মৈষালের উচ্চস্বরে ডাকা 'টিয়ারা' ডাকে সৃষ্ট কম্পনও ভাওয়াইয়ার সুরে ভাঙনের বিশিষ্টতা এনেছে।

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে ভাঙনের বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি সম্পর্কে আরও এক অভিমত যে নির্জন শ্বাপদ সঙ্কুল বনপথে একাকী চলাচলের সময় মনে সাহস সঞ্চারের আশায় পথিক উচ্চস্বরে গান করতো, মনের গভীরে ভয়ের সঞ্চার থাকায়, এই গানের সুর তাই প্রায়শই কেঁপে কেঁপে উঠতো তার ফলে গানে ভাঙনের সৃষ্টি হত। এই ভাঙনই ক্রমে ক্রমে ভাওয়াইয়া গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।[৩]

বাংলায় ষড়ঋতুর প্রভাব থাকলেও উত্তরবঙ্গের ঋতু মূলতঃ তিনটি। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখরতাপে নদী নালা শুকিয়ে যায়, ফলে চাষাবাদের যেমন অসুবিধা তেমনি দেখা দেয় দারুণ জলকষ্ট। খরায় তাপিত পৃথিবীতে বৃষ্টিধারার প্রার্থনায় রাজবংশী সমাজে পালিত হয় বৃষ্টি কামনায় 'হুদুম দ্যাও'-এর পূজা বা 'ব্যাঙাব্যাঙির বিয়ে' কিংবা 'ম্যাগারাণীর ব্রতকথা'। সমস্ত লোকাচারই সঙ্গীত মুখর। গ্রীষ্মকালের পর বর্ষাকাল। আকাশে ঘনমেঘের ঘনঘটা, কুমারী মেয়ের প্রাণে চমকায় প্রেমের বিদ্যুৎ কণা। আবার দুঃখের গানেও বর্ষাকালের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির এই অবস্থা অনিবার্যভাবেই প্রভাব ফেলে জনজীবনের গান লোকসঙ্গীতেও। যেমন একটি গানের কলি—

'ভাদোর মাসে য্যামোন দ্যাওয়া বরিষণ করে
সেই ওভাগোনীর পইরন পাটের শাড়ীত্ নয়ান জল ঝরে' (সঙ্কঃ পৃঃ ৪৯)

বর্ষার ধারা-শ্রাবণ শেষ হতে না হতেই শীতের প্রকোপ শুরু হয়। চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের কোল ছোঁয়া উত্তরবঙ্গে উত্তরের হিমেল হাওয়া প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। প্রিয়ের অদর্শনে বিরহী প্রিয়ার হৃদয় শোকাকুল। উত্তরবঙ্গের বারমাস্যায় তারই সুন্দর রূপ ফুটে ওঠে গানের মাধ্যমে।

'কত পাষাণ বেঁধেছু বধূ হে
অঘাণ মাসে নতুন ধানা পৌষ মাসে নায়ের মালা
বধূ মাঘের শীত সহেনা পরাণে।' (সঙ্কঃ পৃঃ ২৯)

প্রকৃতির ঋতু ছাড়াও প্রকৃতি-সৃষ্ট জীবজগতের বিভিন্ন পশুপক্ষীও

লোকসঙ্গীতের কথামালায় স্থান পেয়েছে। হাতী, মোষ গরু ছাগল যেমন এসেছে তেমনি এসেছে কোকিল, ময়ূর, ঘুঘু, সারস, খঞ্জনা, ময়না, হাঁস প্রভৃতি পক্ষীকুলও। রাজবংশী ভাবুক কবি পাখীকে নিয়ে জীবনদর্শনের কথাও বলেছেন। উপমা হিসাবে বক বা সারস পাখীর জীবনযাত্রাকে মানব জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে গেয়েছেন জীবনের অনিত্যতার গান। 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে' (সংকঃ পৃঃ ৫) গানটি আপাতদৃষ্টিতে সারস পাখীর কথা হলেও এর অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করলে মানব জীবনের গূঢ় তত্ত্বের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় তার জন্মলগ্ন থেকেই। দৈনন্দিন জীবন-ধারায় মানুষ যেমন অনুভব করে ঋতু পরিবর্তনের স্পর্শ তেমনি তার জীবনের পরতে পরতে মিশে থাকে প্রকৃতির গাছপালা, ফুল, ফল, পাহাড়-পর্বত-ইত্যাদি। জীবনের চরম দুঃখের কাহিনী তাই সাধারণ মানুষ অবশেষে ব্যক্ত করে প্রকৃতিরই গাছপালার কাছে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানে প্রকৃতি নির্ভরতার এমনি এক অনবদ্য ছবি ফুটে ওঠে।

'ও বিরিক্ষো শিমিলারে গগনে ম্যালে ঠ্যাল
নারী হয়া অসের যৈবন আইক্‌পো কতয়কাল।" (সংকঃ পৃঃ ৩৭)

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে প্রকৃতি অন্যভাবেও প্রভাব ফেলেছে, তাহল প্রাকৃতিক অবস্থান। উত্তুঙ্গ হিমালয় বিশাল বাধার প্রাচীর হয়ে উত্তরে অবস্থানের ফলে ভাওয়াইয়া গানের বিস্তার উত্তরমুখী হয়নি। এই বিশাল অনতিক্রম্য পাহাড় পার হয়ে হিমালয়ের অপর পাড়ের মানুষের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষের সহজ যোগাযোগ ঘটেনি। অন্যদিকে হিমালয়ের অপর পাড়ের তিব্বতী ও ভোট-চীনীয় ভাষী মানুষের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়ায় পারস্পরিক আদান-প্রদানও গড়ে ওঠেনি। যদিও তিব্বত ও ভুটানের অধিবাসীরা ব্যবসায়িক তাগিদে সমতলে নেমে এসেছে বার বার, কিন্তু সমতলের আদিবাসীরা কখনও হিমালয়ের অপর পাড়ের 'নিষিদ্ধ দেশে' যাওয়ার চেষ্টা করেনি; ফলে রাজবংশী উপভাষায় তিব্বতী ও ভোট-চীনীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলেও বিপরীতপক্ষে তিব্বতী ও ভোট-চীনীয় ভাষায় রাজবংশী উপভাষার প্রভাব পড়েনি। যেমন রাজবংশী ভাষার লোকগীতিতে তিব্বতী ও চীনা ভাষার বিভিন্ন শব্দ কং, থাকোং, লং, কাটাঙ প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন—

'কোনবা আশায় থাকোং মোর পাণ-সোনারে
সোনা বাপো ভাইয়ের দ্যাশেরে।' (সংকঃ পৃঃ ২৯)

প্রাকৃতিক বাধার ফলে ভাষার সাযুজ্য থাকলেও দক্ষিণবঙ্গেও উত্তরবঙ্গের লোকগীতির প্রসার ঘটেনি। উভয় অংশের মধ্যে বিস্তীর্ণ গঙ্গা নদীই এই বাধার সৃষ্টি করেছে।

প্রকৃতি এবং তার পরিবেশ যেমন ভাওয়াইয়া গানের উপর প্রভাব ফেলেছে তেমনি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশও ভাওয়াইয়া গানকে প্রভাবান্বিত করেছে। সেই সময়ে যানবাহনের জন্য উঁচু নীচু মেঠো পথই ছিল একমাত্র ভরসা, এই অমসৃণ পথে গাড়ী চালনার সময় গাড়ীয়ালের শরীরে যে ঝাঁকুনি লাগে তারই প্রতিক্রিয়া ভওয়াইয়া গানেও দেখা যায়। গাড়ীয়ালের গানের কলি গাড়ীর শব্দের তালে তালে একটি শব্দে বা শব্দাংশে উচ্চমার্গে উঠে পরবর্তীক্ষণেই নীচু ঢালে গাড়ীর চলার কারণে স্বর নেমে আসে খাদে, ফলে তার গানেও ভাঙনের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। লোকজীবনের সামাজিক লোকাচার ও লোকধর্মকে অনুসরণ করেই সৃষ্টি হয় লোকসঙ্গীত। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতও সৃষ্টি হয়েছে—এতদঞ্চলের নানা লোকাচার ও ধর্ম-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। লোকজীবনের জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে, তিনের প্রকাশই দেখা যায় লোকসঙ্গীতে। রাজবংশী সমাজে কন্যা বিয়ে দিয়ে তার মা বাবা বরপক্ষের কাছ থেকে কন্যাপণ আদায় করেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবিবাহিতা কন্যা তার আত্মীয় পরিজনকে বিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে বেচে খাওয়ার কথা বলে। এমনি একটি গান,

'আই মোক্ ব্যাচেয়া খা হে খা
গাবুর হয়্যা মন বান্দিয়া না যায়রে রওয়া।' (সংকঃ পৃঃ ৬৮)

সামাজিক রীতিনীতি, সমাজ-সংস্কার ও লোকাচার থেকে ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি হলেও রাজনৈতিক অবস্থা প্রভাবান্বিত করেছে ভাওয়াইয়া গানকে। রাজনৈতিক যে সব অবস্থা রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিস্তরঙ্গ জীবনে তুলেছে উত্তুঙ্গ ঢেউ, সেই সব ঘটনায় সামিল হয়ে বা তার প্রতিবাদে জনকবির কণ্ঠেও উঠেছে বিক্ষোভের সুর, কখনও বা তা ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছে। জীবনমুখী ভাওয়াইয়া গান কেবল প্রেমের কোমল কলিই নয়, কেবল অধ্যাত্মবাদের অন্তর্মুখী আত্মনিবেদনই নয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে এইসব গানেও খুঁজে পাওয়া যায় জীবনধর্মী বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সুর, অন্যায়ের সোচ্চার প্রতিবাদ আর সর্বোপরি সার্বিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার ছবি। জনজাগরণের সন্ধিক্ষণে যে সঙ্গীত রচিত হয় সেগুলি প্রতিবাদী চেতনার সঙ্গীত, সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত সঙ্গীত। জনজাগ-

রণের অবস্থাকেই বলে 'জাগরণমূলক পরিবেশ'। "জনগণের সুপ্ত চেতনা বিকাশে জাগরণমূলক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। লোকসঙ্গীত গোষ্ঠীচেতনাকে সব চাইতে দ্রুত বিভাবিত করে থাকে। তাই জাগরণমূলক পরিবেশও লোকসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে।"[8] এই জাগরণমূলক পরিবেশের প্রভাবেই জীবনমুখী শিল্পী তাদের সঙ্গীতকাব্য সুষমায় ভরিয়ে তুলেছে নানা বিপর্যয়, ব্যথা-বেদনা, বঞ্চনা ও প্রতিবাদের ইতিহাস।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার চুর্নী নদীতে বন্যার ফলে নদী পার্শ্বস্থ ঘরবাড়ী ভেঙে যাওয়ায় সরকারী খয়রাতী সাহায্যের টাকা প্রকৃত প্রাপকদের কাছে না পেঁছে সেই টাকা আত্মসাৎ করে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যেরা। লোককবিদের কণ্ঠে এ ঘটনার সোচ্চার প্রতিবাদ প্রচারিত হয় সেই সময়—

'এই বছর ওগো চুন্নী নদীত উটিল বান
দে মোক্ দুঘঘটনা মানুষ গরু ভজিল কত লোকের পাণ' (সংকঃ পৃঃ৮৪)

মানুষের প্রতি মানুষেরই এই শোষণ এবং অত্যাচারের কাহিনী বারে বারে লোককবিদের সোচ্চার করে তুলেছে। ১৯৫১ সালের ২১শে এপ্রিল কোচবিহার জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের ভুখা-মিছিলের উপর পুলিশের নির্বিচার গুলি চালনায় শিশু বকুল আর বন্দনা সহ সাতজনের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ লোককবির কণ্ঠে গর্জে ওঠে 'খাদ্যের বদলে গুলি' লোকগাথা।

'সাতই শনিবারে—
৭ই শনিবারে দ্বিপ্রহরে ভুখা ভারতেরে
খাদ্যের বদলে গুলি দিল সাগরদিঘীর পাড়ে।' (সংকঃ পৃঃ ৮২)

এমনকি রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিও লোকসঙ্গীত বিমুখ নয়। জীবনের নানা টানা-পোড়েনে ব্যতিব্যস্ত হলেও সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলেনা কখনও, সেই কারণে প্রাক-স্বাধীনতাবর্ষে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়েও লোকগীতি সৃষ্টি হয় নির্বাচন নিয়ে,

'তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছে কত দ্যাশ দরদী ভোটাভুটির গন্ধ পাইয়া'। (সংকঃ পৃঃ ৮২)

মানুষের সৃষ্ট এই পরিবেশও প্রভাব ফেলে লোকসঙ্গীতে, প্রকৃতি সৃষ্ট পরিবেশ এবং প্রকৃতির প্রাণী-সম্পদ সব কিছুরই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে লোকসঙ্গীত পুষ্ট হয়, ভাওয়াইয়া গীতও তার ব্যতিক্রম নয়।

● অঞ্চলভেদে ভাওয়াইয়া গানের রূপভেদ :

ভাওয়াইয়া গান মূলতঃ কোচবিহার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গান হলেও কালপ্রবাহে এবং জনজীবনের চলার গতির সঙ্গে সঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে, সেইকারণে অঞ্চল-ভেদে এই গানের রূপগত পার্থক্য দেখা যায়। অবশ্য এই রূপভেদ ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যের কোন গুণগত পার্থক্য ঘটায়নি। পার্থক্য কেবল এর বিষয়-বৈচিত্র্যে। আঞ্চলিক অবস্থান অনুযায়ী তরাই অঞ্চলের মৈষালের গান, রংপুর ও দিনাজপুর (অধুনা বাংলাদেশ) জেলার গাড়ীয়ালের গান, আসামের গোয়াল পাড়িয়া গান, গৌরীপুরের মাহুতের গান আর যমুনার পশ্চিম পাড়ে নাইয়ার গান—নামে স্বতন্ত্র হলেও সুর কাঠামো সর্বত্রই এক।

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জনজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকসঙ্গীতের কাঠামো ও তার বিষয় বৈচিত্র্যের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে, একারণে অঞ্চলভেদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতেরও পরিবর্তন ঘটে। উত্তরাঞ্চলের তরাই বনাঞ্চলের সঙ্গে সমতলভূমির জীবনযাত্রার পার্থক্য আছে। তরাই অঞ্চলের ঘন অরণ্য আর বন্ধুর পথের কারণে যানবাহন চলাচলের স্বচ্ছন্দ গতি সেখানে ব্যাহত, নদীগুলিও পাহাড়ী বলে খরস্রোতা, ফলে এইসব অঞ্চলে যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচল বা নদী জলপথের প্রভাব খুব একটা পড়েনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। কিন্তু এই অঞ্চল তৃণময় বলে সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে বাথান-নির্ভর জীবিকা। তরাই অঞ্চলে তাই মৈষালের জীবনযাত্রাই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল তৃণাঞ্চল এইসব স্থানেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য বাথান। এই বাথানে থাকাকালীন মৈষালরা দোতরা বাজিয়ে বা আগুন জ্বালানোর দুখানা কাঠে তাল ঠুকে গাইত তাদের প্রাণের আকুতি ভরা প্রেম ও বিরহের গান। সেই কারণে এতদঞ্চলে মৈষাল বন্ধুর গানেরই আধিক্য।

অন্যদিকে বাংলাদেশের রংপুর দিনাজপুর এবং উত্তরবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রাকৃতিক অবস্থা প্লাবন সমতলভূমির চেয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বন্ধুর। নদনদীর সংখ্যাও কম ; আর যেগুলি আছে সেগুলিও সংকীর্ণ ও খরস্রোতা, ফলে দূরের বাণিজ্য বন্দরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগের মাধ্যম গরু বা মোষের গাড়ী। এই গাড়ীর গাড়োয়ান বা গাড়ীয়াল ভাইয়ের গানই এতদঞ্চলে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। আবার জলপাইগুড়ি ও মালদহ

জেলা এবং বাংলাদেশের রংপুর ও মৈমনসিংহ জেলার জনজীবনে নদীর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এতদঞ্চলে নৌকার মাঝিকে বলা হয় 'নাইয়া'। একস্থান থেকে অন্যত্র পারাপার এবং অন্য দেশে বাণিজ্যের জন্য জলপথই প্রধান ভরসা। সেই কারণে এতদঞ্চলের জনজীবনে নাইয়া ও বাণিজ্যের জন্য সাউদ বা সওদাগরের ভূমিকা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার ভাওয়াইয়া গানে তাই নাইয়া ও সাউদের কথাই অধিক।

ভাওয়াইয়া গানে আসামের গোয়ালপাড়া ও গৌরীপুরের জীবনযাত্রার প্রভাবও অনেক। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আসামের ঘন অরণ্যানী, এইসব গহীন অরণ্যে বন্য হাতীর প্রাচুর্য। এতদঞ্চলের জনজীবনে তাই হাতী ধরা ও তাকে পোষ মানানোর কাজই জীবিকা হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে। হাতী ধরা ও তাকে পোষ মানানোর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বলা হয় মাহুত। আসামের গোয়ালপাড়া, ও গৌরীপুর এবং কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বনাঞ্চলে প্রচলিত গানে তাই মাহুতের গান স্বাভাবিক রূপেই প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য মাহুতের গান ছাড়াও কৃষিজীবী, মৎসজীবী প্রভৃতি বৃত্তির কথাও প্রায়শই পাওয়া যায়, কারণ যারা মাহুতের বৃত্তি গ্রহণ করতো তারা অন্য সময়ে অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকে। মূলতঃ কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের লোকেরাই হাতী ধরার কাজে নিযুক্ত হত, ফলে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে আসামের গোয়ালপাড়া গানের মিশ্রণ ঘটেছে। পার্বত্য এলাকার গান বলে গোয়ালপাড়িয়া গানের ছন্দ কাটা কাটা বা cubic অন্যদিকে ভাওয়াইয়া গানের গতি circular বা ঢেউ খেলানো। গোয়ালপাড়ার গানে শ্রমের কণ্টকর অবস্থাই পরিস্ফুটিত হয়। ফলে গানের সুর একটু কাটা কাটা—অনেকটা হাঁফানোর মত Geometrical form-এ চলে, যেমন গোয়ালপাড়ার একটি অহমিয়া গানের চলন এই রকম—

'বাইগ বাগিচার চাকরি নেলাগে লাহরি
নেলাগে তল পরধন।
তয়ে ধানে দাবি ময়ে হাল বাম
সেই হব জীবনের ধন ॥'

—অর্থাৎ বাগিচার (চা বাগানের) চাকরীর প্রয়োজন নেই, তুমি ধান কাটবে আর আমি হাল চাষ করবো—এটাই হবে জীবনের সার্থক কাজ। এই গানে একটা হাঁফানোর Expression আছে এর সুরের কাঠামোও তাই Geometric form—যা কঠোর শ্রমের সঙ্গে যুক্ত।[১]

অঞ্চলভেদে ভাষার ব্যবহারেও গানের পার্থক্য দেখা যায়। কোচবিহার

অঞ্চলের ভাষায় তিব্বতী প্রভাব থাকায় চোং, লঙ ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়, যার প্রভাব লোকসঙ্গীতেও পড়ে। যেমন একটি গান—

'কত পাষাণ বাইন্দাচোং পতি মনেতে' (সংকঃ পৃঃ ২৮)

এই একই গান জলপাইগুড়ি অঞ্চলে কামরূপী ভাষার প্রভাবে খাইছুঁ, গেইছুঁ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে গীত হয়, যেমন,

'কত পাষাণ বেঁধেছুঁ বঁধু হে' (সংকঃ পৃঃ ২৯)

স্বভাবতই ভাষার শব্দ প্রয়োগের বিভিন্নতায় গানেরও রূপভেদ দেখা যায়। কেবল ভাষাগত পার্থক্যই নয়, আঞ্চলিক সামাজিক-লোকাচার অনুযায়ীও গানের রকমফের হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভাওয়াইয়া গানের 'বারমাস্যা' কোচবিহার জেলায় শুরু হয় ফাল্গুন মাস থেকে আর জলপাই-গুড়ি জেলায় এই গানের শুরু অগ্রহায়ণ মাস থেকে।

সামাজিক রীতি-নীতির পার্থক্যের ফলেও অঞ্চলভেদে ভাওয়াইয়ার রূপ-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। ভাওয়াইয়া মূলতঃ নারী জীবনের ব্যথা-বেদনা, মান অভিমানের গান হলেও তা পুরুষ কণ্ঠে গীত হয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হতে উৎসারিত বলে এতে নারীর বেদনা নারী কণ্ঠে গীত না হয়ে সাধারণতঃ পুরুষ কণ্ঠে গীত হয়, কিন্তু অঞ্চলভেদে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বজায় থাকলেও কোচবিহার ও রংপুরে মহারাজ নরনারায়ণের সময় থেকেই বৈষ্ণববাদের প্রভাবে এতদঞ্চলের গান নারী কণ্ঠেও শোনা যায়, অন্যদিকে জলপাইগুড়ি ও পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় বৈষ্ণববাদের প্রভাব জোরালো না হওয়ায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী নারী কণ্ঠে সঙ্গীত প্রচারের উপর বিধিনিষেধ যথারীতি বলবৎ ছিল।

সঙ্গীতকে যদিও ভাষা ও আঞ্চলিক গণ্ডীবদ্ধতায় আবদ্ধ করা যায় না তবু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গায়কীর প্রভাবমুক্তও সে হতে পারে না, ফলে অঞ্চলভেদে সঙ্গীতেরও রূপভেদ হয়। "একই গানে জেলাভেদে সুরেরও পার্থক্য ঘটেছে। কোচবিহার জেলার গায়কী ও জলপাইগুড়ি জেলার গায়কীতে অনেক পার্থক্য। শুধু তাই নয়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে একই গানের বিভিন্ন রূপ দেখে বিস্মিত হতে হয়।"[২]

চতুর্থ অধ্যায় : ভাওয়াইয়া গানের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য

১. ভাওয়াইয়া গানের গায়কী, ছন্দ ও বিভাগ বিন্যাস :

ভাওয়াইয়া গান মূলতঃ উত্তরবঙ্গের গান হলেও ভাষা এবং অবস্থান সাযুজ্যতার ফলে এই গান তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর মৈমনসিংহ জেলাতেও প্রসারিত হয়েছিল। এই গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘ টানা সুরের মধ্যেও ভাঙন। রাঢ় বা দক্ষিণবঙ্গের বাউলের গানও টানা সুরের কিন্তু বাউলের গানে টানা সুরে বৈরাগ্যের আভাস ফুটে ওঠে আর ভাওয়াইয়ার টানা সুরে ওঠে হৃদয় নিংড়ানো ব্যথা-বেদনা ও ভালবাসার সুর। বাংলাদেশের ভাটিয়ালী গানের সুরও টানা, কিন্তু ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালীতে পার্থক্য গায়কীতে, অর্থাৎ ভাওয়াইয়ার ভাঙনে।

ভাওয়াইয়া গানে শুদ্ধ, কোমল ও কড়ি—সব মিলিয়ে ৮টি স্বরের বেশি প্রচলন নেই। এই গানে কোমল 'রে', 'ধা', 'কড়ি মা' এবং 'শুদ্ধ নি' স্বরের ব্যবহার নেই। তারা সপ্তকের ব্যবহারও খুব কম। ভাওয়াইয়ার গায়কীর বিশেষত্ব তার ভাঙনে বা গলা-ভাঙায়—যা অন্য কোন সঙ্গীতে পাওয়া যায় না, তবে এই ভাঙন পূর্ব-নির্দিষ্ট নয়, এটা নির্ভর করে গায়কের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির উপর। ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তির উৎস বিশ্লেষণ করলেই এই ভাঙনের অনিশ্চয়তার দিকটি ধরা পড়ে। মৈষাল যখন তার মোষের পিঠে চড়ে দোতারা বাজিয়ে গান করে তখন মোষের উঁচু নীচু জমিতে চলার ফলে গায়কের গায়ে লাগে ঝাকুনি, তাতে তার গানের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়, ফলে সুরে ভাঙন দেখা দেয়। মোষ চলার পথের যেমন অনিশ্চয়তা তেমনি গানেরও ভাঙনের অনিশ্চয়তা, কোনটাই পূর্ব-নির্দিষ্ট নয়। একই অবস্থার সৃষ্টি হয় বন্ধুর পথে গাড়ীয়ালের গরু বা মোষের গাড়ী চালনার কালে বা খরস্রোতা নদীতে নৌকা চালনার কালেও।

ভাওয়াইয়া গানের একমাত্র অনুষঙ্গ যন্ত্র দোতারা বা দোত্‌রা। কাঠের তৈরী এই যন্ত্রটিতে যদিও চারটি তার (String) থাকে, কিন্তু বাজানোর সময় একসঙ্গে দুটি তারের বেশি ব্যবহৃত হয় না বলেই এর নাম দোতারা বা উত্তর-বঙ্গীয় ভাষায় দোত্‌রা। চারটি তারের মধ্যে মাঝখানের দুটি তারে সুর বাঁধা হয়। বাঁ দিক থেকে সবচেয়ে মোটা প্রথম তারটিকে বলা হয় 'ব্যোম' এটি বাঁধা হয় 'পঞ্চমে' বা শুদ্ধ 'পা' তে। দ্বিতীয় তারটিকে বলে 'জিন'—যা বাঁধা হয় 'মা' তে, বাঁদিক থেকে তৃতীয়টিকে বলে 'সুর'—যা গায়কের গলার 'স্কেল'-

এ বাঁধা হয় এবং চতুর্থটিকে বলে 'অগ্নি'। দোতারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় তারেই বাঁধা হয় গায়কের গানের সুর সঙ্গতি। যে Bridge এর উপর দিয়ে তারগুলি টানা হয় তাকে বলে 'ঘোড়া' এবং তার টেনে সুর বাঁধার অংশটিকে বলে 'কান'। মোষের শিং বা হাতীর দাঁতে তৈরী বাজানোর টুকরোকে বলে 'চুট্‌কি' বা 'নোগোর'। দোতারা বাজানোর সময় হাতের মধ্যমা আঙ্গুল কোথাও স্পর্শ করে না. কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে 'জিনের' উপর চাপ দিলে হয় 'কোমল নি' সুতরাং গানের পর্দা কেবল 'কোমল নি' পর্যন্তই যায়। বাংলা দেশের ভাটিয়ালী গানের সঙ্গেও দোতারা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের দোতারায় ব্যবহৃত হয় মুগা বা রেশমী সুতো, অন্যদিকে বাংলাদেশীদোতারায় ব্যবহৃত হয় ইস্পাতের তার।

ভাওয়াইয়া গানের গায়কীর একটি বৈশিষ্ট্য গানের কথার উপর ঝোঁক বা জোর দেওয়া। এর ফলেই গানে ভাঙনের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মূলত কারণ গায়কের অসমান চলার পথ, মোষ বা হাতীর পিঠেই হোক বা গরু বা মোষের গাড়ী চালনাতেই হোক। "দ্রুত ছন্দ রক্ষার জন্যে ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙে সুরে স্বরভঙ্গির মতো করে ছন্দে একটা 'হ' প্রয়োগ উত্তর ও পূর্ববঙ্গে সমান ভাবে প্রচলিত। এ সব স্থলে প্রাণ শব্দটা প্রাহান হয়ে যেতে পারে।"[১] শব্দের উপর এই ঝোঁক বা জোর দেওয়ার ফলে গানের উচ্চারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম—

ছোটো হো দা হা দা মো হোর বড়য় দা হা দা
ও তোহো র কা হা লে হে নাগাল পাহানু গে হে
মাঝো হ হাটোত্‌ তে। অর্থাৎ গানের প্রকৃত রূপ ঃ

ছোট দাদা মোর বড়য় দাদা
ও তোর নাগাল পানু গে
মাঝো হাটোততে।

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের আরও এক বৈশিষ্ট্য তার আঞ্চলিকতা। গানের গায়কীতে যেমন, তার শব্দ প্রয়োগেও সেইরূপ আঞ্চলিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন একটি গানের কলি—

'ওকি গাড়ীয়াল ভাই—
কতয় রবু মুঞি পন্থের দিকে চায়া রে।' (সংকঃ পৃঃ ৩৬)

এখানে শব্দ প্রয়োগে গুরু-চণ্ডালী দোষ ঘটলেও তাতে আঞ্চলিকতার গুণে ভাওয়াইয়া গানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'পন্থের দিকে চায়া' না বলে 'পথ পানে চাহি' বললে কাব্যিক গুণ বাড়লেও আঞ্চলিকতার অভাবে তা রসোত্তীর্ণ

হত না। 'চেয়ে' শব্দটি রাজবংশী ভাষায় 'চায়া' বলেই উচ্চারিত, ফলে এই শব্দ প্রয়োগই লোকসঙ্গীতের যথাযথ রূপ। "[লোকসঙ্গীতের] ভঙ্গি ও গায়কীর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে আঞ্চলিক উপভাষার Phonetics 'সুহাগ চান্দ বদনী ধনী নাচতো দেখি' গানটির উচ্চারণ পালটিয়ে পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে না বলে বিশুদ্ধ উচ্চারণে 'সুহাগ' কে সোহাগ' কিংবা চান্দ কে শুদ্ধ উচ্চারণে চাঁদ বলে গাইলে সেই আঞ্চলিকতার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ dialect বা উপভাষার উচ্চারণধ্বনি আঞ্চলিক ভঙ্গির একটা অবিচ্ছেদ্য উপকরণ।"[২]

ভাওয়াইয়া গানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য, এই গানের দ্বৈত সঙ্গীতও একক সঙ্গীতের ন্যায় পরিবেশন। দ্বৈত সঙ্গীতে সাধারণতঃ প্রশ্নোত্তরের পালা থাকে, তাতে একজন প্রশ্নের অংশ অন্যজন উত্তরাংশ গায়, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে প্রশ্নোত্তর থাকলেও তা একজনেই গায়। অবশ্য রাজবংশী সমাজ ব্যবস্থার ফলেই সঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। কারণ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে একত্রে গান করার অনুমোদন কখনই পাওয়া যায়নি, ফলে নারীর বিরহ বা পারস্পরিক প্রেম নিবেদনের গান সবই পুরুষ কণ্ঠে এবং একক কণ্ঠে গীত।

(ছন্দের বিচারে ভাওয়াইয়া গান মূলতঃ দাদরা, কাহারবা এবং তেওড়া এই তিনটি তালে নিবদ্ধ।) এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে গায়কীর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ দুলকি চালে বা ফোঁপানোর অভিব্যক্তি প্রকাশের গানে এই ছন্দগুলিই আসে। অবশ্য দাদরা তালের ছন্দ বিভাগের নিয়মানুযায়ী ৩+৩ মাত্রার পরিবর্তে এখানে ছন্দ বিভাগ হয় ২+৪ মাত্রায়। এই কারণে এই ছন্দের তালকে উত্তরবঙ্গে বলা হয় সোয়ারী চাল বা সওয়ারী চালের গান। কোথাও আবার এই ছন্দ বিভাগের গানকে মৈষালী ভাওয়াইয়াও বলা হয়।

"প্রধানতঃ মইষালদের গাওয়া বিশেষ ঢঙের ভাওয়াইয়া সুরকে সোয়ারী চাল বলা হয়। এই শ্রেণীর সুরের তাল ও লয় একটি বিশেষ ছন্দে বাঁধা থাকে। চলমান মহিষের পৃষ্ঠে দোতারা বাদনরত মইষালের দোতরা বাদনের দুলকী তাল ও গায়কীর ঢঙ এই সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য।"[৩] সোয়ারী চাল বা বিভাজিত দাদরা তালের গানের নমুনা এইরূপ ঃ

'আরে ও বাঙ্গোর ভইষের দাপাদার' (সঙ্কঃ পৃঃ ৭৫)

সা রা ‖ মা া | া া া া | া া | া া া া | া া | া া মা পা
আ রে ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে

গা া | গা া মা া | গা া | মা া গা রা | সা া | সা া সা া
বা ০ ঙ ০ গ র ভ ০ ই ০ ষে র দা ০ হা ০ পা ০

না া | া া পা া ॥
দা ০ ০ ০ হা র

দাদরা তালের আরও এক প্রকাশভঙ্গী এখানকার গানে পাওয়া যায়, যাকে বলে তারফেরতা বা ডবল দাদরা। মাত্রা বিভাগ দাদরা তালেরই মত ৩+৩, কিন্তু গানের দ্বিতীয় অন্তরা থেকেই এর মাত্রা দ্বিগুণ হয়। প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই তালের সৃষ্টি। সমান জমিতে গরু বা মোষের গাড়ী চলার ছন্দ ৩+৩ মাত্রায় শুরু হলেও উঁচু থেকে নীচুতে গাড়ী গড়িয়ে চলার ফলে তার লয় যেমন দ্রুততর হয় তেমনি এই গানের মাত্রাও দ্বিগুণ হয়। এই ধরনের একটি গানের কথা।

'যামো যামো যামো কইন্যাহে যামো আজি চলি
যাইবার সমে কও হে তুমি মনের কতা খুলি, কইন্যা হে।
ও মুই কান্দিনু—কাটিনু তুই বন্দুয়ার বাদে রে
ও মোক ছাড়িয়া না যান্ রে ॥' (সঙ্কঃ পৃঃ ২০)

দাদরা তালে নিবদ্ধ :

॥ সা া মা | মা া পা | পা ণা ধা | পণা ধা পা |
যাহা ০ মো যাহা ০ মো যা হা মো ক ইন্ না

মা া া | মা া পা | গা া মা | গা মা গরা |
হে ০ ০ ক ণ্ না যা ০ মো আ হা জি

সা া া | ণা া দা | দা পা া | া া া |
চ ০ ০ লি ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

না া ণা | ণা া ণা | সা া সা | গা া গা |
যাহা ০ বার স ০ মে কহ ০ ও তু ০ মি

মা া পধা | মা া মপা | গা মা গা | রমা গা রা |
ম ০ নের কহ্ ০ থা খু হু লি ক ইন্ না

সা া া | া া া ॥
হে ০ ০ ০ ০ ০

ডবল দাদরা তালে নিবদ্ধ :

া া া | সা রা া | গা া গা | া গা া | গা মা া | গমা গরা া |
০ ০ ০ ও মু ই কা ন্ দি ০ নু ০ কা টি ০ নু ০ ০

রা মা া | গা রা া | সা া া | সা সা া | সা রা া | রা া া |
তু ই ০ ব ণ্ ০ দ্ ০ ০ য়া র ০ বা ০ ০ দে ০ ০

গা া া | গপা মা া | গা মা গা | রা সা রা | রগা মগা া | রা সা া |
রে ০ ০ ও মোক ছা ০ ড়ি ০ য়া ০ না ০ ০ ষা ০ ন্

সা া া | া া া | া া া | া া া |
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কাহারবা তালে নিবন্ধ বেশ কিছু ভাওয়াইয়া গান পাওয়া যায়। কাহারবা তালের মাত্রা বিভাজন ৪+৪। এই ছন্দে নিবন্ধ একটি বহুল প্রচলিত গান, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে' (সঙ্কঃ পৃঃ ৫)

ভাওয়াইয়া গানে অন্য যে ছন্দের গান রয়েছে তাহল ৭ মাত্রার তেওড়া বা লোফা তালের গান। এই গানের মাত্রা বিভাজন ৩+২+২ এই ছন্দের একটি গান, 'কত পাষাণ বাইন্দাচোং পতি মনেতে।' (সঙ্কঃ পৃঃ ২৮)

গানের স্বরলিপি করলে তার রূপ দাঁড়ায় এই রকম—

সা রা ॥ রা মা া | া া | া া | া া া | া া | গা মা |
কত পা ষা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০ বা ইন্

গা সা া | রা মা | গা মা | রগা সা া | সা া | া া |
ধা চো ঙ প ০ তি হি ম নে ০ তে ০ ০ ০

া া া | া া | া া |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ছন্দ বা তাল অনুযায়ী যেমন ভাওয়াইয়া গানকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, তেমনি সুরের চলন বা গায়কী অনুযায়ীও ভাওয়াইয়াকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। "ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সুরের দিক দিয়ে তিন প্রকারের—১. ভাবমূলক—দীর্ঘস্বর সম্পন্ন উচ্চভাবমূলক সংগীত ২. চট্‌কা—লৌকিক স্তরে অবনমিত দ্রুততালের চটুল সংগীত এবং ৩. ক্ষিরল—দীর্ঘ ও চট্‌কা সুর সম্পন্ন ভাওয়াইয়া গানের মধ্যবর্তী সুরের সংগীত।"[৪]

কিন্তু এই ভাগকে সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী বিভাগ বলে মনে হয় না, কারণ সুরের বিচারে ও অভিব্যক্তির প্রকাশে ভাবমুখী ভাওয়াইয়ার স্বতন্ত্র কোন রূপ নেই। এই বিভাগকে নিছক বিষয়-ভিত্তিক ভাগ বলা যায়, কারণ ভাওয়াইয়ার সুরের কাঠামোই দীর্ঘস্বর সম্পন্ন এবং তাতে যেমন নারীর বেদনার্ত হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে, তেমনি আছে জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত মৈষাল, মাহুত বা গাড়ী-

য়ালের রঙীন মনের স্বপ্নের অভিব্যক্তি। আবার এই সুরেই উদাসী বাউদিয়া তার মনের মানুষ খুঁজে বেড়ায় বা গায় নশ্বর জগতের অসারত্বের গান। স্বভাবতই 'ভাবমূলক' ভাওয়াইয়া বললে কোন সুর বিভাজন বোঝায় না, গানের বিষয়-বৈচিত্র্যের কথাই বোঝায়। উপরন্তু ভাওয়াইয়াকে চট্‌কা সুরে ভাগ করলেও নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়, কারণ ভাওয়াইয়া সুরের আঙ্গিকে গঠিত হলেও চট্‌কা গানের গায়নরীতি ও অভিব্যক্তি ভাওয়াইয়া থেকে স্বতন্ত্র। 'ক্ষীরল' কোন সুর বিভাজন নয় এটি একটি ছন্দের নাম, বিশেষতঃ যাঁরা দোতারা বাজান তাঁদের কাছে 'ক্ষীরোল ডাং' বলতে ছন্দের এক বিশেষ ঢঙকে বোঝায়, সেই কারণে সুরের বিভাগ বিন্যাসে 'ক্ষীরোল সুর' না বলে একে ক্ষীরোল অঙ্গের ভাওয়াইয়া বলাই যুক্তি সঙ্গত। অন্য এক অভিমত অনুযায়ী "আঞ্চলিক নামকরণ অনুসারে ভাওয়াইয়া গানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. চিতান ভাওয়াইয়া—এই গান বিচ্ছেদ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ার গান। সাধারণতঃ এই গান আস্থায়ীতে উচ্চগ্রাম হতে আরম্ভ ও ক্রমেই নিম্নগ্রামে নামে।

২. ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া—এই শ্রেণীর গানে দোতরা বাজাবার একটি বিশেষ ধরন আছে, এই ধরনকে ক্ষীরোল ডাং (stroke) বলে। বিরহের প্রতীক এই গান সাধারণতঃ কিছুটা নিম্নগ্রামে আরম্ভ হয়ে পরে উচ্চগ্রামে যায়।

৩. দরিয়া ও দীঘলনাসা ভাওয়াইয়া—উভয় গান দীর্ঘ প্রসারিত দম সাপেক্ষ সুর—যেন স্রোতের টানে বিলিয়ে দেবার সুর।

৪. গড়ান ভাওয়াইয়া—বিরহ বেদনা-কাতর নারী যেন ধূলায় গড়াগড়ি যাওয়ার অবস্থা।

৫. মইষালী ভাওয়াইয়া—এই-গান অন্যান্য ভাওয়াইয়া গানের মত কিন্তু চাল ভিন্ন ধরণের। এই গান গাইবার সময় মনে হয় যেন গায়ক কোন কিছুর সোয়ার (সওয়ার) হয়ে চলছে এবং চলার ছন্দ গানের ছন্দে প্রকাশ পায়। এই চালকে সোয়ারী চাল বা মইষালী চাল বলে।"[৫]

উল্লিখিত বিভাগগুলিও সর্বত্র সুর অনুযায়ী করা হয়নি কারণ এই বিভাগের মধ্যে সুরগত পার্থক্যের চেয়ে বিষয়গত পার্থক্যই প্রকট হয়েছে। সুরানুযায়ী বিভাগের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিভাগকে একত্রিতকরাই যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লিখিত বিভাগে সুরের পার্থক্য নেই, যেমন চিতান, দরিয়া, দীঘলনাসা এবং গড়ান ভাওয়াইয়ার গায়কীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য নেই। এইসব ধরণের গানের সুর বিচ্ছেদ বেদনা ও না পাওয়ার আর্তিতে বেদনার্ত। এইসব গানই

অস্থায়ীতে উচ্চগ্রামে আরম্ভ হয়ে ক্রমেই নিম্নগ্রামে নেমে আসে, অনেকটা কান্না-শেষের মত। মূলতঃ ব্যথাহত হৃদয়ের কান্নার রূপই বিধৃত এইসব গানে। সেই কারণে একই ধরণের গানকে—যেগুলির মধ্যে ভাবগত, বিষয়গত ও সুরগত কোন পার্থক্য নেই, সেগুলির স্বতন্ত্র নামকরণেরও যুক্তি নেই। গান শুনে বা গান গাওয়ার সময় গায়ক বা গায়িকা আবেগে শুয়ে পড়বে বা মাটিতে গড়াগড়ি দেবে—এই ভাব অনুযায়ী সঙ্গীতের বিভাজনে চিতান বা গড়ান নামকরণের যুক্তি নেই। গানে গায়ক / গায়িকার অভিব্যক্তি অনুযায়ী সুরের বিভাজনও যথাযথ নয়। কারণ যে গানে এক গায়ক বেদনায় আপ্লুত হয়ে ওঠে অন্য গায়কের কাছে সেই গানে কোন ভাবান্তর নাও ঘটতে পারে। স্বভাবতই গান গাওয়ার সময় গায়কের বাহ্যিক অভিব্যক্তি অনুযায়ী কোন বিভাগ শাস্ত্রানুযায়ী হতে পারে না।

সুরানুযায়ী ভাওয়াইয়ার বিভাগ বিন্যাসে আর একটি অভিমত, ভাওয়াইয়াকে মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করাই শ্রেয়। দরিয়া, ক্ষীরোল ও চলন্তি বা উজানী। দরিয়া সুরে ফুটে ওঠে বিরহের বা হতাশার মর্মভেদী হাহাকার, গানের সুরে প্রবাহিত হয় বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত আনন্দ বা প্রেমের গান ক্ষীরোল ডাং এর আঙ্গিকে প্রকাশিত—যার চলনে রয়েছে একটু দোলানি। আর চলন্তি বা উজানী হল এমন সুরের গান যা সবসময় নির্দিষ্ট সুর কাঠামোতে বাঁধা থাকেনা। চলতে চলতে পথে যেমন দৃশ্যান্তর হয়, তেমনি সুরেরও হয় পরিবর্তন। যে গান দরিয়া সুরে শুরু হয়েছে, অবস্থার পরিবর্তনে সেই গানের বাকী অংশ ক্ষীরোল ডাং-এ বা দুলকী চালে গাওয়া হতে পারে।[৬] জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এই ধরণের গানকে বলে 'পাথারিয়া গান'। "পাথারিয়া গানের সুর বিলম্বিত লয়ের, ইহার মধ্যে আকাশ ও মাঠের বৃহৎ বিস্তৃতি যেন গায়িকার অজ্ঞাতে কেমন করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। টানিয়া টানিয়া পাথারিয়া গান গাওয়া হয় বলিয়া কোনো কোনো অঞ্চলে এই সুরকে 'ঢুলানি' বলা হয়।"[৭]

সুর-কাঠামোর বিচারে ভাওয়াইয়া গানের শ্রেণীবিন্যাসে বিভিন্ন অভিমত নিষিক্ত-সিদ্ধান্ত এই যে ভাওয়াইয়াকে মূলতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যদিও এই বিভাজনেও বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কারণ কোন এক বিশেষ গান গায়ক বা গায়িকা কিভাবে পরিবেশন করবেন তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট গায়ক বা গায়িকার উপর। সেক্ষেত্রে গায়নভঙ্গি অনুযায়ী এই গান কখনও দরিয়া আবার কখনও ক্ষীরোল ভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবুও সুর-কাঠামোর সাধারণ চলন অনুযায়ী মূলতঃ তিনটি

ভাগই আপাতগ্রাহ্য। যেমন, দরিয়া (এই বিভাগের নামকরণ, চিতান, গড়ান, দীঘলনাসা যে কোনটি দেওয়া যেতে পারে)—দীর্ঘ টানা সুরের সব গানই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ভাগ—ক্ষীরোল। অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ের গান এবং অভিব্যক্তিতে আনন্দের গান, প্রেমের গান ইত্যাদির সমন্বয় ঘটবে। এই বিভাগে মৈষালী, সোয়ারী চাল এবং গাড়ীয়াল বন্ধুর গান একত্রিত করা যায়। আর সবশেষে মিশ্র ছন্দের গান অর্থাৎ চলন্তি, উজানী এবং পাথারিয়া গান।

সুরের বিভাগ অনুযায়ী দরিয়া অঙ্গের গানগুলিতে দীর্ঘ টানা সুর ও বিলম্বিত লয়ের প্রাধান্য। এই ধরণের ভাওয়াইয়ার বিশেষত্ব হল গানের আগের কথার সুরের রেশ ধরে পরের কথার সুরে উত্তরণ। একই সুর অবলম্বন করে পরবর্তী কথায় যাওয়ার সময় থাকে সুরের দোলানী, গানে মীড়ের অংশ এখানে স্পষ্ট। দরিয়ায় মূলতঃ বিচ্ছেদের মর্মস্পর্শী কান্না, না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস আর বেদনার আর্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠে বলে এই অঙ্গের গান অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। গায়কের হৃদয় উজাড় করা হাহাকার ধ্বনিই দরিয়া শ্রেণীর গানের অন্তর্নিহিত রূপ। ভাব-মাধুর্য আর সুরের মাদকতায় এই গানগুলি করুণতম সুরের আঙ্গিকে নিবন্ধ।

ক্ষীরোল অঙ্গের গানসমূহ অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ের বা দুলকি চালের। প্রাণের আবেগ উচ্ছ্বাসে বিধৃত প্রেমের গানেরই প্রাধান্য এই বিভাগে। দোতারার যে চটকদারি ছন্দ অর্থাৎ 'ক্ষীরোল ডাং-এর সঙ্গে যে সুরের ধ্বনিগত ও ছান্দিক মিল পাওয়া যায়, সেই গানগুলিই ক্ষীরোল অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

সুরের মূল চলনভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবল প্রকাশ কাঠামোর রূপান্তরে গড়ে ওঠে চলন্তি অঙ্গের গান। বিভিন্ন ছন্দ ও সুর কাঠামোর অপরূপ মিশ্রণে একই গান বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয় চলন্তিতে। গীদালেরা যখন দলবেঁধে একস্থান থেকে অন্যত্র যায় তখন তাদের চলার পথে সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশ আর বিষয়ান্তরের প্রভাবে গানের সুরে পরিবর্তন ঘটে, ফলে দরিয়া ও ক্ষীরোল উভয় আঙ্গিকের গানই এই শ্রেণীভুক্ত হয়।

সুরগত বিভাজন ছাড়াও ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে ভাবগত, বিষয়ানুযায়ীও ভাগ করা যায়। "এই গানগুলির ভাবপ্রকাশের রীতিতে সাধারণতঃ দেখা যায় সেগুলি তিনটি রূপে বিভক্ত। প্রথম রূপটির ভাবের প্রকাশ সরল ও সহজ কথায়, সেগুলি বোঝার জন্যে কেবলমাত্র ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট। অধিকাংশ গান এই পর্যায়েই পড়ে। দ্বিতীয় ধরনটি দ্ব্যর্থবোধক। অন্তর্নিহিত অর্থই

তার যথার্থ ভাবমূর্তির প্রকাশ। আর তৃতীয় ধরনটিকে বুঝতে হলে ঐ অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির এবং তার ভাবধারা প্রকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন, তা না হলে অনেকক্ষেত্রে তার অর্থ উদ্ধার করা কেবল দুরূহই নয়, অসাধ্যই বলা চলে।"[৮]

ভাবমুখী এই সঙ্গীতের প্রথম পর্যায় নিয়ে বোধগম্যতার অভাব ঘটেনা, তবে রাজবংশী উপভাষার সঙ্গে সম্যক পরিচয় প্রয়োজন, যদিও অর্থগত দিক দিয়ে এই সব সঙ্গীতের ভাব সহজ ও সরল, যেমন—

'দিনের শোবা সুরয রে আইতের শোবা চান
হালুয়ার শোবা হাল কাযি্য, জমিনের শোবা ধান।"

(সংকঃ পৃঃ ১)

এখানে বাউদিয়া প্রকৃতির শোভা বর্ণনার সঙ্গে সামাজিক জীবনযাত্রার শোভা সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। অন্যদিকে দ্ব্যর্থ-বোধক গানের মধ্যে—'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে'(সংকঃ পৃঃ ৫) অন্যতম। এইগানে আপাতদৃষ্টিতে শিকারীর জালে একটি বকের বন্দী হওয়ার কথা বলা হলেও অন্যঅর্থে সাময়িক সুখের লোভে মানুষের সংসার-জালে আবদ্ধ হওয়ার গভীর দার্শনিক তত্ত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আর সব শেষ ধরনের গানের মর্মকথা অনুধাবন করতে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এই ধরনের একটি গান, 'আই মোক্ ব্যাচেয়া খা হে খা' (সংকঃ পৃঃ ৬৮)। 'ব্যাচেয়া খাওয়া' শব্দটি বিশেষ অর্থবহ। রাজবংশী সমাজে কন্যার বিয়ে দিয়ে তার পিতা মাতা বরপক্ষের কাছ থেকে টাকা নেন, এই সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে 'ব্যাচেয়া খাওয়া' অর্থে বিয়ে দেওয়া—এই তাৎপর্য অনুধাবন করা অসুবিধাজনক।

অবশ্য ছন্দ, গায়কী, বিষয়-বিন্যাস ও ভাবপ্রকাশ অনুযায়ী ভাওয়াইয়া গানকে যতরকমে বিভাজনই করা হোক না কেন, তা সবই তাত্ত্বিক বিভাজন, কারণ জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির প্রকাশ মাধ্যম ভাওয়াইয়া গানকে কোন নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে (water-tight compartment) গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। সঙ্গীত বিভাজনের সর্বশেষ মাপকাঠি নির্ধারিত হয় গায়কের মানসিক অবস্থা ও তার প্রকাশভঙ্গীর উপর। একই গান কেউবা কাহারবা তালে, কেউবা দাদরা তালে গাইতে পারেন আবার গানের প্রকাশভঙ্গীতে যে গান একজনের গলায় দরিয়া অঙ্গের গান অন্যজনের কাছে তা ক্ষীরোল অঙ্গের গান হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ন্যায় লোকসঙ্গীতকে সঙ্গীতশাস্ত্রের চুলচেরা কাঠামোতে বিচার করা যায় না।[৯] "লোকসঙ্গীতের 'রূস' বস্তুটি খুব

তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, অখণ্ড নহে। উহার তাল ও লয়ের মধ্যেও মার্জিত গানের মতো হিসাব করা মিল দেখা যাইবে না। কিন্তু সবটা মিলাইয়া উহার মধ্যে একপ্রকার স্পষ্ট-অস্পষ্ট, ঢিলে-ঢালা রস, সুর তাল আছে যাহা বিশিষ্ট লোক-সমাজেরই সমষ্টিগত জীবনের অঙ্গীভূত। কাজেই লোকসঙ্গীতের রসের অতো সূক্ষ্ম বিচার করিয়া 'তুলা ধুনি আঁসুরে আঁসু' না করিলেও চলিবে।"[৯]

২. ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালী ও বাউলগানের তুলনামূলক আলোচনা :

অখণ্ড বঙ্গদেশের লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে দীর্ঘটানের সুর বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী ও বাউল গান প্রাধান্য লাভ করেছে। সুরের প্রাথমিক কাঠামো অনুযায়ী এই তিনটি সঙ্গীতধারা দীর্ঘটানের হলেও তার গায়কীর বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। অবশ্য বাউল সুরের গান বলায় সঙ্গীত-বেত্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কারণ বাউলদের কোন আঞ্চলিকতা নেই, নেই কোন ঘরাণাও। যে অঞ্চলে বাউল আস্তানা গাড়ে, সেই অঞ্চলের প্রচলিত সুরকে আত্মস্থ করে বাউল গায়ক তার জীবনদর্শনের গান শোনায়। তাই বাউলদের গানে যেমন ভাটিয়ালীর প্রভাব দেখা যায়, তেমনি আবার সেই গানে কীর্তন আর রাগ-রাগিণীর প্রভাবও দেখা যায়। স্বভাবতই ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া গানের যে স্বকীয়তা রয়েছে সেই স্বকীয়তা সব সময় বাউল গানে পাওয়া যায় না। লালনশাহী বাউল গানে যেমন ভাটিয়ালীর প্রভাব, তেমনি রাঢ়-বাংলার বাউল গানে রয়েছে কীর্তনের প্রভাব। স্বভাবতই আঞ্চলিক সুরের প্রাধান্যই বাউল গানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সুরের কাঠামোতে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন রূপ দেখা গেছে। আবার ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী গানও পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত নয়, যেমন রংপুর ও মৈমনসিংহ অঞ্চলের ভাটিয়ালী গান ভাওয়াইয়ার প্রভাবে প্রভাবিত, তেমনি পশ্চিমদিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার ভাওয়াইয়া গানেও ভাটিয়ালী সুরের আভাস মেলে। অবশ্য অন্য সুরের প্রভাব থাকলেও ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালীকে সহজেই পৃথক করে চেনা যায়। অন্যদিকে ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে বাউলদের যাতায়াত, তাই পূর্ববঙ্গের বাউল গান হয়েছে বাউলা এবং তা ভাটিয়ালীর প্রভাব-পুষ্ট, আবার রাঢ়-বাংলার ঝুমুর ও কীর্তনের প্রভাবে এতদঞ্চলের বাউল গান ছন্দ-প্রধান। সামগ্রিকভাবে বাউল গানের স্বতন্ত্র কোন সুরের বিভাজন সম্ভব না হলেও তার গায়কী অনুযায়ী বাউল গান বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন লালনশাহী, ফিকির চাঁদি, বৈষ্ণব বাউল ইত্যাদি। "বাউল গানে ফিকিরচাঁদি সুর বলতে বোঝায় শ্যামাসঙ্গীতে রামপ্রসাদী যেমন বিশেষ এক ধরণের সুর, বাউলের বেলায় ফিকিরচাঁদও সেই রকম এক বিশিষ্ট সুর।"[১]

বাউল সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাধন-ভজন প্রণালী আছে, সেই সাধন সংক্রান্ত গূঢ় তত্ত্বকথা বা আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা সঞ্জাত বাণীই বাউলের গানে প্রকাশ পায়। অবশ্য এইসব গান প্রায়ই হেঁয়ালীতে পূর্ণ থাকে, এর আক্ষরিক অর্থ আর অন্তর্নিহিত ভাবধারার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। যেমন বীরভূম অঞ্চলের একটি বাউল গান—

'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না
জলে নাববো জল ছড়াবো জলতো ছোঁব না।' (সংকঃ পৃঃ ৩)

এই ধরণের বাউল গানকে 'উল্টা বাউল'ও বলেন কেউ কেউ। আবার জীবনের অনিত্যতার কথাও ফুটে ওঠে বাউলের আখেরী চেতন গানে।

'লোকে বলে বলেরে ঘরবাড়ি ভালা নায় আমার
কি ঘর বান্ধিমু আমি শূন্যেরই মাঝার।' (সংকঃ পৃঃ ৫)

অধিকাংশ বাউল গানই তাই দ্ব্যর্থবোধক, বা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। অবশ্য বাউল গান তাদের সাধনার রূপ অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। "সাধারণতঃ প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ—এই তিনটি অবস্থা অনুসরণ করিয়া ইহারা গান রচনা করিয়াছে। প্রবর্ত অবস্থায় ভগবানের নিকট দৈন্য ও গুরুর করুণা প্রার্থনা, সাধক অবস্থায় দেহতত্ত্ব, মনের মানুষ, সাধনার স্বরূপ বর্ণনা, সিদ্ধ অবস্থায় সাধনার পরিপূর্ণতার স্বরূপ প্রভৃতি তাহাদের গানে ব্যক্ত হইয়াছে।"[২]

সঙ্গীতের আঞ্চলিকানা (Localisation) অনুযায়ী দীর্ঘ টানা সুরের লোকসঙ্গীতকে তিনটি অঞ্চলের বলে নির্দিষ্ট করা যায়। "বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের মূল মেলোডি হলো ভাটিয়ালী, উত্তরবঙ্গের তেমনি ভাওয়াইয়া, মধ্যবঙ্গের মূল গীত-রীতি হলো বাউল। এখানে আমি বাউল দর্শনের কথা বলছি না, তার সুর রীতির কথা বলছি। পূর্ববঙ্গেও বাউল আছে তবু ভাটিয়ালীর প্রভাবে তার নিজস্ব গীতরীতি হারিয়ে ফেলেছে। আর পশ্চিম প্রত্যন্ত রাঢ়বাংলার গীতরীতি—একে আমরা ঝুমুর-রীতি বলতে পারি (যদিও তা বিচার সাপেক্ষ)।"[৩]

ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী ও বাউল—এই তিন ধরণের সুর প্রবাহের কাঠামো বিশ্লেষণ করলেই পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যতার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভাওয়াইয়া—'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে'

গা । মা । | পা না ন্‌ধা প্‌মা | মা । মা । | । । । পা
ফা ০ হা ন্‌ দে ০ প হ ড়ি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

গা । । । | মা । পা মপসা | গা । । মা | গমা গ্‌রা মা ।
০ ০ ০ ০ ব ০ গ আ কা ০ ০ ন্‌ দে ০ ০ ০

সা । । । | । । । ।॥
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ভাটিয়ালী—'(আরে) মোন মাজি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

সা। রা ॥ ধা পা সা মা | সা া সা রা | গা া পা া | র্ধা া র্সা া
আ রে মো ০ ন্ মা জি ০ তো র বৈ ০ ঠা ০ নে ০ রে ০

া া া া | া া সানি ধাপা | পা নি ধা পা | মা গা রা সা
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি আ র বা ই তে ০

পা া মা গা | রসা া া া | া া া া | া া া া ॥
পা র লা ম না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বাউল ঃ কানাই খেউড় খেলাও কেনে
রঙ্গের রঙ্গিলা কানাই খেইড় খেলাও কেনে

সা সা া।
কা না ই

॥ সা সা া | রা গা রা | রা রা া | া া া |
খে ই ড় খে লা ও কে নে ০ ০ ০ ০

রা া পা | া পা া | ধা পা া | মা গা া
র ঙ গে র র ঙ গি লা ০ কা না ই

রা গা া | রা সা া | সা সা া | সা সা া ॥
খে ই ড় খে লা ও কে নে ০ কা না ই

ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী ও বাউল গানের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের বিচারে দেখা যায়, "ভাটিয়ালী চড়ার 'সা- থেকে কোমল নিখাদ স্পর্শ করে নেমে আসে, কিন্তু ভাওয়াইয়া আরোহণে চড়ার 'সা' তে আর যেতে চায় না— কোমল নিখাদে দীর্ঘ বিরাম নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ভাটিয়ালীর মতো উদারার ধৈবতে নেমে আসে না, মুদারার ষড়জে এসেই বিরাম নেয়। * * * মধ্যবঙ্গের বাউলে ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়ার মতো বিলম্বিত বিস্তার নেই, তা ছন্দ প্রধান। ভাবমুখী গায়কীও সহজ। ভাওয়াইয়া বা ভটিয়ালীর মতো উত্তরাঙ্গে high pitch-এর প্রকার তাতে নেই।"[৪]

এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভাটিতে নৌকা ভাসিয়ে ভাটিয়ালী গানের মাঝি তার সুর যতদূর সম্ভব উচ্চগ্রামে পেঁছাতে পারে কিন্তু ভাওয়াইয়ার মাহুত বা মৈষাল কিংবা গাড়ীয়ালের চলার পথ উঁচু নীচু থাকার ফলে এবং বাহকের অসমান চলার গতিতে গায়ক তার সুর উচ্চগ্রামে ধরে রাখতে পারে না, তাই সুর ভঙ্গ হয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসে। বাউলের গানও

উচ্চগ্রামে বেশিক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব নয়,কারণ গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের আবেগ আসায় এবং পায়ে চলা পথ উঁচু নীচু থাকায় বাউল তার সুর ছন্দের তালে মিলিয়ে দেয়। ভাটিয়ালী গানের সুরের গতি ব্যাহত না হওয়ায় এই গানে মীড়ের কাজ স্বচ্ছন্দে খেলে যায়, অন্যদিকে গায় ঝাঁকুনি লাগায় ভাওয়াইয়া গায়কের গলায় আসে ভাঙন। আবার গান শুরুর একটু পরেই বাউলের প্রাণ নেচে ওঠে নৃত্যের আবেগে তাই তার গানও হয় ছন্দ প্রধান। "বাউলের প্রধান লক্ষ্য কথার ছন্দোবন্ধ সহজ গতি। তাই অন্যান্য লোকসঙ্গীতের তুলনায় বাউল গান ছন্দোবহুল। তার একমাত্র কারণ বোধহয় বাউলদের নৃতের আবেগ।"[৫]

ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে ভাটিয়ালী ও বাউল গানের মৌলিক পার্থক্য তার বিষয় বস্তুতে। ভাওয়াইয়ায় নারী হৃদয়ের কথার প্রকাশ পুরুষ কণ্ঠে, অন্য দিকে ভাটিয়ালী ও বাউল তার নিজের কথাই বলে। বাউলের গান সাধারণতঃ অধ্যাত্মচিন্তা সম্পর্কিত কিন্তু ভাওয়াইয়ার 'মনের মানুষ' রক্তমাংসে গড়া এ জগতের মানুষ—প্রেমিক মানুষ। যে আর্তিতে বাউল গায়, 'আমি কোথায় পাবো তারে। আমার মনের মানুষ যেরে' সেখানে ভাওয়াইয়ার গায়কের গলায় শোনা যায় নারীর অন্তরের কথা—

'এমন মোন্ মোর করে বিদি এমন মোন্ মোর করে
মোনের মতো চ্যাংড়া দেখি ধরিয়া পালাওঁ দূরে।' (সংকঃ পৃঃ ৪১)

এখানে মনের মানুষ বলতে দেহ-সর্বস্ব মানুষের কথাই বলা হয়েছে। মূলত বাউলের গানের ধারাই সঞ্জীবিত হয় আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা। (এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,"বাউল গানের উৎপত্তির মূলে ছিল তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট। সামন্ত সমাজের জীবন-দৃষ্টে যাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, সামাজিক নির্মমতা যাঁদেরচিত্তকে ব্যথিত করেছে, যাঁরা সমাজ ও জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত তাঁদেরই কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত হলো বাউল গান।"[৬] যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বাউল গানের সৃষ্টি, সেই অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি ভাওয়াইয়া গানকে। ভাওয়াইয়া মূলতঃ জীবনবোধের গান, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও সর্বোপরি মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ পেয়েছে ভাওয়াইয়ায়। অন্যদিকে ভাটিয়ালীতে রূপ পেয়েছে একাকীত্বের অবসর যাপনের মুহূর্তগুলি। দিনান্তের কর্মক্লান্ত দেহের বিশ্রামের-ক্ষণে ভাটিতে নৌকা ছেড়ে গাওয়া মাঝির আত্ম-নিবেদনের গান বা ফেলে আসা প্রিয়ার কথাই ভেসে ওঠে ভাটিয়ালীতে। প্রবহমান উদার নদীবক্ষে নিঃসঙ্গ মাঝি মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশের নৈসর্গিক পরিবেশে ভাব বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার মনের রুদ্ধদ্বার আগলমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় গানের সুরে। ভাটিয়ালী যদিও নদীবক্ষের গান,

তবু গ্রামীণ জীবনে এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে এই সুরের রেশ ভেসে ওঠে উম্মুক্ত প্রান্তরের কৃষক এবং রাখালের কণ্ঠেও।

গানের বিষয়বস্তুতেও ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া ও বাউলগানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভাটিয়ালী গানে যেখানে সার্বিক সুখ দুঃখের প্রকাশ, বাউল গানে আধ্যাত্মিক চেতনা লাভের প্রয়াস, ভাওয়াইয়া সেখানে ব্যক্তিমানসের চিন্তাতেই আচ্ছন্ন। সার্বজনীন আবেদন থাকায় ভাটিয়ালীর ব্যাপ্তি, বাউল গান অধ্যাত্ম-সাধনার গণ্ডীবদ্ধতায় আবদ্ধ আর ভাওয়াইয়াও ব্যক্তি মানসের চিন্তাধারায় আবদ্ধ, ফলে পারস্পরিক পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ভাওয়াইয়ার গণ্ডীও সঙ্কুচিত, আজও তাই ভাওয়াইয়া গান রয়ে গেছে গৃহকোণের অবলা নারীর ক্রন্দনের রূপেই।

ভাওয়াইয়া গানে এই হতাশা আর ক্রন্দনই মূল সুর। সামাজিক নিয়মের নিগড়ে বাঁধা নারীর জীবনের সাধ কখনই পূরণ হয়না, তার কান্নার সুর গুমরে গুমরে ওঠে দূর বনান্তের মৈষাল বা মাহুতের কণ্ঠে। বাউল বা ভাটিয়ালী গানে যেখানে থাকে পাওয়ার আনন্দ, মিলনের আভাস—ভাওয়াইয়া গানে সেখানে কেবলই বিচ্ছেদ ও বেদনার দীর্ঘশ্বাস। তাই ভাওয়াইয়া গানের সুর এত করুণ, হৃদয়-মথিত কান্নার আবেগে ভরপুর। তাই যেন এ গান এত মর্মস্পর্শী ও মধুর, এ যেন কবির কথাকেই মনে করায়,

> "Our Sweetest songs are those
> That tell of saddest thought"—PB Shelley.

"প্রেম-সঙ্গীতের কেবলমাত্র বিরহ বা বিচ্ছেদের অংশ লইয়াই ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়। এমনকি মিলনের মধ্যেও ইহাতে বিচ্ছেদের আশঙ্কা প্রকাশ পায়। * * * বৈষ্ণব কবিতায় সম্ভোগের পর বিরহ, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে সম্ভোগ ব্যতীতই বিরহ, সেইজন্য ইহার বেদনার অনুভূতি প্রথম হইতেই পার্থিব কলুষতা মুক্ত হইতে পারিয়াছে।"[৭]

পঞ্চম অধ্যায় : উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও ভাওয়াইয়া গান

১. রাজন্যবর্গের সাহিত্য :

সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত সাহিত্য না হলেও মৌখিক সাহিত্য রচনায় রাজবংশী সমাজ যথেষ্ট উন্নত ছিল ; যদিও তাদেরই রচনায় পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছিল আদি বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা। কিন্তু চর্চার অভাবে ও উপযুক্ত বিশ্লেষণ না থাকায় কামতাপুরী বা রাজবংশী সাহিত্য সার্বিক সাহিত্য-মণ্ডলে কোন বড় আসন দখল করতে পারেনি। এই সাহিত্যের স্বীকৃতিলাভের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘকাল—অন্ততঃ চারশ বছর, কারণ দ্বাদশ শতকে 'গোপীচন্দ্রের গান' সংগ্রহের পরই রাজবংশী উপভাষার সাহিত্যে স্ফুরণ দেখা যায়। আর ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ বিশ্বসিংহের দ্বারা কোচ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতাই রাজবংশী উপভাষায় রচিত সাহিত্য সাহিত্যের দরবারে স্বীকৃতি পায়। এই সময় থেকেই রাজন্যবর্গের বদান্যতায় কোচ বা রাজবংশী সাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কামতা রাজদরবার সাহিত্য সাধনার এক গৌরবময় পীঠভূমিতে পরিণত হয় এবং রাজবংশী সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটে। মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে যে সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়েছিল, তা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। যদিও তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান আধার ছিল সংস্কৃত ভাষা, সেই কারণে কোচবিহার সাম্রাজ্যের তৃতীয় মহারাজা নরনারায়ণ কাশীতে গিয়েছিলেন সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে। তাহলেও 'বিনা স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা ?' এই তাগিদে জনগণের ভাষাকে সাহিত্যের রাজদরবারে স্থাপন করার মানসে কোচবিহারের রাজন্যবর্গ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

সাহিত্য বিকাশের উষালগ্নের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রচলিত কথ্যভাষা বা অসংস্কৃত ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদা দিতে যখন অনেকেই ছিলেন কুণ্ঠিত, সেই সময়ে কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কোচ রাজন্যবর্গ। "সাহিত্য সাধনায় কামতারাজ্যের অধিপতিদের মূল লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য আছে সেই ঐশ্বর্য্যকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়

কবি পীতাম্বরের কাব্য উক্তির মধ্য দিয়ে। তিনি তার মার্কণ্ডেয় পুরাণের মুখ ভাষণে বলেছেন—

'পুরাণাদি শাস্ত্রে জেহি রহস্য আছয়। পণ্ডিতে বুজয় মাত্র অন্যে না বুজয় ॥
একারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুজিবার। নিজ দেশ ভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার ॥"

সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত সাহিত্যের রস জনগণের মধ্যে বোধগম্য করে তুলতে 'নিজ দেশ ভাষা বন্দে' কাব্য রচনার যে উৎসাহ কোচবিহারের রাজন্যবর্গ দিয়েছেন, তৎকালীন সময়ের বিচারে এই চিন্তাধারাকে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক আখ্যায় ভূষিত করা যায়। রাজসভার বনেদীয়ানার গণ্ডীর মধ্যে সাহিত্যচর্চাকে আটকে না রেখে কোচবিহারের রাজন্যবর্গ সর্বসাধারণকে সাহিত্যের রসোপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছিলেন বলেই রাজবংশী উপভাষার সাহিত্য প্রসারলাভ করেছে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে মহারাজা নরনারায়ণ এবং হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রাজদরবারে প্রভূত কবি ও সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। রাজবংশী উপভাষার প্রসারে কামতাবিহারী রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এত বেশি ছিল যা তৎকালীন সময়ের বাংলা এবং কামরূপী ভাষার উন্নতিতে সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ করেন নি। অবশ্য এই সময় যে ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা কামরূপী ভাষারই সমগোত্র আর এই কামরূপী ভাষার সঙ্গে অহমিয়া ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষারই সাদৃশ্য বেশি। এই কামরূপী ভাষাকে এককথায় যুগ সন্ধিক্ষণের বাংলা ভাষা বলা যেতে পারে।[২]

কামতাবিহারী সাহিত্য সাধনায় রাজদরবার বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৫৫-১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) সময় থেকেই। "তাঁহার আদেশে তাঁহার সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ 'প্রয়োগরত্নমালা' রচনা করেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত অনিরুদ্ধ পণ্ডিত এবং রাম সরস্বতী রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের পদ্য অনুবাদ করেন। মহারাজা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব 'সীতা স্বয়ম্বর' নাটক, 'কৃষ্ণগুণমালা' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বহুপদ পদ্যানুবাদ করেন।"[৩] মহারাজ নরনারায়ণের বিদ্যোৎসাহীতার জন্য তাঁকে 'কামরূপের বিক্রমাদিত্য' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনিই প্রথম পররাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে রাজবংশী উপভাষায় পত্র প্রেরণ করে এক বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণের অহোমরাজ স্বর্গ নারায়ণকে লিখিত পত্র রাজবংশী সাহিত্য তথা প্রাচীন গদ্যরীতির এক অনন্য উদাহরণ ও প্রথম প্রামান্য নিদর্শন।

"লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অংকুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অদিক কি লেখিম।"[৪]

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৮৭-১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর পৃষ্ঠ পোষকতায় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক মাধবদেব 'ভক্তি রত্নাবলী' 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য' এবং 'আদিকাণ্ড' গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও এই সময়ে সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস সামান্যই ছিল তবু অনুবাদ সাহিত্যের প্রসার ঘটেছিল যথেষ্টই আর এই অনুবাদ রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থেই সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত কোন সামাজিক সাহিত্যের তখনও প্রচলন হয়নি।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই ক্রমে ক্রমে অনুবাদের পরিবর্তে স্বয়ং সম্পূর্ণ সাহিত্য রচনা শুরু হয়। মহারাজ বীর নারায়ণের রাজত্বকালে (১৬২১-১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ) কোচবিহারের কবির লেখা 'কিরাতপর্ব' স্বাধীন সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন। এই সময়ে কবি শ্রীনাথ রাজবংশী উপভাষায় 'মহাভারত' অনুবাদ করেন।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭১৪-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্য গ্রন্থ কবি নারায়ণ বিরচিত 'নারদীয় পুরাণ।' এই কাব্যের ভূমিকা শুরু এই ভাবে।

'জয় নিত্যানন্দ নিরাকার নারায়ণ। নিরুপাধি নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন॥
পরম অপরানন্দ পরম পুরুষ। পদ্মপানি পঙ্কজলোচন নিষ্কলুষ॥"[৫]

কামতাবিহারী রাজ্যের মহারাজদের মধ্যে সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর রাজত্বকাল (১৭৮৩-১৮৩৯) কামতা-বিহারী দরবার সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। "অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর সাহিত্য প্রীতির জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি নিজে ছিলেন সুকবি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহার রাজদরবার কবি সাহিত্যিকদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল। হরেন্দ্রনারায়ণ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, উপকথা, স্কন্দ পুরাণ, রাজ-পুত্র উপাখ্যান, ক্রিয়া যোগসার ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ও শাক্তসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন।"[৬] মহারাজ

হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত শাক্তসঙ্গীতগুলি অতীব ভাবসমৃদ্ধ ও কবিত্বপূর্ণ। তিনি কবি রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরই ভাবানুষঙ্গে হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত শ্যামা সঙ্গীতগুলি ভক্তিরসে আপ্লুত ছিল। তাঁর রচিত একটি শ্যামা সঙ্গীত।

"তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয় তার কি আছে ভয়
অন্তে যাব তার কাছে বাজাইয়া দামামা।"[৭]

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজ্যের নানা সমস্যার মধ্যেও মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ যেভাবে সাহিত্যচর্চা করেছেন ও সাহিত্যের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তাঁর সময়েই ইংরেজ শাসকগণ কোচবিহার সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে মিত্রতা চুক্তির অজুহাতে হস্তক্ষেপ করে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যও জনগণের ভাষায় সাহিত্যকর্মের উৎসাহ দিয়েছেন মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর নিজের অনুদিত মহাভারতের ঐশিক পর্বের একস্থানে লিখেছেন।

'শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ প্রবন্ধ কৈল রচন
দেবভাষা মানষী ভাষায়।'[৮]

এই মানুষী ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করে দেশের জনগণকে ধর্মাভিমুখী করাও অনুবাদ সাহিত্যের প্রসারের অন্যতম দিক। কেবল রাজন্যবর্গই নন, রাজবংশী উপভাষা এবং প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে কোচবিহারের রাজমহিষীদেরও অবদান কম নয়। অনেক রাজমহিষীই ছিলেন বিদুষী এবং সাহিত্যানুরাগী। এঁদের মধ্যে মহারানী বৃন্দেশ্বরী 'বেহারোদন্ত' শীর্ষক কোচবিহারের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কেশব সেনের বিদুষী কন্যা মহারানী সুনীতি দেবী রচনা করেছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থ, তার মধ্যে—'The autobiography of an Indian Princes', The Rajput Princess, The beautiful Mughal princes, Nine Ideal women, অমৃত বিন্দু, কথকতার গান, শিশু কেশব, ঝড়ের দোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কুমার ভিক্টর জিতেন্দ্রনারায়ণের প্রেরণায় তাঁর স্ত্রী নিরুপমা দেবী 'পরের ছেলে', 'আমার ডায়েরী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'পরিচারিকা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৭৭ সালে কুমার রঙ্গিল নারায়ণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কোচবিহার মাসিক পত্রিকা।'

স্বভাবতই দেখা যায় রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই উত্তরবঙ্গীয়

ভাষা তথা রাজবংশী উপভাষা তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে দীর্ঘদিন। লোক-সাহিত্য এবং রাজ সাহিত্যের ভেদাভেদ হ্রাস পাওয়ায় লোকসাহিত্যের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। অহমিয়া, ভোট-চীনীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষার প্রভাব পড়লেও রাজবংশী উপভাষা তার স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছে আজও। অবশ্য উত্তরবঙ্গের পরিশীলিত সাহিত্য দেবভাষাকে 'মানুষী ভাষায়' রূপান্তরিত করলেও সাধারণ মানুষের সাহিত্যকর্মের দ্যোতক লোকসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেনি কোনভাবেই। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে সঙ্গীত রচনা করেছেন কিন্তু সে সবই শ্যামাসঙ্গীত বা ভক্তিগীতি। উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রাণের সঙ্গীত ভাওয়াইয়ার বিকাশ তাতে হয়নি বা কোন সাহিত্যেও লোক-সঙ্গীত স্থান পায়নি। স্বভাবতই রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত এইসব লোকসঙ্গীত প্রার্থিত প্রচারের অভাবে সীমাবদ্ধতার গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল দীর্ঘকাল। সাহিত্যের দরবারে স্থান না পাওয়ায় তার কোন লিখিতরূপও গড়ে ওঠেনি। বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত গানই সাম্প্রতিককালের একমাত্র দলিল। পরিশীলিত সাহিত্যের অঙ্গীভূত না হওয়ায় ভাওয়াইয়া গান তার আসল রূপটি আজও বজায় রাখতে পেরেছে, অন্যথায় মার্জিত কথামালা আর সুসংস্কৃত সঙ্গীতের সুরে ভাওয়াইয়া হয়তো তার নিজস্বতাই হারিয়ে ফেলতো।

অবশ্য বর্তমান মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে ভাওয়াইয়া গানেও আসছে পরিবর্তন, এর ফলে প্রায়ই দেখা যায় কথা ও সুরের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এক অচেনা সুরের সৃষ্টি হচ্ছে যার সঙ্গে মাটির মানুষের কোন যোগাযোগ নেই। অবশ্য আর্থ-সামাজিক অবস্থাও এর জন্য দায়ী। উত্তরবঙ্গের জনজীবনে এখন মৈষাল, মাহুত, গাড়ীয়াল, নাইয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সেই জীবনযাত্রা থেকেই সকলে সরে এসেছে। তাই এইসব বৃত্তিতে-নিযুক্ত থাকাকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে যে সুর কাঠামো তৈরী হত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সেই অবস্থারই ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। ফলে ভাওয়াইয়ার স্বতঃস্ফূর্ত গলা ভাঙার পরিবর্তে কৃত্রিম গলা কাঁপুনিতে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে তাতে ভাওয়াইয়া গানের মূল সুরটাই যায় হারিয়ে. এখনই একে ধরে রাখতে না পারলে ভাওয়াইয়া গানও ইতিহাস হয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১. কৃষ্ণেন্দু দে—কামতা রাজদরবারের সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্য (বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ৩৮তম অধিবেশনের স্মারক গ্রন্থ ১৩৮১, পৃঃ ৪১)

২. রাজবংশী সাহিত্য :

জনগণের সাহিত্যই লোকসাহিত্য। এই জনগণের মধ্যে পণ্ডিতব্যক্তি যেমন আছেন তেমনি রয়েছেন নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গও। বহু নিরক্ষর ব্যক্তিরই অন্তরে সুগভীর জ্ঞানের উপলব্ধি রয়েছে, সেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান মৌখিক প্রকাশের মাধ্যমে লোকসাহিত্যেরও বিকাশ ঘটায়। এই সাহিত্য মৌখিক সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখেই প্রচারিত হতে থাকে এবং তা জনজীবনের ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। লোকজীবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই লোকসাহিত্যের মূল উপজীব্য, পরিশীলিত সমাজব্যবস্থার মেকি জীবনের ছবিতে লোকসাহিত্যের প্রসার ঘটেনা।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী কোচ বা কিরাত এবং রাজবংশী জাতির প্রাথমিক অবস্থায় কোন লিখিত ভাষা ছিলনা। বিভিন্ন উপজাতির ভাষা এবং আর্য ও অনার্য জাতির ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক মিশ্র ভাষা। পরবর্তী-কালে জাতিগত প্রাধান্যের ফলে এই মিশ্রভাষাই কামতাবিহারী বা রাজবংশী উপভাষা হিসাবে পরিচিত হয়েছে। এই ভাষার উপর উত্তরবঙ্গের নানা আদিবাসীর ভাষা ছাড়াও ভৌগোলিক সাযুজ্যের ফলে প্রভাব পড়েছে তিব্বতী, অহমিয়া, ভোট-চীনীয়, নেপালী ও লেপচা ভাষার। রাজবংশী উপভাষার একটি কাঠামোগত রূপ থাকলেও তখনও তার লিখিত সাহিত্যের বিকাশ ছিলনা। তখন জনজীবনের সামাজিক চিন্তাধারার প্রকাশ হত নানা ছড়া, গীত, গীতিকা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা ও লোককাহিনীতে। ছড়া, ধাঁধাঁ রূপকথা ও প্রবাদ-প্রবচনে যেমন ছন্দের প্রাধান্য তেমনি গীত, গীতিকা, লোককাহিনীতে ছিল সুরের প্রাধান্য। অবশ্য ছড়া, প্রবন্ধ-প্রবচনেও সুর আছে তবে সেগুলি সঙ্গীতে উত্তীর্ণ হয়না। লোকসাহিত্যের বীজ লুক্কায়িত গীত, গীতিকা, লোককাহিনী ও নানা ছড়া, প্রবাদ ও প্রবচনে।

লোকসাহিত্যের সমস্ত উপকরণই জনসমাজের স্মৃতি নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, তাই কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের স্মৃতি বিভ্রমের ফলে লোকসাহিত্যের আদি রূপের পরিচয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব, বর্তমানে যা পাওয়া যায় তাকেই অবলম্বন করে লোকসাহিত্যের বিচার করতে হবে। লিখিত না থাকার ফলে লোকসাহিত্য অন্য সাহিত্য এবং ভাষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং অন্যজাতির আচার, সংস্কার ও ধর্মাচারণ লোকসাহিত্যে প্রবেশ করে। যদিও লোকসাহিত্যের মূল কাঠামো লোক সংস্কৃতির উপরই নির্ভরশীল, এবং লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ ধর্মবিশ্বাস। জনজীবনের বিভিন্ন চিন্তাধারা বা লোকসংস্কৃতির নির্বিকার ইতিহাসই একমাত্র

লোকসাহিত্য নয়, লোকজীবনের নানা সংস্কারও লোকসাহিত্যের অঙ্গ।

লোকসাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় লোকসঙ্গীত। কিন্তু এই লোকসঙ্গীত সম্পর্কেও বলা হয় যে 'কানু ছাড়া গীত নেই', অর্থাৎ লোকসঙ্গীত ধর্মীয় প্রভাব এড়াতে পারেনি। মধ্যযুগে ধর্মকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল, বাঙলায় এই সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য, বা বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীই তৎকালীন লোকসাহিত্যের উন্মেষ ঘটিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে লোকসঙ্গীতের ঝুমুর, ঢপকীর্তন ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে কৃষ্ণলীলা, গোপীনী খেলা, ধামাইল নৃত্য ও গান। অন্যদিকে শাক্ত পদাবলীর প্রভাবে চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগর, লাউসেনের লোককাহিনী জন্ম নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যও এই দুই পদাবলীর প্রভাবমুক্ত ছিলনা। যদিও রাজতন্ত্রের শাসনাধীনে তৎকালীন উত্তরবঙ্গের জনজীবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হত, তাহলেও সার্বিক সংস্কৃতিতে ও লোকসাহিত্যের প্রসারে প্রাচীন দুই পদাবলীর প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়নি।

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের বিকাশ হয় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত 'ধামাইল' গানের মধ্যে। ধামাইলের মধ্যে কৃষ্ণধামালীরই প্রাধান্য। এই কৃষ্ণধামালীর নানা গানের অনুকরণে রাজবংশী লোকসাহিত্য তথা লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া রচিত। "এক শ্রেণীর গান আমরা রঙ্গপুর, কুচবিহার দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি, তাহার নাম কৃষ্ণধামালী। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আসল ও অপরশ্রেণীর নাম শুকুল (শুক্ল)। এই কৃষ্ণধামালী যে বঙ্গদেশের জনসাধারণের রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শুনিবার তৃষ্ণা একসময় মিটাইয়া দিত তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামীন রাজবংশী জাতি ও যোগীরা বাঙলাদেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকাগুলি এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।"[১] কৃষ্ণধামালীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গের অবতারণা থাকলেও ভাওয়াইয়া গানে মানবিক প্রেমের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। ভাওয়াইয়া গানে তাই 'কালা', 'কানাই' বা 'শ্যামে'র উল্লেখ থাকলেও এই সম্বোধন প্রেমিকার পরিচিত কোন যুবককেই উদ্দেশ্য করে গাওয়া। যেমন একটি ভাওয়াইয়া গান—

'কালা আর না বাজান বাঁশরী
সাদের ঘরে কালা অইতে না পারি।' (সংকঃ পৃঃ ৮৮)

এখানে 'কালা'কে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হলেও সামাজিক প্রেমের কথাই ব্যক্ত হয়েছে, 'কালা'কে দেবতার পর্যায়ে তোলা হয়নি। বৈষ্ণব পদাবলীর

বেশ কয়েকটি পদের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে,

'সই কতনা সহিব ইহা,
আমার বধুঁয়া আনবাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া'[২]

অনুরূপ পদ ভাওয়াইয়া গানেও পাওয়া যায়—

'কিসের মোর আন্দোন কিসের মোর বাড়ন, কিসের মোর হলুদী বাটা
মোর পাণোনাত্ অইন্যের বাড়ী যায় মোর আঙ্গিনায় দিয়া ঘাটা।'

(সঙ্কঃ পৃঃ ৪৮)

বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাসকৃত পদাবলীর একটি অংশের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের অপরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

'বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু, গাঁথিনু ফুলের মালা
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু মন্দির হইল আলা।'[৩]

এই ভঙ্গিমায় প্রকাশিত ভাওয়াইয়া গানের অংশ—

'বিচনা ঝাড়িয়া বিচনা পাড়িয়া মসুরী ট্যাঙ্গানুরে
ও মোর কালিয়া শোয়াইয়া নাই মোর ঘরে।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৩৮)

এইসব গানই পরবর্তী সময়ের রচনা। লিখিত আকারে রাজবংশী উপভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ নাথ যোগী সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ 'গোপীচন্দ্রের গান' বা 'ময়নামতীর গান' বা এক কথায় 'নাথ গীতিকা।' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন সর্বপ্রথম ময়নামতীর গান সংগ্রহ করে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন। প্রাচীনত্বের বিচারে 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে'র পরই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'গোপীচন্দ্রের গান'। 'চর্য্যাচর্য বিনিশ্চয়' বা চর্যাপদ গ্রন্থ নেপাল থেকে সংগৃহীত এবং তার ভাষাও নেপালী ভাষার অনুরূপ। স্বভাবতই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাংলা ভাষা তথা রাজবংশী উপভাষার প্রথম গ্রন্থ 'গোপীচন্দ্রের গান'। এই অংশটি অবশ্য নাথগীতিকারই একদিক। নাথ গীতিকার দুটি ভাগ, একটি গোরক্ষনাথ—মীননাথের কাহিনী অন্যটি গোপীচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী। গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী 'গোরক্ষবিজয়', 'গোর্খবিজয় ও মীনচেতন' নামেও প্রকাশিত, আর গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী—'গোপীচন্দ্রের গান' 'ময়নামতীর গান', 'মানিকরাজার গান' 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ইত্যাদি নামে প্রচলিত। "'গোপীচন্দ্রের গান' প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বে রচিত এবং ইহাতে ৮০০/৯০০ শত বৎসর প্রাচীন সামাজিক রীতি, ধর্মীয় নীতি এবং আর্থিক অবস্থা সুন্দর রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে।'[৪]

গোপীচন্দ্রের গানের ভাষা রাজবংশী, এবং এর সুরও ভাওয়াইয়া সুরের অনুরূপ। এক্ষেত্রে বলা যায় যে রাজবংশী উপভাষা বাংলাভাষাম আদিরূপ॥ এই ভাষার নমুনা এইরূপ ঃ

'দক্ষিণ হইতে আইল বাঙাল নম্বা নম্বা দাড়ি
সেই বাঙাল আসিয়া মুলুকত্ কৈল্ল বাড়ি।'[৫]

লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে সঙ্গীতই ছিল ভাষা প্রকাশের ধারক ও বাহক। সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রাণ। রাজবংশী সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্বেই রচিত হয়েছে লোকসঙ্গীত, আর এই লোকসঙ্গীতের অন্যতম সঙ্গীত ভাওয়াইয়া। প্রথম অবস্থায় অবশ্য ভাওয়াইয়া বা চট্কা গানের কোন লিখিত রূপ ছিলনা, লোকসঙ্গীতের ধর্ম অনুসারে প্রথমদিকে সমস্ত সঙ্গীতই ছিল মুখে মুখে প্রচলিত। বর্তমানে লিখিত রূপে রাজবংশী উপভাষা এবং তার লোকসঙ্গীতকে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এই উপভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এতই অল্প যে সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করার সময় আসেনি আজও। অবশ্য লোকসঙ্গীত কোন নিষেধ মানেনা, তাই তার ব্যাপ্তি হয়েছে সুদূর-প্রসারী। গদ্য বা কাব্য সাহিত্যের বিকাশ না হলেও বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী যদি সাহিত্যের মর্যাদা পায় তাহলে কেবল ভাওয়াইয়া সঙ্গীতাবলীরও সাহিত্য মর্যাদা প্রাপ্য। (বৈষ্ণব পদাবলী সীমাবদ্ধ তিনটি বিষয়ের মধ্যে, কৃষ্ণলীলা, প্রার্থনা ও চৈতন্যলীলা, সেই তুলনায় ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের বিষয় অনন্ত। ধর্মাচারণ, সমাজ-জীবন, রাজনৈতিক অবস্থা—জনজীবনের সামগ্রিক ছবিই ভাওয়াইয়ায় পরিস্ফুট। বৈষ্ণব পদাবলী যেমন এক বিশেষ ধারায় প্রবাহিত—সাধকের দিক থেকে উপাস্যের দিকে যাওয়ার যে উজান স্রোত সেই একমুখীনতার তুলনায় ভাওয়াইয়া গানের বিস্তৃতি বিশাল, বহুমুখী ও গভীরতায় অতলস্পর্শী। এই গানে মানুষের সামাজিক জীবনবোধের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি রয়েছে তার আধ্যাত্মিক চেতনালাভের প্রয়াস। সেই-দিক থেকে বিচার করলে রাজবংশী সমাজের সঙ্গীত ভাওয়াইয়ার সাহিত্যমূল্য অপরিসীম। "আমাদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন তত্ত্বকথা বলে ততটা নয় যতটা সাধারণ সাহিত্যরসবাহী গীতিকবিতা বলে। লোকে যদি কীর্তন গানকে শুধু তত্ত্বকথার মধুর বাচন বলেই নিয়ে আসত তাহলে কি তা এতগুলি শতাব্দী পেরিয়ে অক্ষুন্ন সাহিত্য সৌরভ নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত।"[৬] সাহিত্য রসবাহী গীতিকবিতা বলে যেমন বৈষ্ণব পদাবলী আজও অমর সাহিত্য হয়ে রয়েছে সেই একই গুণের অধিকারী হওয়ায় ভাওয়াইয়া গানও অদ্যাবধি স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।)

অন্যান্য সাহিত্যের মতই রাজবংশী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে রাজবংশী ভাষা সৃষ্টির পর, আর এটাই স্বাভাবিক। ভাষা হল সাহিত্যের প্রাণ আর সাহিত্য ভাষার পরিবেশন। ভাষার আগেই জন্মায় সুর, সুরের প্রবাহে ভাষা অবগাহন করেই জন্ম দেয় গানের। তাই গান সৃষ্টির উপরই নির্ভর করে সাহিত্যের উৎকর্ষ। সাহিত্যের প্রাণ-ভোমরা সংশ্লিষ্ট সমাজের গান—সেই বিচারে ভাওয়াইয়া গানও উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

---

৩. ভাওয়াইয়া গানের সাহিত্য ও শিল্পমূল্য :

ভাওয়াইয়া গানের সাহিত্য ও শিল্পমূল্য বিচারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ'। এই প্রথমিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল পদ্যে বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। পয়ারের ন্যায় এর পদের অন্ত অনুপ্রাস বা মিলের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগ পর্যন্ত রচিত সমস্ত সাহিত্যই, তা ভাবাবেগের সাহিত্যই হোক বা জ্ঞানের সাহিত্যই হোক, সমস্তই ছন্দে রচিত।

কিন্তু সাহিত্য রচনার এই ধারা অক্ষুন্ন থাকেনি। তুর্কী বিজয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয় শূন্যতার ইতিহাস। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত কোনও সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তী সময়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়—সবগুলিই মূলতঃ গীতিকাব্য। বাংলার প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদের পর কালানুক্রমিক গ্রন্থ—'নাথ-গীতিকা', 'মৈমনসিং গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। সমগ্র সাহিত্যই তখন ছিল গীত-ধর্মী-সাহিত্য। "সম্ভবত গীতিকবিতাই বাঙালী প্রতিভার নিজস্ব প্রকাশ পথ। 'চর্যাপদ' থেকে আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রোত্তরকাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের প্রধান পরিচয় বাঙালীর গীতিকবিতা। বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারাও সেই জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুজদের কাল পর্যন্ত অবিচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত।"[১]

উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-প্রসারের ক্ষেত্রে 'নাথ গীতিকা'র অবদান অসামান্য। যদিও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে ও তার সঙ্গীতসমূহে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছিল। ঊনবিংশ শতকেই কেবল উত্তরবঙ্গে সাহিত্যের নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছে, বিশেষতঃ যখন কামতাবিহারের রাজন্যবর্গ সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটাতে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যকেও উত্তরবঙ্গে আমদানী করেছিলেন, তখন থেকেই। তার পূর্ব পর্যন্ত লোকসঙ্গীতই ছিল লোকায়ত সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের বিচারে তাই ভাওয়াইয়া কাব্যগীতিই উত্তরবঙ্গের অন্যতম সাহিত্য সম্ভার। পল্লীবালার হৃদয়-নিংড়ানো ব্যথার কাজলে লেখা এইসব সঙ্গীত মনকে করে উদাস, চঞ্চল ও উন্মন। দুর্গম গিরি-অরণ্যানী শোভিত, খর-স্রোতা পাহাড়ী নদী বিধোত, উত্তরবঙ্গের গভীর অরণ্যে কাষ্ঠ আহরণকারিণী বা একান্তই গৃহকোণে বন্দী যৌবনচ্ছ্বসা নারীর প্রেম নিবেদন আর পতিহীনা 'চিটুল বিধুয়ার' অনাস্বাদিত যৌবনের নিদারুণ জ্বালার প্রকাশ-পায় আয়ত-বক্ষ পেশীবহুল মৈষাল বা মাহুত কিংবা নির্জ্জন পথে চলা গাড়ীয়াল বা

খরস্রোতা নদীতে নৌকা সামলাতে ব্যস্ত নাইয়ার প্রতি। জীবনের এই সব গানই সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রেমের গানে কোন কল্পনার নায়ক-নায়িকা স্থান পায়নি, ঘরের পাশের চ্যাংড়া বা অল্প-বয়সী যুবক বা মাহুত মৈষাল, গাড়ীয়ালই ভাওয়াইয়া গানের নায়ক। সামাজিক চিত্র-কাহিনীর পালাতেও খেলে হঠাৎ আলোর দ্যুতি, অনবদ্য হয়ে ওঠে সেইসব সঙ্গীত সাহিত্য-মূল্য বিচারে। (জয়দেব বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মত পদকর্তাদের রচনাশৈলীর সঙ্গেও ভাওয়াইয়ার অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায় তাই ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য।)

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি পদে পরকীয়া প্রেমে আসক্ত কালার উদ্দেশে রাধিকা বলছেন,

'যেদিন দেখিব আপন নয়ানে, কহে কার সনে কথা।
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব, ভাঙ্গিবো আপন মাথা।"[২]

অনুরূপ পদের ব্যবহার ভাওয়াইয়া গানেও পাওয়া যায়।

'আর যদি দ্যাকোং আর যদি শোনোং অইজোনের সঙ্গে কতা।
এ হেনা যৈবন সাগরে ভাসামো পাষাণে ভাঙ্গিমো মাতা" (সংকঃ পৃঃ ৪৮)

(অবশ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ছাপ থাকলেও ভাওয়াইয়া গানে বৈষ্ণবতার দর্শন ফুটে ওঠেনি। বৈষ্ণব পদাবলীতে যে 'নিষ্কাম প্রেমের' অভিব্যক্তির প্রকাশ ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে তা নিছকই নারী পুরুষের দেহজ প্রেমের বাণী। যদিও ভাওয়াইয়া গানে রাধাকল্প নায়িকার ব্যাকুল আবেগের প্রকাশ রয়েছে, তাহলেও, "বৈষ্ণব প্রভাব আদৌ নাই। তাহাতে চূড়ান্ত কথা আছে কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই, দুশ্চর তপস্যা আছে কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই। এক কথায় সেখানে পার্থিব প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই।"[৩])

(আধুনিকতার বিচারেও ভাওয়াইয়া কাব্যগীতি নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী। "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান সুর মানুষের কথা। সাধারণ ম্লান, বিবর্ণ বাস্তব জীবন, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং বস্তু চেতনার অন্তরালবর্তী মানসলোকে অবাধ বিচরণ—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমস্ত কিছুর মূলে মানুষের ইহজীবনের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে।"[৪], ভাওয়াইয়া কাব্য গীতিতে এই আধুনিকতা প্রতিটি কলিতে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলেছে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত, তার কাব্য সুষমায় প্রস্ফুটিত হয়েছে জন-জীবনের কথা। প্রেম সঙ্গীত ছাড়াও ভাওয়াইয়া গানে আছে সামাজিক ও

অর্থনৈতিক অবস্থার ছবি এবং লোক সাংবাদিকতার আড়ালে রাজনৈতিক অবস্থার চরিত্র-চিত্রণ। জীবনের সকলক্ষেত্রই স্থান পেয়েছে ভাওয়াইয়া গানে, ধর্ম সংস্কার ও লোকাচারও বাদ পড়েনি এতে। অর্থনৈতিক অবস্থার এক অনবদ্য চিত্র ফুটে ওঠে ভাওয়াইয়া গানে।

'ওকি বাইদন—
কি দেইখ্যা বা দিলারে বিয়া মোর
আমার শ্বশুর বাড়ীত চালে নাইরে ছোন।' (সংকঃ পৃঃ ৬৯)

জনজীবনের বিভিন্ন দিক ছাড়াও ভাওয়াইয়া গানে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি। অপ্রাণীবাচক শব্দগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় নদী শব্দের ব্যবহার। উত্তরবঙ্গে জলসেচ ও পানীয় হিসাবে নদীই একমাত্র অবলম্বন। পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী খরস্রোতা বলে নাব্য নয়, কিন্তু সাদু বা সওদাগরের কথা এসেছে বার বার। এর কারণ হিসাবে মনে হয় মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই ভাওয়াইয়া গানে সাদু বা সওদাগরের আবির্ভাব। ঐশ্বর্যের প্রতীক সওদাগর তাই রাজবংশী প্রেমিকার প্রেমাস্পদের রূপে এসেছে ভাওয়াইয়া গানে। ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে নদী পূজা থাকলেও নদী রাজবংশী সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সঙ্গীতেও তারই প্রতিফলন স্পষ্ট। এখানে নদীকে স্বতন্ত্র কোন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। অন্যান্য সাহিত্যে নদীই যেখানে মুখ্য রাজবংশী লোকসাহিত্যে নদী সেখানে জীবনের অঙ্গীভুত হওয়ায় মানুষই মুখ্য হয়েছে। রুশ সাহিত্যিক মিখাইল শলোকভের And Slow flows the river Don' বা রাহুল সংকৃত্যায়নের 'ভোল্গা থেকে গঙ্গা' গ্রন্থতে নদীর সঙ্গে সভ্যতার গতিপথ চিহ্নিত করণের ছবি আঁকা হয়েছে, এখানে নদী তার স্বাতন্ত্র্য নিয়েই বিরাজিত অনুরূপ ভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও পাড়ি' প্রভৃতি গল্পে নদীর স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে নদীর প্রাধান্য থাকলেও সেখানে নদীর স্বাতন্ত্র্য নেই। অপ্রাণী বাচক শব্দগুলির মধ্যে গাছের কথাও প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাচারে বৃক্ষপূজা ছাড়াও জীবনের নানা দুঃখের কাহিনী গাছের কাছেই ব্যক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন গানে। অর্থাৎ সার্বিক চেতনার পরিস্ফুটনই ভাওয়াইয়া গানে লক্ষ্য করা যায়, স্বভাবতই লোকসাহিত্যের বিচারে এর সাহিত্য মূল্য নিঃসন্দেহে অপরিসীম। কাব্য লক্ষণ বিচারের মাপকাঠিতেও ভাওয়াইয়া সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ।)

প্রতীকতা—(Symbolism) ঃ নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সাহিত্য মূল্যমান নির্ধারণে সাহিত্যে প্রতীকতা বা সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার বিচার্য। সাহিত্যে প্রতীক ধর্মের আরোপ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ফরাসী সাহিত্যে। প্রতীকীবাদের প্রবক্তা ফরাসী লেখক রিম্বাদ (Rimbend) এবং স্তিফান মালার্মে (Stephane Mallarme)। এদের ভাবধারা পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্যেও অনুপ্রবেশ করে। অবশ্য ফরাসী সাহিত্যেরও আগে প্রাচীন চৈনিক সাহিত্যেও প্রতীকতার মাধ্যমে বিবৃত নানা কাহিনীর কথা জানা যায়। এগুলি মূলতঃ সাঙ্কেতিক-ধর্মী এবং গুহ্য তত্ত্বকথাতেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এইসব পরিশীলিত সাহিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রহিত হয়েও উত্তরবঙ্গের কবিকুল রচনা করেছেন নানা প্রতীক-ধর্মী সঙ্গীত এবং সাহিত্যের নান্দনিক বিচারে এইসব প্রতীকী সঙ্গীত সসম্মানে উত্তীর্ণ। যেমন একটি গান—

'ভাগিনা ধান মাড়িয়া দে—।
মরুচের গচগিলা থাগড়াথুগড়ী ফল বিস্তর ধরে
হাত বাড়াইতে মরুচের গচ হালিয়া দুলিয়া পড়ে' (সংকঃ পৃঃ ৫৮)

এখানে ফলন্ত লঙ্কার গাছকে পূর্ণযৌবনা নারীর প্রতীক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। পরকীয়া প্রেমে মগ্ন মামী তার ভাগিনাকে আহ্বান করছে এই যৌবন উপভোগ করতে।

পশুকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে গানরচনারও নিদর্শন অনেক। বৃত্তিগতভাবে হাতী ও মোষ রাজবংশী জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যদিকে হাতী পবিত্রতা ও শক্তির প্রতীক। আদিবাসী জীবনে হাতীকে মোটিফ হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। রাজবংশী সমাজে হাতী ও মোষ ছাড়াও অন্য সব বন্য প্রাণীও জনগণের দৈনন্দিন জীবনে স্থান করে নিয়েছে। যেমন একটি গানে শিয়ালকে সাঙ্কেতিক অর্থে প্রেমিকের পরিচয়ে গাওয়া হয়েছে।

'পাটাবাড়ীত মোর শিয়াল কান্দে, কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে,
আজি কালা মুই একেলায় রে॥' এখানে মূল অর্থ বাড়ীর পাশে প্রেমিক বিরহে কাল কাটায়, আমি প্রিয়া একলা থাকবো আজ রাতে, তুমি তখন এসো। সাহিত্যে এই প্রতীকতা বা সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার পরিশীলিত সাহিত্যের মুন্সিয়ানার পরিচয় বহন করে, সেই বিচারে ভাওয়াইয়া গানেরও সাহিত্য মূল্য বা নান্দনিক বৈশিষ্ট্য যথেষ্টই।

সাদৃশ্য (Parallalism) ঃ—সাহিত্যের অন্যতম নান্দনিক বৈশিষ্ট্য-রচনায় সাদৃশ্যের ব্যবহার করে কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করা। এই বিচারেও ভাওয়াইয়া

সঙ্গীত পিছিয়ে নেই। অবশ্য ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহৃত সাদৃশ্য সমূহ পরিশীলিত সাহিত্যের ন্যায় কল্পনা-আশ্রিত না হয়ে তা প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত পরিবেশের মধ্য থেকেই সংগৃহীত। প্রকৃতির গাছপালা, পশুপাখী, নদনদী প্রভৃতিই ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সাযুজ্যতার উপকরণ।

"লোক মানসে নিসর্গ-প্রীতি অসাধারণ। কিন্তু সেই নিসর্গ-প্রীতির প্রকাশ মার্জিত সাহিত্যের মতো সূক্ষ্ণ কারুকাজ ভরা নয়, গভীর অন্তর্দৃষ্টিও তাহাতে নাই। নিসর্গকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে দেখিয়া উহার স্থূলদিকটাকেই এমন কারুমণ্ডিত করিয়া লোকসঙ্গীতে প্রকাশ করা হয় যে, দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতাকে এড়াইয়া সময় সময় তাহাও নির্মল কাব্যরসের আধার হইয়া উঠে।"[৫] মানবজীবনে এমন নৈসর্গিক দৃশ্যকে সাদৃশ্য করে ভাওয়াইয়ায় রচিত হয়েছে নানা গান। একটি গানে তিস্তানদীর উথাল পাথাল ঢেউয়ের সঙ্গে নারী হৃদয়ের ব্যথা বেদনার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন উত্তরবঙ্গের লোককবি। তারই একটি গানের অংশ,

'ও নদীরে, ও মোর তিস্তারে—।
তোর য্যামোন থৈ থৈ ব্যালা
সেইমত মোর হৃদের জ্বালা রে।' (সংকঃ পৃঃ ৩৬)

শব্দ দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার ঃ ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে শব্দ দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শব্দ দ্বৈতের ব্যবহারে কাব্যে এক নতুন ব্যঞ্জনা আনে। যেমন,

'হাটিয়া যাইতে নদীর জল—
থাক্‌লুম কি থুক্‌লুম্‌ কি থল্লাল্‌ থল্লাল করে।' (সংকঃ পৃঃ ৩৪)

এখানে জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়কার শব্দ বোঝানো হয়েছে শব্দ দ্বৈতের ব্যবহার করে। এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ আরও পাওয়া যায় যেমন, খস্যোর কি মস্যোর (নতুন শাড়ী পরে চলার শব্দ) 'ট্যাপ্পাস কি টুপ্পুস' (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), দাড়াড়াম্‌ কি দিড়িড়িম্‌ (নদীর পাড় ভেঙে পড়ার শব্দ) প্রভৃতি।

উপমান ও উপমেয় ঃ ভাওয়াইয়া সাহিত্যে উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যখন মধ্যযুগীয় ভারতীয় বা বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন উপমার জন্য (কথায় বলে 'উপমা কালিদাসস্য) তখন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে ব্যবহৃত উপমাগুলি সাধারণ জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা থেকেই সংগৃহীত। ভাওয়াইয়ায় এমন সব বিষয়কে উপমান বা উপমেয় করা হয়েছে যা পরিশীলিত বা সংস্কৃত সাহিত্যে শুধু নয় অন্য কোন লোকসাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়নি। এখানেই ভাওয়াইয়া গানের

সাহিত্য সৌন্দর্য। দীঘল নারীর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে তার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে সুপারী গাছের সঙ্গে। যেমন,

'হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে—
'আহারে, কাঙ্খনী গচের গুয়া।' (সংকঃ পৃঃ ১২)
অপরূপ এইসব উপমা অন্য সাহিত্যে বিরল।

শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ ঃ প্রত্যেক দেশের কাব্যের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, লিখিত সাহিত্য থেকে যা স্বতন্ত্র। রাজবংশী উপভাষাতেও সঙ্গীত সাহিত্যে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার হয় যা লিখিত গদ্যসাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র। এই শব্দগুলির প্রয়োগ মূলতঃ কাব্যেই দেখা যায় যেমন নিধুয়া পাতার, অসের যৈবন, নিদয়া, কোলার মাইয়া, ইমিকি ঝিমিকি পানি, নিদারুণ হুয়া, অসের গালা, হাউসের দিন, কটুরহিয়া, পুবাল বাতাস, পচ্চিয়া বাও, মলেয়ার ঝড়, কাংখের কলসী, ভাবের বন্দুয়া, চিকণ কালা, অঞ্চলের গুয়া, কাজলভোমরা প্রভৃতি বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহার গদ্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে কিছু চলতি শব্দেরও কাব্যিক ব্যবহার দেখা যায় যেমন ওভাগো নী, স্যাও, শাংখা, নয়ান, পাংখা, আঁংখ, নিরলে, চিরৎকাল, অঞ্চল, উজালা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কাব্যিক বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে যেমন উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে তেমনি এক বিশেষ কাব্যিক বৈচিত্র্যও আছে এই সাহিত্যে। ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য বিরহী পুরুষের বেদনায় যত মুখর, বিরহিনীর হৃদয়ের কথা বিশ্লেষণে ততটা নয়। কালিদাসের 'মেঘদূতম্'—বিরহী যক্ষের হৃদয় বেদনায় নীল। রঘুবংশের 'অজবিলাপ'—অন্যতম শ্রেষ্ঠ শোককাব্য, রামায়ণেও তাই। রাজা দশথের বিলাপ দিয়ে শুরু আর সমগ্র কাব্য রামচন্দ্রের বেদনায় সিক্ত। কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের অধিকাংশ জুড়েই নারী হৃদয়ের আক্ষেপানুরাগে বেদনার্ত। এমন কি পুরুষের কণ্ঠেও নারীর হৃদয় বেদনার মর্মবাণী। বৈষ্ণব সাহিত্যে নারী ও নারীত্ব সাধন-প্রকৃতির সংকেত হিসাবে প্রতীকীরূপেই প্রতিভাত, কিন্তু উত্তর-বঙ্গের ভাওয়াইয়া গান প্রকৃতই নারীর অন্তস্তলের বেদনার কাহিনী। এখানেই ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সাহিত্যের স্বকীয়তা, শাশ্বত সাহিত্যের এই নতুন দিকের প্রকাশ ভাওয়াইয়া গানেই পাওয়া যায় যা অন্য সাহিত্যে বিরল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ চট্‌কা গানের ইতিহাস ও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য

১· চট্‌কা গানের স্বরূপ নির্ণয় ঃ

(চট্‌কা বা চটক জাতীয় গানের আভিধানিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যে গানে 'কান্তি সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব প্রতিভাত হয় তাই-ই চটক বা চটকা জাতীয় গান'। চটকের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকেই চট্‌কা গানের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়। চট্‌কা গান সাধারণতঃ আনন্দময় প্রেমের গান, বা গভীর ব্যঞ্জনাময় সমাজচিত্র অথচ হাল্কা সুরে পরিবেশিত। কখনও এই গান চটুল ছন্দে গীত—আনন্দ হাসি আর কৌতুকের অভিব্যক্তিতে ভরপুর, কখনও বা তাতে প্রকাশ পায় গভীর দীর্ঘশ্বাসের মর্মবাণী। উত্তরবঙ্গের সঙ্গীত শিল্পীদের ভাষায় চট্‌কা হল এমন গান যা 'মনের চোক্ষে রঙ লাগি যায়'—অর্থাৎ মনে রঙের চটক ধরায় বলেই এই গান চটকা বলে পরিচিত। চটকা গান উত্তরবঙ্গের সহজ সরল জন-জীবনের দৈনন্দিনের ছবি, আনন্দ উচ্ছ্বাস, হাসি-কান্না, ঠাট্টা-মস্করার অনাবিল আনন্দের সাঙ্গীতিক প্রকাশ।)

"প্রেম ভাবের সমুচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া ভাওয়াইয়া গান রচিত হইয়া চলিলেও ইহার একটি ধারার মধ্যে একটু লৌকিক বিকৃতি দেখা গিয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া ইহার মধ্যে এক নূতন প্রকৃতির লোকসঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা চট্‌কা গান নামে পরিচিত।"[১] অবশ্য ভাওয়াইয়া গানের বিকৃতিতে চট্‌কা গানের সৃষ্টি এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ভাওয়াইয়া ও চট্‌কার গায়কীই স্বতন্ত্র, চট্‌কা ভাওয়াইয়া গানের বিকৃতরূপ নয় বরং ভাওয়াইয়া ও চটকা একে অন্যের পরিপূরক।

ছন্দের বা গায়কীতে চট্‌কা গান চটুল হলেও গানের ভাব ও বিষয়বস্তুতে সব সময় চটুল হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক গানই চটুল ভঙ্গীতে পরি-বেশিত হলেও তারই গভীরে থাকে গভীর বেদনার মর্মবাণী। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা তাই দুই বিশেষ রূপের গান উভয় গানই রাজবংশী জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গ। ছন্দিত ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হলেও চট্‌কার কোন কোন গানের গভীরে লুকিয়ে থাকে সমাজ জীবনের করুণ ছবি, অর্থ-নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের দীর্ঘশ্বাস কিংবা রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের সোচ্চার প্রতিবাদ। প্রকাশ ভঙ্গিমায় এ গান হয়তো লঘু ছন্দের, কিন্তু ভাবের গভীরতায় কখনই নয়, অবশ্য সমাজের লঘু বিষয় নিয়েও রচিত নানা চট্‌কা গান, যেমন রঙ তামাশা, কেচ্ছা প্রভৃতি গান চট্‌কাতেই

গাওয়া হয় বলে চট্‌কা গান সম্পর্কেই এক সাধারণ ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ রয়েছে।

"ভাওয়াইয়াকে যেখানে আমরা হতাশা বিচ্ছেদ ও দুঃখ দীর্ঘশ্বাসের গান বলি, আত্মবিলাপের দীর্ঘ রেশ বলে মনে করি, সেখানে চট্‌কার চটুল ছন্দ নৃত্যের লাস্যভঙ্গীতে আনে আশার সঞ্চার, আলোড়িত মনে আনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের একাগ্র সাধনা। উদাস করা হৃদয়ও আশার নিবিড়তায় ঘর বাঁধে একটুকরো আশ্রয়ের জন্যে, নিভৃতে পাবার পরম সৌভাগ্যের জন্যে। তাই চট্‌কার চটুল ছন্দের গভীরে যে স্থিরতা আছে তারই আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দয়িতার অন্তরে, দুঃখ সুখের আঘাত তীব্র হয় প্রাণে।"[২]

এক সময় উত্তরবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন উপকথা অবলম্বনে বা বেদ পুরাণের কাহিনী নিয়ে তৈরী হত নানা পালাগান বা 'পালাটিয়া গান'। এই পালাটিয়া গানে দীর্ঘ সময় ধরে একঘেয়ে সুরে গাওয়ার মাঝে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য গীদাল (মূল গায়েন) গানের মধ্যে ক্লান্তি অপনোদন কল্পে বা সাময়িক স্বস্তির (Temporary relief) আশায় কিছু ভাঙা গান পরিবেশন করতো। এই ভাঙা গানের সঙ্গে মূল গানের কোন সম্পর্ক থাকতোনা, মূল পালাটিয়া গানের একঘেয়েমি কাটাতেই মূল কাহিনী থেকে সরে এসে পরিবেশিত হত লঘু ছন্দের বা হাস্যরসের কিছু গান। স্বভাবতই এইসব গান হত লঘু রস ও কৌতুক মিশ্রিত। এই সব গানে থাকতো রঙ তামাশা, কেচ্ছা বা অন্য কোন লঘু বিষয়। এর সুরও তাই লঘু ও চটুল ছন্দের। বিশেষতঃ এইসব ভাঙা গান হত পালাটিয়া গানের টানা সুর থেকে স্বতন্ত্র।

অন্যভাবেও বলা যায় চটকা গান হল জনজীবনের ভাবগম্ভীর অবস্থা থেকে সাময়িক বিচ্যুতি। ভাওয়াইয়া গান যেমন অনুভূতির দ্বারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার সঙ্গীত, গানের গায়কী অনুযায়ী চট্‌কা গান সেই জাতীয় গান নয়। চট্‌কা গান ভাওয়াইয়া গানের পাশাপাশি চলে, তবে ভাওয়াইয়ার বিকৃতি চট্‌কা গান নয়, গায়কী শ্বাসাঘাত প্রধান হওয়ায় এর সুরের কাঠামো চটুল বা দ্রুতলয়ের হলেও ভাব গভীরতায় একে কেবল চটুল গানের পর্যায়েই ফেলা যায় না।

"চটকা গানের মধ্যে আভিধানিক অর্থে যেমন সুরারোপেও তেমনি আনন্দের স্পর্শ আছে। দৈনন্দিন লোকজীবনে যেমন দুঃখ, বেদনা, বিরহ আছে, তেমনি আনন্দ, প্রেম, উল্লাসও আছে। চটকা গানের বিষয়বস্তুতে এবং সুরে সে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাহিত্যিক গভীরতায় এগুলি

হীন নয়। 'ভাওয়াইয়া' গানে বিরহের উদাস নিঃশ্বাস আছে, তবে চটকায় আছে মিলনের স্বচ্ছন্দ আবেগ। দুটো রীতির এটুকু প্রভেদ ছাড়া দুটি রীতি প্রায় একই।"৩

(শ্রেণী বিভাগে চট্কা মূলতঃ আদি রসাত্মক প্রেমগীতি, সমাজ নীতির প্রতি কটাক্ষে অত্যন্ত শ্লেষাত্মক, রসগীতির মধ্য দিয়েই অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক। হাস্যরস, শান্তরস ছাড়াও করুণরসের অভিব্যক্তিও মেলে চট্কা গানে। অর্থাৎ বিষয় বিন্যাসে অন্যান্য সঙ্গীতের ন্যায় চটকা গানও বিভিন্নমুখী। কিন্তু গায়কী ও প্রকাশ ভঙ্গীতে ভাওয়াইয়া হতে স্বতন্ত্র। ফলে দেখা যায় অনেক গানই কোথাও ভাওয়াইয়া গান হিসাবে গীত হলেও সেই একই গান চটকা গান হিসাবেও পরিবেশিত। গায়কের মেজাজ ও প্রকাশ ভঙ্গীই স্থির করে সংশ্লিষ্ট গানের গায়কী ভাওয়াইয়া না চটকা পর্যায়ের। যে গান একজনের কণ্ঠে না পাওয়ার বেদনায় দীর্ণ, সেই গানই অন্য গায়কের কণ্ঠে প্রকাশ ভঙ্গীর পার্থক্যে শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী চটকা গানে পরিণত হতে পারে। এই কারণে ভাওয়াইয়া ও চট্কা গানের মধ্যে মূল পার্থক্য তার গায়কীতে, সঙ্গীতের বিষয়বস্তুতে নয়। ভাওয়াইয়া ও চটকার পারস্পরিক পার্থক্য শুধু সুরে, কথায় ও ভাবে নয়।)

২ চটকা গানের বিষয়-বৈচিত্র্য ও ছন্দ বিচার :

বিষয়-বৈচিত্র্যের বিচারে চট্‌কা গানের অবাধ গতি। বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাবধারা থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছাড়াও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা, কেচ্ছা ও উৎসবের আনন্দময় কাহিনী চিত্র হল চটকা গান। "সাধারণতঃ লঘুস্তরের বিষয়বস্তু ও সমাজ-চিত্র—বা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে চট্‌কা গানগুলি রচিত হইলেও চটকা শ্রেণীর লঘুতালের গানেও নায়ক-নারিকার পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ বেদনার গানও যথেষ্ট পাওয়া যায়।"[১] চটকা গানের ছন্দ চটুল ও ভাব লঘু হওয়ার ফলে বিভিন্নমুখী বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে এই গানে। বিভিন্ন পালাকীর্তনের একঘেয়ে সুরে শ্রোতৃবৃন্দ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাদের সাময়িক আনন্দ উচ্ছল করে তোলার মানসে গীত লঘু গীত জীবনের নানা বিষয় নিয়েই কৌতুক ও হাস্যরসের সৃষ্টি করতো।

বিষয়-বৈচিত্র্য চটকা গান তাই সর্বতোমুখী। বিষয় বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমাবেশের পরিচয় পাওয়া যায় কতকগুলি গানের উল্লেখ করলেই। যেমন,

১। **বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবধারায় রচিত**

ক) ওরে আগা নাওয়ে ডুবু ডুবু পাছা নাওয়ে বইসো (সংকঃ পৃঃ ৮৭)

খ) কিসের মোর আন্দোন কিসের মোর বাড়ন (সংকঃ পৃঃ ৪৮)

২। **কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে**

ক) কালা আর না বাজান বাঁশরী (সংকঃ পৃঃ ৮৮)

খ) আজি পায়বা ঘুঙ্ঘুরা বাজেরে (সংকঃ পৃঃ ৮৭)

৩। **প্রেম নিবেদন**

ক) প্রেম জানেনা অসিক কালা চান (সংকঃ পৃঃ ৯২)

খ) হাত ধরিয়া কও যে কাথা (সংকঃ পৃঃ ৯৪)

৪। **সামাজিক অবস্থা**

ক) নাক ডাঙ্গেরার ব্যাটাটা। চউখ ভাঙ্গেরার লাতিটা (সংকঃ পৃঃ ১১০)

খ) ও শাউড়ী মাই না পারি মুই ভাত আন্দিবার (সংকঃ পৃঃ ১০৫)

৫। **রঙ, তামাশা**

ক) আই মোর সতীনিগিলা কয় (সংকঃ পৃঃ ১১৩)

খ) দ্যাকোরে মোর ঢকো আবো ক্যামনরে সোন্দরী (সংকঃ পৃঃ ১১৬)

৬। **উৎসবের গান**

ক) ভাল্ কইর‍্যা বাজান রে দোতরা (সংকঃ পৃঃ ১১০)

খ) গাল তোল গাও তোল কইন্যা (সংকঃ পৃঃ ১০৯)

৭। **লোক সাংবাদিকতা**

ক) আসরেতে খাড়া হয়্যা বন্দিম এ লোক কাক্ (সঙ্কঃ পৃঃ ১২৪)

খ) হুরবা কুমকুম করে চরেখা (সঙ্কঃ পৃঃ ২২)

গায়কীতেও চটকা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ছন্দোময় গতিতে নিবন্ধ থাকায় অধিকাংশ গানই দাদরা বা ডাবল দাদরা তালে নিবন্ধ। নাচের তালে তালে এই ছন্দের গতি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে। সুরও কাটা কাটা, ভাওয়াইয়াতে যেমন সুরের ভাঙন আছে সুরের সেই রকম ভাঙন চটকা গানে নেই। গানের এক কলি থেকে অন্য কলিতে যাওয়ার সময় তালের বা সুরের হেরফের হয়না দ্রুত অন্য কলিতে যাওয়া যায় সুরের গতি ও ছন্দ অপরিবর্তিত রেখেই।

"চটকা গানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সারি গানের ভাব এবং রূপগত অনেক-গুলি সাদৃশ্য আছে। সারি গানের মধ্যে প্রেমের বিষয় থাকিলেও যেমন তাহা নিতান্ত লঘু এবং চটুল তাল প্রধান সুরে রচিত হইবার ফলে তরলায়িত হইয়া উঠে, চটকা গানেও তাহাই হয়, তবে সারি গানের রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমের কাহিনীকে নিতান্ত লৌকিক স্তরে অবনমিত করিয়া কৌতুক উপভোগ করা হয়, চটকা গানে তাহা করা হয় না।"[২]

চটকা গানের গায়কী বিশ্লেষণে এক অভিমত পাওয়া যায় যে চটকা গানে ঝুমুরের প্রভাব পড়েছে বা ঝুমুরের ছন্দে আকৃষ্ট হয়ে চটকা গানের সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিমত অনুযায়ী, "সাঁওতাল বিদ্রোহের পর অত্যাচার উৎপীড়নের ফলে ঊনবিংশ শতকের প্রথমপাদে সাঁওতালরা তাহাদের প্রিয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে উত্তরবঙ্গের জঙ্গল বহুল রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলে চলিয়া আসে। সেই হইতেই এই অঞ্চলের লোকদের সাথে তাহাদের পরিচয় ঘটে এবং এখানকার অধিবাসীরা ঝুমুরের অপূর্ব সুরে আকৃষ্ট হয় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ঝুমুরকে চটকা গানের মাধ্যমে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।"[৩] অবশ্য এই তথ্য ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাঁওতাল বিদ্রোহের অনেক আগেই অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছিল এবং তখন থেকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকার প্রচলন। অন্যদিকে জাতিগত হিসাবে রংপুর ও কোচবিহারে সাঁওতাল জনসংখ্যার কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না এমন কি তৎকালীন আদম সুমারীতেও রংপুর ও কোচবিহারে সাঁওতাল জনসংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। যা কিছু সাঁওতাল পরিবার এসেছিল দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে তাও

কেবল জীবিকার তাগিদে এবং চা-বাগিচায় কাজের প্রয়োজনে বৃটিশ মালিকের তত্ত্বাবধানে।

স্বভাবতই সাঁওতালদের ঝুমুর গানকে চটকা গানের নিজস্ব করে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা, যেহেতু চটকা গানের প্রচলনের সময় রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঝুমুরের পরিচয়ই ঘটেনি। অন্যদিকে চটকা ও ঝুমুর গানের গায়কীতেও রয়েছে পার্থক্য। (ঝুমুর ছন্দোবন্ধ সঙ্গীত হলেও তার সুরে থাকে দোলানি, অন্যদিকে চট্‌কায় দোলানির পরিবর্তে রয়েছে কাটা কাটা ছন্দ। চটকার অনুষঙ্গ যন্ত্র দোতারা আর ঝুমুরের মাদল—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।)

অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলাতেও ঝুমুর গানের প্রচলন রয়েছে, এবং সেই ঝুমুর গানও সাঁওতাল বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত, তাই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গান হিসাবে ঝুমুর গানের মূল্যায়ন করা এবং সাঁওতাল সম্প্রদায় ও ঝুমুর গানকে একাত্ম করা ঐতিহাসিক বিচারে সঠিক নয়। উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচায় যে সব সাঁওতাল সম্প্রদায়কে আনা হত তাদের মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার চেয়ে বিহার ও মধ্যপ্রদেশের শ্রমিকই বেশি। এই আদিবাসী শ্রমিকদের উত্তরবঙ্গে বলা হয় মদেশিয়া'। এদের সঙ্গীতের প্রভাবও ভাওয়াইয়া বা চটকা গানে পড়েনি। কারণ চা-বাগিচা অঞ্চলের মদেশিয়া এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল অত্যন্ত প্রকট, ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের গানের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল দুরূহ।

ঝুমুর গানের সঙ্গে নয়, বরং অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার মারফতী' গানের সঙ্গে চট্‌কা গানের সুর ও ছন্দের সাদৃশ্য রয়েছে। মারফতী গানের সমে সমে ঝুঁকি দিয়ে গাওয়ার ঢঙটিও ঠিক চটকা গানের গায়কীর সঙ্গে মিলে যায়। সীমান্ত অঞ্চলে পারস্পরিক যাতায়াত সহজ থাকায় উভয় অঞ্চলের গানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকাই স্বাভাবিক। শ্রীহট্টের বিখ্যাত 'হাছন রজার গান' হিসাবে যেগুলি প্রচলিত তার একটি গানের সঙ্গে চটকা গানের গায়কীর তুলনা করলেই এই সাদৃশ্য সহজে ধরা পড়ে। অবশ্য মারফতী গানে যেমন একই সুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতগতিতে গানের প্রথম কলির কয়েকটি কথা এক নাগাড়ে বলে হঠাৎ গানের সুরে বা তালে আরম্ভ হয়, চটকা গানের গায়কীতে সেই রকম কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। যেমন মারফতী একটি গানের প্রথম কলি 'চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই' এই কথাগুলি একসঙ্গে বলে তারপর গানের সুরে বাকী কথা আরম্ভ হয়, চটকায় তা হয়না। অন্য একটি

মারফতী গানের সঙ্গে তুলনা করলে তার গায়কীর সঙ্গে চটকার গায়কীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আখেরীচেতন অঙ্গের মারফতী গান ঃ লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ি ভালা নায় আমার। (সংকঃ পৃঃ ৫)

া সা না | সা রা া | া া া | পা পা া | মা গা া
০ লো কে ব লে ০ ০ ০ ০ ব লে ০ রে ০ ০

রা া রা | মা মা গা | রা গা া | সা বা গা া া া
ঘ র বা ড়ী ভা ০ লা ০ ০ নায় আ ০

চটকা গানের স্বরলিপিতেও গায়কীর অবিকল রূপ দেখা যায়।
চটকা গান, 'ওকি মাইগে মাই, মোর মতন আর সতী নারী নাই(সংকঃ পৃঃ১২০)

া পা পা | মা পা া | মা া া | রা া া | া া া
০ ও কি মা ই ০ গে ০ ০ মা ই ০ ০ ০ ০

রা া মা | মা মা গা | রা গা া | রা সা া | সা া া
মো র ম তন আ র স তী ০ না রী ০ না ই ০

আলোচ্য স্বরলিপিতে দেখা যায় যে মারফতী গানে যেখানে নীচু পর্দায় গান শুরু হয়েছে সেখানে চট্‌কা গানের শুরু অনেক উঁচু পর্দায়। অর্থাৎ পঞ্চম থেকে চটকা গানের শুরু। গানের এই ধরতাই দুধরনের গানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন, এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে চট্‌কায় যেখানে চটুল ভাবের গানের কথা ও সুরের প্রকাশ, মারফতী গানের প্রকাশে থাকে আত্মনিবেদন। স্বভাবতই এই দুই ধরনের গানের শুরুতে পার্থক্য দেখা যায়। চটকার চটুল ভাবই তাকে উঁচু পর্দায় সুর বাঁধতে সাহায্য করে। চটকা গানের এই চটকদারী গায়কীই তার প্রাণ-ভোমরা, এখানেই চটকা গানের গায়কীর স্বকীয়তা। এই কারণেই চটকা গান ভাওয়াইয়া গান থেকেও স্বতন্ত্র। যদিও কখনও কখনও একে অন্যের পরিপূরক, তা কেবল পরিবেশগত অবস্থার জন্যই, গায়কীতে কখনই নয়।

৩. চটকা ও ভাওয়াইয়া গানের তুলনামূলক আলোচনা :

উত্তরবঙ্গের জনজীবনের প্রেম সঙ্গীতের দ্যোতনা প্রকাশ করে যে ভাওয়াইয়া গান তা মূলতঃ বিচ্ছেদের বা আত্মনিবেদনের সুরে ভরপুর, অন্যদিকে চটকায় প্রতিবিম্বিত হয় সামাজিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘটনাবলী, হাস্যরসাত্মক রচনা এবং রাজনৈতিক কাহিনীর বাণীচিত্র। স্বভাবতঃই উভয়ধরনের সঙ্গীতের মধ্যে গুণগত ও বিষয়গত পার্থক্য থাকবেই। একদিকে বিচ্ছেদের সুর, হতাশার সুর আর আত্মনিবেদনের সুর আর অন্যদিকে আনন্দের গান, রঙ্গরসিকতার গান এবং শ্লেষাত্মক গানের সুর কখনই এক হতে পারে না। নরনারীর সহজাত প্রবৃত্তিতে যে পারস্পরিক প্রেমনিবেদনের গানের সৃষ্টি তারই অন্যদিকে সমাজের চটুল দিকের গান, একটিতে যখন ধ্বনিত হয় প্রেমিকার মনের গোপন কথা অন্যদিকে চটকা গানে তখন সোচ্চারে উচ্চারিত হয় সামাজিক রঙ্গতামাশার কথা। স্বভাবতই প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে দুটি ভিন্ন ধরনের লোক সঙ্গীত।

ভাওয়াইয়া দীর্ঘ টানা সুরের গান, অন্যদিকে চট্‌কা চটুল সুর ও লঘু ছন্দে বিধৃত। বিষয় বৈচিত্র্যেও তাই চটুলতার আভাস। ভাওয়াইয়া গানের একটানা সুরের মাঝে থাকে ভাঙন, কিন্তু চটকা গানে এই ভাঙনের বৈশিষ্ট্য নেই। ভাওয়াইয়া গানের লয় দুলকি চালের অর্থাৎ তালের মাত্রা বিভাজনে তা কাহারবা বা তেওড়া তালে নিবন্ধ, সেখানে চটকা গানের ছন্দ দ্রুতলয়ের বা দাদরা এবং ডাবল দাদরা ছন্দের। ভাওয়াইয়ার ন্যায় গানের সুরের রেশ টেনে পরবর্তী পর্দায় সুরকে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সুরে মীড়ের যে কাজ রয়েছে চটকা গানে সাধারণতঃ তার ইঙ্গিত নেই। চটকা গানের সুর তার ছন্দের ন্যায় কাটা কাটা, সেই কারণে গানের এক কলি থেকে অন্য কলিতে যাওয়ার সময় মীড়ের চল নেই, রয়েছে ছন্দোবন্ধ তাল বিন্যাস।

ভাওয়াইয়া গানের যেমন নির্দিষ্ট কয়েকটি অন্তরা থাকে, চটকা গানের সেইরূপ নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে না। ছড়ার ন্যায় চটকা বিবৃতি মূলক হতে পারে আবার জীবনের মাত্র একটি অসঙ্গতি নিয়েই চট্‌কা গান তৈরী হতে পারে। ভাওয়াইয়া গানে যে দীর্ঘ টানের ব্যবহার হয় এবং যাতে বিষাদ বিধুর সুরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, চটকার দ্রুততর ছন্দের ফলে এই ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ থাকে না।

ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের মধ্যে পার্থক্য আরও একস্থানে, তা উভয় প্রকার সঙ্গীতের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার বিচারে। ভাওয়াইয়া প্রেমের গান, তাতে হতাশাই থাক আর আত্মনিবেদনের সুরই বিধৃত হোক, কখনই এই গান সর্ব-

জন গ্রাহ্য হয়নি, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর কল্যানে চট্‌কা গানের আবেদন সর্ব-জন গ্রাহ্য, যেহেতু সার্বিক মনোরঞ্জনের জন্যই চটকা পরিবেশিত, এই কারণে ভাওয়াইয়ার তুলনায় চটকা গানের সার্বজনীনতা অপেক্ষাকৃত অধিক। "দোতারায় চটকার ডাং পড়িবামাত্র ছোট বড় সকল শ্রোতাই বিশেষ ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে এবং প্রত্যাশিত আনন্দরস উপভোগের আশায় উৎফুল্লহইয়া থাকে। গানের তালে তালে নৃত্যের ছন্দে গায়কের বাদকের এবং শ্রোতা সাধারণেরও দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লীলায়িত হইয়া উঠে।"[২]

এই কারণেই দেখা যায় ভাওয়াইয়া গানের গায়ক বা নায়ক গান বাঁধছে মরানদীর দোলা জমিতে মোষের পিঠে বসে মোষ চরাতে চরাতে বা একাকী সুদূরে গরুর গাড়ীতে পাড়ি দওয়ার সময় লোকালয়ের বাইরে, জন মানবহীন পথে পথে। আর সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন বাউদিয়া আপন মনে দোতারা বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গানে মাতোয়ারা হয়ে চলেছে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, জমির আলপথ ধরে। জনবসতির গৃহাঙ্গনে এদের কোন ঠাঁই নেই। অন্যদিকে সামাজিক জীবন ধারনের পরতে পরতে যে ঘটনাবলী অহরহ সংঘটিত হয়ে চলেছে তাই নিয়েই রচিত চটকা গান সমাজের কাছে আদৃত হয়ে উঠেছে, তার চটুল ছন্দ ও ভাবের সহজবোধ্যতার জন্য। সর্বজনের মনোরঞ্জনের জন্য মনে চটক লাগাতে চটকা গানের তাই সমাদর। সামাজিক উৎসব আনন্দেও চটকা গানেরই কদর।

ভাওয়াইয়া ও চটকার মধ্যে পার্থক্য গায়কীর। অনেক সময় বিষয়বস্তু এক হলেও দুই ভিন্নমুখী গায়কীর জন্য যে গান কোথাও ভাওয়াইয়া হয়েছে, সেই গানই অন্যত্র চটকা বলে পরিচিত। যেমন কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যায়।

১। কালা আর না বাজান বাঁশরী (সঙ্কঃ পৃঃ ৮৮)

২। কিসের মোর আন্দোন কিসের মোর বাড়ন (সঙ্কঃ পৃঃ ৪৮)

৩। নাইওর ছাড়িয়া দ্যাও মোর বন্দু (সঙ্কঃ পৃঃ ৭০)

৪। পেম জানেনা অসিক কালা চান (সঙ্কঃ পৃঃ ৩৩)

উল্লিখিত গানগুলি ভাওয়াইয়া ও চটকা উভয় সুরেই গাওয়া হয়। পার্থক্য কেবল গায়নরীতির। ভাওয়াইয়ার সুরে প্রকাশ পায় করুণ আর্তি, চটকা পরিবেশিত হয় উচ্ছ্বল আনন্দের সুরে।

অবশ্য চটুল ছন্দে প্রকাশিত হলেই গানের বিষয়বস্তু সবসময় চটুল নাও হতে পারে, হয়তো এই চটুল ছন্দের মধ্যেই ব্যক্ত হয় গভীর হাহাকারধ্বনি। যেমন একটি চটকা গান, 'নওদারীটা মরিয়া মোর সে হইসে হানি', গানের

কথায় স্ত্রীর সেবাপরায়ণতা ও তার হাস্যোজ্জ্বল দিনের কথা স্মরণ করে স্বামীর হাহাকার সমগ্র চট্‌কা গানটি চটুল হওয়ার পরিবর্তে এক বেদনাময় হাহাকার ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছে। অন্যদিকে ভাওয়াইয়া গানের সুরের কাঠামো-তেই রয়েছে কান্নার আভাস, এ গান অপেক্ষাকৃত মর্মস্পর্শী। ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। "চটকা শব্দের প্রয়োগগত অর্থ হল আঘাত শ্বাসাঘাত, চটুলতা নয়। সে জন্যেই তাল দ্রুত। চটকা ভাওয়াইয়ার মূল পার্থক্য এখানেই। চটকাকে চটকদার বলা 'folk etimology'-র উদাহরণ মাত্র।"[৩]।

সপ্তম অধ্যায় ঃ রাজবংশী সমাজ এবং ভাওয়াইয়া ও চটকা গান

১. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ভাওয়াইয়া ও চট্কা গানের মূল্যায়ন করতে গেলে তৎকালীন এমনকি বর্তমানেরও রাজবংশী সমাজ জীবনের পর্যালোচনা প্রয়োজন। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী রাজবংশী সমাজে ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক অবাধ মেলামেশার প্রচলন তখনও ছিল না, এখনও নেই। যদিও আধুনিক সভ্যতার আলোকে রাজবংশী সমাজ বর্তমানে অনেক প্রগতিশীল হয়েছে তাহলেও দক্ষিণ বঙ্গের বাঙালী সমাজে যেমন এখনও ছেলে-মেয়েদের প্রেমঘটিত ভালবাসাকে অন্যায় বলে মনে না করলেও তাকে সহজভাবে সকলে গ্রহণ করেন না, তেমনি রাজবংশী সমাজেও এই প্রেমঘটিত ভালবাসা গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে, মূলতঃ প্রেম ভালবাসা সংক্রান্ত সঙ্গীতের গায়কেরা যেমন সমাজের দৃষ্টিতে দোষী, তেমনি যারা এই গানের পৃষ্ঠপোষক তারাও সমানভাবে সমাজে অপাংক্তেয়। এই মানসিকতার পরিবেশে গড়ে ওঠা ভাও-য়াইয়া গান তাই সমাজে সমাদৃত হয়নি।

সেই কারণেই ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন লোকালয়ে ছিল না, কৃষিকার্যের অবসরে, দূর মাঠে বা ধূ ধূ প্রান্তরে কাশ ও নলখাগড়ার দোলাজমিতে মোষ চরাতে চরাতে কিংবা একাকী বিজন পথে চলার কালে গাড়ীয়ালের কণ্ঠেই ফুটে উঠতো ভাওয়াইয়া গান। সামাজিক দৃষ্টিতে লোকালয়ে দোতারা, ব্যানা সারিন্দা, বাঁশী ইত্যাদি বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গান করা ছিল অপরাধ। তৎ-কালীন সামাজিক দৃষ্টিতে ভাওয়াইয়া-গায়ক ও তার যন্ত্রসঙ্গীদের সম্পর্কে মনোভাব যথাযথ ফুটে উঠেছে একটি ছড়ায় ঃ

'সারিন্দা বাজায় সাউদ সদাগর
বাঁশী বাজায় চোর।
ব্যানা বাজায় ত্যানা পিন্দা
দোত্রা হারামখোর।' ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীদের সম্পর্কে জন-মানসের অবজ্ঞার ন্যায় প্রকট না হলেও চটকা গানেরশিল্পীদের প্রতিও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ছিল না। কেবল জনজীবনের নানা অঙ্গ চটকা গানে প্রতি-ফলিত হওয়ায় চটকা গানকে একেবারে অপাংক্তেয় করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া নানা সঙ্গীতের আসরে গীদালের গাওয়া পালা গানের অবসরে চটকা গান পরিবেশনের অনুরোধ শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ থেকেই করা হত, সেই কারণেই

চটকা গান সামাজিক দৃষ্টিতে অনাদৃত না হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্রয়ই পেয়েছে। তবে চটকার কোন কেচ্ছা মূলক বা রঙ তামাশার আসরে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপস্থিতি নিষেধ ছিল। এই চটকা গান কখনও পালাগানের অংশ বিশেষকে নিয়েই স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া হয়, ফলে শ্রোতৃমণ্ডলী চটকা গানকে স্বতন্ত্র গান হিসাবে বিচার না করে তাকে পালাটিয়া গানেরই অংশ বিশেষ বলে মনে করতেন। ফলে পরবর্তী সময়ে এই সব পালাগান যখন চটকা গান হিসাবে পরিবেশিত হত তখন আর এই গানকে অবজ্ঞা করতেন না কেউ। এইভাবেই চটকা গান পায় সামাজিক স্বীকৃতি, অন্যদিকে ভাওয়াইয়া গানের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের কোন পথ ছিল না।

ভাওয়াইয়ার অধিকাংশ গানেই নারীর অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ হয় পুরুষ কণ্ঠে। ভাওয়াইয়া গানের এই বৈশিষ্ট্যেও রয়েছে রাজবংশী সমাজ ব্যবস্থার অবদান। ভাওয়াইয়া গানে নারী হৃদয়ের অভিব্যক্তির প্রাধান্যের কারণ হল, "ইহা স্ত্রী প্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজজীবন হইতে উৎসারিত হইয়াছে। সেইজন্য এই অঞ্চলের লোকসাহিত্য মাত্রেই নারীর অন্তর্বেদনাই সঙ্গীতে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।"[২] ভাওয়াইয়া গানে নারী হৃদয়ের অভিব্যক্তির প্রাধান্য থাকলেও বোড়ো জাতির সমাজ ব্যবস্থায়, নারীর পক্ষে বিশেষতঃ কুমারী মেয়ের পক্ষে সোচ্চারে কোন প্রেমের গান গাওয়া অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থাকলেও মণিপুরী 'মাতৈ' সমাজে যেমন সঙ্গীতেও নারীর প্রাধান্য স্বীকৃত, রাজবংশী সমাজে এই ধরণের স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল না। রাজবংশী সমাজে ধর্মসংক্রান্ত আচার আচরণের মেয়েলী গীত নারী কণ্ঠে গীত হলেও প্রেমের গান গাওয়ার প্রশ্রয় কখনই দেওয়া হয়নি। ফলে রাজবংশী সামাজিক দৃষ্টিতে ভাওয়াইয়া গান কখনই আদৃত হয়নি।

সামাজিক বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী আরও একটি দিক বিচার্য। রাজবংশী সমাজে কন্যার বিয়ে দিয়ে তার বাবা মা 'কণ্যাপণ' গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে অনূঢ়া কন্যা ভালবেসে বিয়ে করলে তার বাবা ও মায়ের পণ বাবদ টাকা আদায় সম্ভব না হতে পারে, এই আশঙ্কাতেই হয়তো মেয়েদের ভাওয়াইয়া গান গাইতে দেওয়া হত না। বিয়েতে বরকে যে কন্যাপণ দিতে হয়েছে তার উল্লেখ পাওয়া যায় একটি গানে, যেখানে ধার করে বিয়ের টাকা জোগাড় করেছে ছেলে তারই করুণ কাহিনী:

> 'আজি ধার করিয়া করলু বিহো—
> আজি মাহাজনটা পাক পাড়ছে ওহো গে নোদারী
> বড়য় দুক্কে থাছু গে চাখিরি।' (সঙ্কঃ পৃঃ ৭৪)

আবার এমন কিছু গান আছে যেগুলি কেবল মেয়েরাই গায়। সেগুলি মূলতঃ আনুষ্ঠানিক গান। এর মধ্যে 'হুদুম দ্যাও'র গান তো পুরুষের শোনাও নিষেধ। সামাজিক দৃষ্টিতে ভাওয়াইয়ার প্রেমের গান অপাংক্তেয় হলেও বেশ কিছু সংখ্যক সমাজ-গ্রাহ্য গানও পাওয়া যায়। আনুষ্ঠানিক গান ছাড়াও রয়েছে অধ্যাত্ম-চেতনার গান, পূজার্চনার গান আর সর্বোপরি লোক সাংবাদিকতা বা গণজাগরণের গান।

অবশ্য যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতিরফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরওপরিবর্তন হয়েছে দ্রুতগতিতে। এককালের ভৌগোলিকগতভাবে বিচ্ছিন্ন উত্তরবঙ্গ এখন দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, ফলে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমী ভাবাপন্ন সংস্কৃতি প্রভাবিত করেছে উত্তরবঙ্গের জনমানসকেও। আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা নারী আজ আর 'নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্ধু' বা মৈষাল, মাউত কিংবা গাড়ীয়ালের 'পন্হের দিকে চায়া' থাকে না। যুবতী নারীর চোখে এখনকার নায়ক চলচ্চিত্রের নায়ক বা বড় চাকুরে,ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার। স্বভাবতই বর্তমানের ভাওয়াইয়া ও চটকা গান তার মৌলিকত্ব হারিয়ে আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। রাজবংশী সমাজে এক সময়ে অল্প বয়সী মেয়ের বিয়ে হত, কিন্তু এখন মেয়েরা লেখাপড়া না শিখে বিয়ে বসতে রাজী নয়, আর কোন 'চ্যাংড়া বন্ধুও' নিজে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিয়ে করতে রাজী নয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানেরও বিষয় বস্তু।

জনজীবনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকা গান টিকে রয়েছে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে। বর্তমানের রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি ও আধুনিক সভ্যতার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নি:সন্দেহে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটালেও সাংস্কৃতিক মূলধারার আমূল পরিবর্তন আজও ঘটেনি। "গরুর গাড়ির জায়গায় রেলগাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসঙ্গীতে কিন্তু রেলের সিটি শুনা যায়নি। বিশেষতঃ সদ্যোমুক্ত ঔপনিবেশিক এবং অর্ধ-ঔপনিবেশিক এশীর দেশগুলি সম্বন্ধে তা আরো সত্য। পাশ্চাত্যের কোন কোন ধনতান্ত্রিক দেশে যন্ত্রশিল্পের সামগ্রিক বিকাশের জন্য লোকসঙ্গীত প্রায় গবেষণার বস্তু হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু আমাদের দেশ এখনো একান্তভাবে কৃষিনির্ভর এবং সেই কৃষিতে 'মেকানাইজেশান' কিছুই হয়নি। আজো আমাদের পল্লী অঞ্চলে অসংখ্য গানের জন্ম হচ্ছে।"[৩]

'লোকসঙ্গীতে রেলের সিটি শুনা' না গেলেও তার পরিবর্তনের ধারা

স্পষ্ট ধরা পড়ছে গানের কথা ও ভাবের ব্যঞ্জনায়। নাগরিক জীবনের সাধ-আহ্লাদ এখন গ্রামীণ জীবনকেও প্রলুব্ধ করে, শহুরে সাহিত্য এখন গ্রামীণ জীবনকে আপ্লুত করে, ফলে নাগরিক শব্দ-চয়ন ও ভাবের প্রকাশ অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে। সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন অনিবার্য। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি এগুলির বিচার করা যায় তাহলে বর্তমানের ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের মধ্য দিয়ে সমাজ-ব্যবস্থার জীবনমুখী দৃষ্টি, বিপ্লবী ঐতিহ্যের সুর আর অন্যায়ের প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবন ধারার স্বপ্ন ও আনন্দ সব কিছুই প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং এইজন্যই ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গান আজও জনজীবনের সঙ্গীত হয়েই রয়েছে।

---

২. অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন রাজবংশী সমাজের জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতির গুরুত্ব অনুযায়ী সমুদয় বৃত্তিকে ঝুঁকি ও শৌর্যের বিচারে তিনভাগে ভাগ করা যায়। মৈষাল ও মাহুতের জীবিকা, গাড়ীয়াল, সিপাই, নাইয়া বা মাঝি, সাদু বা সওদাগরের জীবিকা আর হালুয়া বা চাষী, বৈদ বা কবিরাজ, আখোয়াল বা রাখাল, মাচুয়া বা জেলে, ভারী বা ভারবাহক, ছাগল চরুয়া প্রমুখের জীবিকা। জীবনের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি থাকে মৈষাল ও মাহুতের বৃত্তিতে, পরবর্তী পর্যায়ে ঝুঁকি বা পরিশ্রম সাধ্য কাজ করে গাড়ীয়াল সিপাই প্রমুখ এবং অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকি অন্যান্য বৃত্তিতে।

অরণ্য-প্রধান অঞ্চলের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় অন্য এক জীবিকার দ্বারা, তা মৈষাল এ মাহুতের বৃত্তি। আসামের গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া অঞ্চলের গভীর অরণ্যে বিচরণ করতো 'অরণা ভৈষ' বা বুনো মোষ আর হাতী। এই মোষ ধরে সেগুলি পালন করা এবং হাতী ধরে তাকে পোষ মানানো ছিল উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃত্তি। এই দুঃসাহসিক জীবিকায় পদে পদে ছিল জীবন নাশের আশঙ্কা, কিন্তু আর কোন লোভনীয় বৃত্তি না থাকায় এবং এই কাজে শৌর্যের পরিচয় থাকায় রাজবংশী পুরুষেরা এই বৃত্তি গ্রহণ করতো। আসামের বনাঞ্চলে আর জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার অরণ্যে মৈষাল আর মাহুতের বৃত্তিই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতো।

"সেইকালে এ সব অঞ্চলের নদীর ও নিম্নভূমির জলা ও বিলের ধারে ধারে নলখাগড়া, ইকড়া, বাতা (Elephant grass) ইত্যাদি বিবিধ প্রকার ঘাসের ঠাসা একটানা জঙ্গল। সেগুলিতে বড় বাঘ (Royal tiger), শুয়োর, হরিণ এবং বিশেষ করে বুনো মোষদের বিরাট বিরাট দলের চারণভূমি ছিল। তা ছাড়াও বুনো হাতীর দল ও গণ্ডারদেরও আনাগোনা কম ছিল না।"[১] এই-সব মৈষাল ও মাহুতের জীবনযাত্রা ছিল যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি করুণ ও মর্মস্পর্শী। জীবিকার তাগিদে তারা যেত গভীর অরণ্যে, সেখানে মারাত্মক হিংস্র বন্য জন্তুকে বুদ্ধির লড়াইয়ে পরাস্ত করে এই সব মৈষাল ও মাহুতের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হত। বাথানের প্রতি মৈষালদের আকর্ষণ না থাকলেও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে মৈষাল ও মাহুতকে ঘর ছাড়তে হয় বারে বারে, কারণ তার জীবিকা বাঁধা রয়েছে মহাজনদের কাছে। এই মাহুত ও মৈষালের গানই ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা।

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের গাড়োয়ানেরও ভূমিকা

রয়েছে। এক সময় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় গড়ে উঠেছিল বন্দর। আর কোন যানবাহন না থাকায় গরুর গাড়ীই ছিল একমাত্র ভরসা। নির্জন দুপুরের প্রচণ্ড তেজে তপ্ত ধু ধু প্রান্তরে একাকী গরুর গাড়ী চালাতে চালাতে গাড়ীয়ালের বুকের যে না পাওয়ার অতৃপ্ত বাসনার তপ্ত বাতাস বেরিয়ে আসতো, তাইই রূপ নিয়েছে ভাওয়াইয়া গানে। এমনি একটি গান,

'বাওকুমটা বাতাস য্যামন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে

(ওরে) ঐমত মোর গাড়ীর চাকা পন্হে পন্হে ঘুরে রে।' (সংকঃ পৃঃ ৪৫)

উত্তরবঙ্গে যখন রেলপথের প্রসার ঘটেনি বা মোটর গাড়ীর ব্যবহার শুরু হয়নি তখন দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে নদী পথই ছিল একমাত্র ভরসা। এই নদী পথের নাবিক বা মাঝি আর বাণিজ্যের ব্যাপারী সওদাগর উভয়ের জীবনই অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। আর এদের নিয়েই গাওয়া নানা লোকসঙ্গীত উত্তরবঙ্গের একমাত্র সম্পদ হয়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জনজীবনের অর্থনীতিতে কৃষিজীবীর যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রয়েছে রাখাল, জেলে, ছাগল-চরুয়া বৈদ্য বা কবিরাজ, ও সিপাহির ভূমিকাও। এইসব বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও জীবনের গান ভাওয়াইয়া ও চটকা। অর্থনৈতিক অবস্থার মোকাবিলা করতে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছে নানা জীবিকা, আর তাদের জীবনের অন্যতম সঙ্গী ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে এই সব জীবিকার লোকদেরই তুলে ধরা হয়েছে। আর্থিক অস্বচ্ছলতা এদের নিত্য সঙ্গী—সঙ্গীতের মধ্যেই ফুটে ওঠে সেই আর্থিক অবস্থার কথা।

একদিকে নগর-সভ্যতায় ব্যাপক শিল্পায়ন, অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কর্ম প্রচেষ্টাকে সম্বল করে শিল্পনগরীর সুখ সম্পদলাভের আকাঙ্ক্ষা গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। শিল্পায়নের দৌলতে গ্রামীণ জীবনে শ্রমিক জীবনকে স্বীকার করায় কর্মের অবকাশ কমে গেছে। উপরন্তু বিধ্বস্ত অর্থনীতি, সামাজিক বিভেদ ও সর্বোপরি শহরের জৌলুষ ভরা চাকচিক্যের মোহ—স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগের ব্যত্যয় ঘটিয়ে পরানুকরণ জীবনধারার প্রশ্রয় দিচ্ছে। ফলে মাটির কাছাকাছি যে সংস্কৃতি এক সময়ে সমাজ ব্যবস্থার নিয়ন্তা ছিল তা আজ ছেয়ে গেছে শহরের আধুনিক মিশ্র পশ্চিমী সংস্কৃতির ছায়ায়।

উত্তরবঙ্গের জনজীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে। যে ভাওয়াইয়া গান গড়ে উঠেছিল মূলতঃ মৈষাল মাহুত, নাইয়া, গাড়ীয়াল, সিপাইদের জীবন কাহিনীকে নিয়ে বর্তমান জীবন-

যাত্রায় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত লোকসঙ্গীতেরও রূপ বদল ঘটেছে। রেলগাড়ী আর সড়ক পরিবহনের সহজ লভ্যতায় গাড়ীয়ালের ভূমিকা এখন নগণ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের তাগিদে 'বন কেটে বসত' গড়ার ফলে 'নিধুয়া পাতারে দোলা জমির' আজ বড়ই অভাব। পাওয়া যায় না আর 'অরনা ভৈষের পাল' আর 'হস্তীর পালের বহেলা'র সন্ধান। বাথানে মোষ চরিয়ে আর বনের হাতীকে পোষ মানিয়ে আজ আর গ্রাসাচ্ছনের ব্যবস্থা নেই, এমনকি সেই অরণ্যই আজ ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলে পরিণত। দুর্দান্ত মৈষাল আর মাহুত আজ আর রাজবংশী কন্যার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের পর্যায়ে পড়েনা —কন্যার রুচিরও আজ পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাটির গান ভাওয়াইয়া ও চটকা যেন প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে।

"উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের প্রাণ প্রবাহ যেন অনেকটা থেমে যাচ্ছে। নদীগুলি আর নাব্য নেই, নেই অরণ্যে কাঠ ও মধু সংগ্রহের পালা। হাতী ধরা, মোষ চারণ যেন গ্রাম জীবনের জীবিকা থেকে উঠে গেছে। তাই মইষাল বন্ধু, গাড়ীয়াল বন্ধু, রাখাল বন্ধু, ও মাহুত 'বন্ধুদের রোমাঞ্চকর যাত্রার কাহিনী আর শোনা যায় না। তিস্তা, তোর্ষা নদী, ময়না কুরুয়া পাখীরা আর বিরহীনী 'চিটুল বিধুয়া' নায়িকার মনের কথা যেন শোনে না।"[২]

৩. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট :

একদিকে ভাওয়াইয়া মূলতঃ প্রেমের গান, বিরহ-বিচ্ছেদের গান আর আত্মনিবেদনের গান, অন্যদিকে চটকা হাসি মস্করা, রঙ-তামাশা ও আনন্দের গান হলেও, এই প্রেম, বিরহ, হাসি-মস্করা তামাশাকে ছাপিয়ে এই সঙ্গীতে কখনও কখনও প্রকাশ পেয়েছে সমাজ চেতনার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণতঃ রাজবংশী সমাজের জীবনযাত্রা সহজ সরল ও নিস্তরঙ্গ। প্রথমে রাজতান্ত্রিক ও পরে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় কোন উত্থান পতন পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু কালক্রমে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহে তুলেছে উত্তুঙ্গ ঢেউ। ফলে রাজনৈতিক ঘটনাবলী কখনও জনগণকে করেছে উদ্বেলিত, তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছে—আবার কখনও বা তা ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাসে পর্যবসিত হয়ে কেবল হাহাকারেই বিলীন হয়েছে। এই ব্যথা ও বঞ্চনার প্রতিবাদে শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট মানুষেরা তখনও কোন হাতিয়ার নিয়ে সরব আন্দোলনের মানসিকতা অর্জন না করায় জীবনের গানের মধ্যেই তার প্রকাশ সীমায়িত রেখেছে। তাই কেবল প্রেমের কোমল কলিই নয়, নয় কেবল অধ্যাত্মবাদের অন্তর্মুখীনতা এমনকি কেচ্ছা আর রঙ তামাশায় জনজীবনের গান ভাওয়াইয়া ও চটকাতেও ফুটে উঠেছে প্রতিবাদী বিপ্লবের সুর, অন্যায়ের প্রতিবাদ আর কঠোর শ্লেষাত্মক ভাষায় অন্যায়কারীর মুখোস উন্মোচনের কথা।

অবশ্য কারও মতে, "বিভাজন ও সংঘাতহীন বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছিল যে সকল লোকসঙ্গীত, পরবর্তীকালে সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না হওয়ায় এবং বিক্ষিপ্ত কৃষক বিদ্রোহগুলি ব্যর্থ হওয়ায় জনজীবনে সামন্তবাদী আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে লোকসঙ্গীতেরলোকায়ত রূপ অন্তর্হিত হতে থাকে। অন্তর্হিত লোকায়ত রূপের প্রতিভূ সব দেহতত্ত্বের গান। পরলোকের আকাঙ্ক্ষা শোষকের অধ্যাত্মবাদ এ সব গ্রহণ করাই হলো লোকসঙ্গীতের স্বধর্মচ্যুতি।"[১] কিন্তু অধ্যাত্মবাদের চেতনায় অনুপ্রাণিত হলেই লোকসঙ্গীতের স্বধর্মচ্যুতি ঘটে, এমন সহজ সিদ্ধান্তে আসা যথাযথ নয়। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে অধ্যাত্মবাদও এক সংস্কৃতি, তবে পর্যালোচনা প্রয়োজন যে লোকসঙ্গীত লোকজীবনের প্রাণের কথা প্রকাশ করছে কিনা, সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহ যে ভাওয়াইয়া ও চটকার স্বধর্মচ্যুতি ঘটেনি। কারণ জনমুখী সঙ্গীত হয়েই আজও টিকে রয়েছে ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা লোকসঙ্গীত। এজন্যই দেখা যায় ভারতের রাজনীতিতে নতুন পদক্ষেপ হিসাবে নিবাচনের পূর্বে মেকী জনদরদীদের সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গায়ক সাবধান করে দিয়েছেন জনসাধারণকে—

'উত্তরবঙ্গের কিষাণ সাবদান
যদি মানষির মত বাঁচিবারে চান।' (সংকঃ পৃঃ ১২৩)

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নেমে

আসে সামাজিক ব্যাধি—কালোবাজারী ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাওয়া না গেলেও অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়ে কালোবাজারে, প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান অঢেল। এই অবস্থাকে জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য সোচ্চার হয়ে ছিলেন উত্তরবঙ্গের লোক কবি নিবারণ চক্রবর্তী।

'দরদী মোর ভাই। চল করি চল্ বাঁইচবার লড়াই।' (সংকঃ পৃঃ ৮৫)

অন্যদিকে হাসি মস্করার মাঝেও তীব্র শ্লেষের বাণী ফুটে উঠেছে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক ভাগাভাগির ফলে বেরুবাড়ী অঞ্চল পাকিস্তানের ভাগে দেওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাই চটকায় ধ্বনিত হয়েছে এক প্রতিবাদী গান।

'আসরেতে খাড়া হয়্যা বন্দিম এ লোক কাক
দ্যাশের হালত্ দেখ্যা হইচুঁরে আবাক।
মরি হায়রে কলিকাল—
বেরুবাড়ী দিবার নাগি নাগ্যাচে ক্যাচাল।' (সংকঃ পৃঃ ১২৪)

রাজনৈতিক সচেতনতার আরও প্রকাশ পাওয়া যায় যখন জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে জনমত যাচাইয়ের প্রশ্ন আসে। একযোগে সকলে জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য ভোট দিতে সমবেত হওয়ার কথা ভাওয়াইয়া গানের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

'চল্ চল্ চল্ চলরে কিষাণ ভাই
জমিদারী উটিবার তনে ভোট দিবার যাই।' (সংকঃ পৃঃ ৮৪)

অন্যদিকে সরকারের ভুমিনীতি ও অপারেশন বর্গাকে সমর্থন করে দরিদ্র ভুমিহীন কৃষকদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বানও দেখা যায় চটকা গানে।

'ও কিরে ও হালুয়া—'
দখল রাখ তুই ভুঁই দখল লেখাইয়া।' (সংক পৃঃ ১২২)

দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক কুসংস্কার সবকিছুই তাই আজ ভাওয়াইয়া ও চট্কা গানে স্থান করে নিয়েছে। যে জন-সমাজের গান ভাওয়াইয়া ও চটকা, সেই সমাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে এই লোকসঙ্গীতও। লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যই এই, চলমান জনজীবনের প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াই তার ধর্ম। ভাওয়াইয়া ও চট্কা তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

৪. রাজবংশী নারীর জীবনে :

ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানের অধিকাংশই পুরুষকণ্ঠে গীত হলেও বেশির ভাগ গানেই থাকে নারীর নিজস্ব কথা। সামাজিক জীবনের নানা চিত্র-কল্পনায় নারীই মুখ্য হয়ে উঠেছে উভয় ধরণের লোকসঙ্গীতে। এর অন্যতম কারণ হয়তো রাজবংশী জীবনযাত্রায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন। পুরুষের যত গান তার অধিকাংশেরই মুখ্য উপজীব্য নারী, নারীকে ঘিরেই তার প্রেম, হাসি-কান্না, নারীর বিচ্ছেদই-পুরুষের বিরহের একমাত্র জ্বালা। মানব-মনের এই বিচিত্র অবস্থায় বিরহ মিলন, মান-মাথুরের অপূর্ব কথা ছন্দিত হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে। সামাজিক নানা বাধা-বিপত্তিতে অসংখ্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে রাজবংশী নারীর মনে মুক্তির কামনা অনেক বেশি প্রবল। তাদের মনের রুদ্ধস্রোত যেন ঢল নেমে আসা নদীর স্রোতের মত। উত্তরবঙ্গের নারী তাই অনেক বেশি আবেগ-প্রবণ ; তাদের গানে তাই মান-অভিমানের পালা বড় বেশি গভীর। রাজবংশী নারীর অভিমানী চোখের জল শরতের মেঘের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়,তা যেন বর্ষার মেঘমেদুর জলদ-গম্ভীর। তাই সে মেঘে যখন বর্ষা নামে তখন সে প্লাবিত করে জনসমাজকে।

"দক্ষিণের নদী সমুদ্রের জোয়ারে হয় উচ্ছল। তাই দক্ষিণ বাংলার কবিগণ যৌবনে দেখেছেন জোয়ারের উচ্ছ্বাস। উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ের ঢল নেমে নদী উচ্ছল। উত্তরাঞ্চলের কবিদের চোখে পড়েছে যৌবনের ঢলে'র প্লাবন। এমনি ছোটখাট একান্ত পরিচিত বস্তু দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁদের উপমার সম্ভার। তারি সংযোজনে যুবতী কন্যাকে দিয়ে তাঁরা বলিয়েছেন—

যৌবনের ঢলেরে বন্ধু ভাসিয়া যায় মোর গাও
কতদিন হইল বানিজ যাবার দ্যাশে ফিরান নাও"।*

যৌবন অলক্ষে এসে বাসা বাঁধে মনে, দেহে। রক্তে ছড়িয়ে দেয় তার দুর্দমনীয় প্রভাব। কিন্তু অলঙ্ঘ প্রাচীরের ন্যায় সামনে এসে দাঁড়ায় ন্যায় নীতির দণ্ডহাতে সমাজপতিরা, অপর পাড়ে যৌবন-তাড়িতা নারী তার আপন আবেগে চঞ্চল। তাই লোককবিরা তাঁদের মরমী কথায় তুলে ধরেছেন সমাজের এই নারী মনের ছবি। সেখানে কল্পনিক রাধাকৃষ্ণকে এনে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁরা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি, বা ধর্মীয় আবরণে-নারীর আকুলতাকে আচ্ছন্ন করারও প্রচেষ্টা নেই। নারীমনের কোমল অনুভূতিকে সত্যনিষ্ঠ করে সমাজের সামনে তুলে ধরলেও সমাজ তাকে কৌশলে উপেক্ষাই করে গেছে। কিন্তু সমাজ উপেক্ষা করলেও নারী মনের অতৃপ্ত কামনা বাসনা লোপ পায়নি, বরং প্রদমিত হওয়ায় তা আরও তীব্রতর হয়েছে। কুমারী মনের কামনার মণিকোঠা কানায় কানায় পূর্ণ, অনাস্বাদিত প্রেমের মধুর বাতাসে, কিন্তু সমাজের তাতে কোন সায় না থাকায় নারী ব্যাকুল হয়ে আপন মনের কথা জানায় পরম-পালক বিধাতার দরবারে—

'রে বিদি নিদয়া—।
পরথম যৈবনকালে না হৈল মোর বিয়্যা
আর কতয়কাল রহিম ঘরে একাকিনী হয়্যা।' (সংকঃ পৃঃ ৪১)

প্রেমে পাগলিনী প্রায় নারী নির্দয় মূক বিধাতার কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা পায় না, তাই যৌবন মদমত্তা নারী ছুটে বেড়ায় 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী' প্রায় স্বীয় প্রেমের কস্তুরী গন্ধে বিভোর হয়ে। প্রেমাকুলা নারী আক্ষেপ জানায়—

'আমি কি দিয়া বান্দিয়া আইকবো
আমার এ নয়া যৈবন রে।' (সংকঃ পৃঃ ৩৭)

হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনায় যৌবনোচ্ছ্বলা নারী সমাজের মানুষ এড়িয়ে আপন হৃদয়ের কামনার দুর্বহ ভার লাঘবের প্রত্যাশায় শরণ নেয় প্রকৃতির প্রতিভূ—নদী, গাছ ও পাখীর কাছে। যৌবনাবেগ তাড়িতা নারী শিমুল বৃক্ষকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করে—

'ওবিরিক্ষো শিমিলারে গগনে ম্যালে ঠ্যাল
নারী হয়্যা অসের যৈবন আইক্‌বো কতয়কাল।' (সংকঃ পৃঃ ৩৭)

বহতা নদীর মত সদা চঞ্চল যৌবনকেও বেঁধে রাখা যায়না অনন্তকাল, অথচ সমাজের কঠোর নিয়মে যৌবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণেও বাধার প্রবল প্রাচীর, স্বভাবতই মন চায় বিদ্রোহী হতে। সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে যৌবনদীপ্তা নারীর আপন ইচ্ছা প্রকাশ পায় ভাওয়াইয়া গানে—

'পাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি—
—যেনা দ্যাশে দোসর মিলিবে সেই দ্যাশোত যাইরে।"(সংকঃ পৃঃ৪০)

কিন্তু নির্মম সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ-নির্ভর যুবতী কন্যার অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেও আবার তা অন্তরেই অবদমিত হয়। কারণ চিরাচরিত প্রথা ভেঙে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার দুঃসাহস অনেকেরই থাকে না, বিশেষতঃ যে সমাজে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার একান্ত অভাব, তাই অসহায় কন্যা লজ্জার বাঁধন ছিঁড়ে মমতাময়ী মায়ের কাছে জানায় আপন অন্তরের বাসনা—

'আই মোক ব্যাচেয়া খা হে খা।
গাবুর হয়্যা মন বান্দিয়া না যায়রে রওয়া।' (সংকঃ পৃঃ ৬৮)

রাজবংশী সমাজ ব্যবস্থায় মেয়ের বিয়ে দিলে কন্যাপণ দিতে হয়, কিন্তু ভগ্ন অর্থনীতিতে ছেলেদের বিয়ে করার সামর্থ্য সব সময় থাকে না, ফলে অনূঢ়া কন্যার মন হয় বহির্মুখী। রাজবংশী জনজীবনের গান ভাওয়াইয়া ও চটকায় দরদী শিল্পীবৃন্দ—মেয়েদের এই ভাবাবেগকে সুরের দোলায় তুলে নিয়েছেন। সেই সুরের দোলায় দোলায়িত নারী হৃদয়ের করুণ আর্তি ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গের আকাশে বাতাসে, ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের রূপে।

রাজবংশী সমাজে মৈষাল,মাহুত, গাড়ীয়াল, নাইয়া সিপাই সকলেই স্ব-স্ব বৃত্তিতে গর্বিত ছিল, আর তাই এরাই ছিল রাজবংশী রমনীর কামনার ধন।

ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে তাই এদের কথাই এসেছে বার বার। তবু মৈষাল যায় বাথানে, তার কাছে প্রাণের খোরাকের চেয়ে দেহের খোরাক সংগ্রহই জরুরী। নারী সঙ্গ সুখের চেয়ে তাই বাথানই মৈষালের কাছে আকর্ষণীয়। "এই বেপরোয়া 'বাউদিয়া' চরিত্রের নায়কদের দেখা যেত—রুদ্রের তাণ্ডবে তাদের আকর্ষণ মৃত্যুর হাত ধরে চলতে তাদের আনন্দ, স্বাছন্দে তাদের বিতৃষ্ণা। তারা ঘর বাঁধত, ঘর তাদের বাঁধতে পারত না।"[২]

মৈষালের ন্যায় মাহুতও রাজবংশী রমনীর প্রার্থিত পুরুষ। হাতী ধরতে গিয়ে জঙ্গলা হাতীর আক্রমণে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, সেই আশঙ্কার কথাই ফুটে উঠেছে ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী নারীর কথা হয়ে,

'আরে ও মোর জোঙ্গলিয়া হাতীরে।
মিনতি করুঁরে তোরে— ।
ওভাগোনীটাক্ আড়ি না করিস এ ভোব সইংসারে' (সঙ্কঃ পৃঃ ৬১)

অবশেষে একদিন বাজে বিয়ের সানাই। সানাইয়ের সুর মূর্ছণায় একদিকে যেমন আনন্দ ঘন পরিবেশ গড়ে ওঠে তেমনি অন্যদিকে কন্যার আসন্ন বিদায়-ক্ষণে তার আত্মীয় পরিজনেরা হয় শোকাকুল। সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ের পর কন্যাকে যেতে হয় শ্বশুরবাড়ী—'স্বামীর ঘর করতে'। কিন্তু আজন্ম পালন করেছে যে বাবা মা ও আত্মীয় পরিজন, তাদের ছেড়ে যেতে কন্যার মন হয় বিয়োগ বিধুর। সদ্য বিবাহিতা কন্যার এই মনের অবস্থাও ভাওয়াইয়া গানে ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে—

'ওকি ও গাড়ীয়াল ভাই— ।
ও রে আইস্তে বোলান গাড়ী গাড়ীয়াল ও ধেরে বোলান গাড়ী
(ওরে) এক নজর দ্যাখিয়ালই মুই দয়াল বাপো বাড়ী।' (সঙ্কঃ পৃঃ৬৮)

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর হাল দেখে কন্যার প্রতিবাদী স্বরূপ প্রকাশ পায়। মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে তাকে বিয়ে করা হয়েছে এই অভিযোগে স্বামীকে তিরস্কার করতে তার বাধে না। চটকা গানে এর সুন্দর ঝঙ্কার দেখা যায়—

'নাক ডাঙ্গেরার ব্যাটাটা চউখ ডাঙ্গেরার লাতিটা
মোক ভুলালু সতের খাড়ু দিয়া।' (সঙ্কঃ পৃঃ ১০৪)

বিবাহিতা নারীর জীবনে চরম সর্বনাশ নেমে আসে তার পতি বিয়োগে। জীবনের চরম শোকের ছবিও ভাওয়াইয়া গানে ফুটে উঠেছে গভীর আর্তনাদে।

'উগলা কাথা কন্‌না, নেবা আগুন মোর জ্বালান না
বিয়ার সোয়ামী মোর গেইচেরে মরিয়া।" (সঙ্ক পৃঃ ৪৭)

কালের অনন্ত প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দুঃখ ও বেদনাবোধের গভীরতাও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে—একসময় সেই দুঃখবোধের বোঝা ঝেড়ে ফেলে নারী আবার চলতে শুরু করে নতুন অধ্যায়কে অবলম্বন করে। বাল-বিধবা যে নারী একসময়ে শোকাকুল হয়ে জীবনে চলার ছন্দ হারিয়ে ফেলে-

ছিল, সময়ের প্রলেপে সে তার পুরনো শোক পরিহার করে উঠে দাঁড়ায় নতুন করে 'জীবনের মানে' খুঁজতে। তাই আপন যৌবনের তাড়নায় সে আবার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে, আপনাকে আবার সুন্দর করে মেজে ধরে অন্য পুরুষের কাছে, নতুন করে প্রেম নিবেদন করে নতুন মানুষের কাছে। অবশ্য রাজবংশী সমাজে বিধবা বিয়ের প্রচলন থাকায় পুনর্বিবাহে সমাজের প্রচ্ছন্ন সায় থাকে। বাল-বিধবা নারী তাই প্রেমের ডালি নিয়ে বরণ করে তার নতুন প্রেমাস্পদকে—

'যাইও যাইও কালা আগুনেরো ছলে—

তোর কালার উজানে বাড়ী, মুঞি নারী চিটুল আড়িরে' (সংকঃ পৃঃ ১১)

এই ভাবেই এগিয়ে চলে সমাজ। জীবনের ছন্দ শুরু হয় নতুন লয়ে। শুধু কান্নাই নয়, নয় কেবলই ব্যর্থ প্রেমের হতাশ্বাস, ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে রয়েছে আশা পূরণেরও কাব্যগাথা।

রাজবংশী সমাজ জীবন যেভাবে গড়ে উঠেছে ও যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তারই সঙ্গে সমান ছন্দে ও গতিতে এগিয়ে চলেছে রাজবংশীজনজীবনের গান ভাওয়াইয়া ও চটকা। সমাজের প্রতিটি মুহূর্তের ছবি বাঁধা পড়েছে এই দুই সঙ্গীতে। মাতৃতান্ত্রিকসমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য হওয়ায় নারী জীবনের সঙ্গে ভাওয়াইয়া ও চটকা গানও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানই রাজবংশী নারীর জীবন দর্পণ, নারীর না বলা বাণীর বাঙ্ময় প্রকাশ।

সঙ্কলন ঃ প্রথম অংশ

ভাওয়াইয়া গানের বিষয়ানুযায়ী সঙ্কলন

[সংকলনের অধিকাংশ সঙ্গীতই বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থান এবং শিল্পীর কাছ থেকে সংগৃহীত। কতিপয় সঙ্গীত বিভিন্ন পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা ও গ্রামোফোন রেকর্ড থেকেও সংগৃহীত। সঙ্গীতের শেষে সংশ্লিষ্ট উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে।

সংকলনের বিষয়ানুযায়ী বিভাজনে সঙ্গীতের আক্ষরিক অর্থই গৃহীত হয়েছে, কতিপয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ ভিন্নরূপ হলেও সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থানুযায়ীই সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলে একই সঙ্গীতের কথান্তর প্রচলিত থাকলেও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অপ্রচলিত সঙ্গীত পরিহার করে কেবল প্রতিনিধিত্বমূলক সঙ্গীতই পরিবেশিত হয়েছে। বানান আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুযায়ী করা হয়েছে।]

সঙ্কলন ঃ দ্বিতীয় অংশ

চট্‌কা গানের বিষয়ানুযায়ী সঙ্কলন

[ভাওয়াইয়া গানের বিষয় বিন্যাসের ন্যায় চট্‌কা গানের বিষয়ানুযায়ী সংকলনেও গানের আক্ষরিক অর্থানুযায়ীই বিষয় বিভাজন করা হয়েছে, গানের অন্তর্নিহিত অর্থ ভিন্নতর বিষয়ের হলেও, অনেক ভাওয়াইয়া গানও চট্‌কা সুরে গাওয়া হয়। তবে যে গানগুলি মূলতঃ চট্‌কা গান হিসাবে স্বীকৃত ; সেই গুলিকেই এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।]

ভাওয়াইয়া গানের বিষয়ানুযায়ী সঙ্কলন

বিবাগী বাউদিয়া

ক. সৌন্দর্য বর্ণনা ॥ ১ ॥

দিনের শোবা[১] সুরয[২]রে, আইতের[৩] শোবা চান্[৪]
হালুয়ার[৫] শোবা হালকায্যি[৬], জমিনের[৭] শোবা ধান।
ঘাসের শোবা সবুজ অঙ[৮], (ওরে) মাটির শোবা ঘাস
কাশিয়ার[৯] শোবা ধল্লা[১০] ফুলে, আইলে[১১] ভাদ্দোর[১২] মাস ॥
পন্থের[১৩] শোভা বটরে[১৪] বিরিক্ষি[১৫], বিরিক্ষির শোবা ছেয়া[১৬]
বনের শোবা অসের[১৭] ফুলফল, মোনের[১৮] শোবা মায়া।
দিগীর[১৯] শোবা আজরেহংসা[২০] আর ও পদ্মফুল
নদীর শোবা বাইছালী[২১] খেলা, ভাঙ্গিয়া নামায় কুল ॥
দীগল[২২] ক্যাশ[২৩] শোবা করে, যৈবতীর[২৪] জাতি
গাবুর[২৫] পুরুষের শোবা (ওরে) খোলা বুকের ছাতি।
নারীর শোবা দীগল ক্যাশ উপবতী[২৬] নারী
(ওরে) ঘরের শোবা ব্যাটারেবেটি[২৭], পুব-দুয়ারী[২৮] বাড়ী ॥
খঞ্জনা পক্ষীর শোবা হইচেরে[২৯] খঞ্জনীরে লয়্যা[৩০]
মোর পুরুষের শোবা হইচে মোক্[৩১] সোন্দরীক্[৩২] পায়্যা[৩৩] ॥

(মাধব দাস। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-শোভা ২-সূর্য ৩-রাতের ৪-চাঁদ ৫-চাষীর ৬-কৃষিকার্য ৭-জমির ৮-রঙ ৯-কাশফুলের ১০-সাদা ১১-এলে ১২-ভাদ্র ১৩-পথের ১৪ বটগাছ ১৫-বৃক্ষ ১৬-ছায়া ১৭-রসের ১৮-মনের ১৯-দিঘীর ২০-রাজহাঁস ২১-বাইচ্ খেলা বা নৌকা দৌড় ২২-লম্বা ২৩-কেশ বা চুল ২৪-যুবতীর ২৫-জোয়ান ২৬-রূপবতী ২৭-ছেলেমেয়ে ২৮-পূর্ব-মুখী ২৯-হয় ৩০-লয়ে বা নিয়ে ৩১-আমাকে ৩২-সুন্দরীকে ৩৩-পেয়ে।

খ. আত্মনিবেদন

॥ ১ ॥

অবোদ[১] মোনরে—[২]

সকালে কর মোরে পার, বেলা ডুবিলে মোন হবে অন্দকার[৩]।
কিনারায়[৪] চাপিয়া[৫] নাও[৬], নায়ের বাদাম[৭] তুলিয়া দ্যাও
একেতে আন্দার আতি[৮] আরো নাই মোর সঙ্গে সাতী[৯]
পার কর্যা[১০] দ্যাও দয়াল গুরু, সময় বয়্যা[১১] যায় ॥
কেশীঘাট কদম্বতলা, ঐখানে সাদুর[১২] মেলা
ঐটে[১৩] বইসে[১৪] অবোদ মোন, কর হরি সাদোনা[১৫] ॥

(কুমার নিধিনারায়ণ কোচবিহার)

॥ ২ ॥

গোঁসাইজী কোন অংএ[১৬] বান্দিচোং[১৭] ঘর।
তাইতো ধান্দা[১৮] নাগে গোঁসাইজী কোন অঙএ বান্দিচোং ঘর।
চেংড়া কাল[১৯] গেইল্[২০] হাসিতে খেলিতে গাবুর[২১] কাল গেইল্ অঙ এ
পড়িল বিধুকাল[২২] ঘোটিল[২৩] জোঞ্জাল[২৪] গুরু ভজিম্[২৫] কতয়কাল[২৬] ॥
চুলোনা[২৭] পাকিল[২৮] দাঁতোনা[২৯] ভাঙ্গিল[৩০] বয়স হয়্যা[৩১] গেইল্ ভাটি[৩২]
আইস্তে আইস্তে[৩৩] খসিয়া পড়িল (ও তোর) অঙ্গিলা[৩৪] দোলানের[৩৫] মাটি।

(নারায়ণ পাল। কোচবিহার)

ভাটিয়ালী :

॥ ৩ ॥

মোন্ মাজি তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পারলাম না।
সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে
তবু নদীর কূলে কিনারা পাইলাম না ॥

শব্দার্থ : ১-অবোধ ২-মনরে ৩-অন্ধকার ৪-পাড়ে ৫-চেপে ৬-নৌকা ৭-পাল ৮-রাত্রি ৯-সাথী ১০-ক'রে ১১-বয়ে ১২-সাধুর ১৩-ঐখানে ১৪-বসে ১৫-সাধনা ১৬-রঙে ১৭-বাঁধছো ১৮-সন্দেহ ১৯-ছেলেবেলা ২০-গেল ২১-যৌবনকাল ২২-জীবনের অপরাহ্নবেলা ২৩-ঘটছে ২৪-গণ্ডগোল ২৫-বন্দনা ২৬-কোনসময়ে ২৭-চুলও ২৮-পেকে গেছে ২৯-দাঁতও ৩০-পড়ে গেছে ৩১-হয়ে ৩২-জীর্ণ ৩৩-ধীরে ধীরে ৩৪-রঙিন ৩৫-দালানের।

অ্যাকে আমার ভাঙা তরী
পাপের বোঝা হইল ভারী, এখন উপায় কি করি।
আমি আর কতকাল বাইবো বৈঠারে
নৌকা ভাইটায় ছাড়া উজায় না ॥

(রেকর্ড : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)

বাউল :

॥ ৪ ॥

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।
চুল ভিজাবনা আমি বেণী ভিজাব না।
জলে লামবো[১] জল ছড়াবো জলতো ছোঁবনা
এধার ওধার সাঁতার পাথার করি আনাগোনা
জলে ডুববো আমি কারো কথা শুনবো না ॥
ভোগ লাগাবো ভুখে মরবো না (সজনী গো)—
আমি রাঁধিবো বাড়িবো ব্যঞ্জন কাটিবো তবু আমি হাঁড়ি ছোঁবনা।
গোঁসাই রসরাজে বলে (নাগরী লো) শোনলো নাগরী
রূপের যাই বলিহারি
আমি হবোনা সতী না হবো অসতী তবু আমি পতি ছাড়বো না ॥

(সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—বাংলার লোকসংগীত ; ১ম খণ্ড । পৃঃ ৬৫)

গ. দেহতত্ত্ব

॥ ১ ॥

ও মোন অসনা[২]—।
মানব দেহার[৩] গৈরব[৪] কইরো[৫] না।
এ দেহা মাটির ভান্ড[৬], ভাঙিলে হইবে খান্ড খান্ড[৭]
জোড়া দিলে জোড় তো নাগে[৮] না ॥
যেমন আসমান[৯] হা'তে[১০] জল পড়ে, জলের ভুসুকা[১১] ধরে
দেইখতে দেইখতে[১২] যায় মিলাইয়া ॥
একাই এইসেচি[১৩] ভোবে[১৪] একাই যাইতে হবে
সঙ্গের সাতী কেউতো হবে না ॥

শব্দার্থ : ১-নামবো ২-রসনা ৩-দেহের ৪-গর্ব ৫-কোরনা ৬-মাটির পাত্র ৭-চুর্ণবিচুর্ণ ৮-লাগে ৯-আকাশ ১০-হ'তে ১১-বুদ্‌বুদ্‌ ১২-দেখতে দেখতে ১৩-এসেছি ১৪-পৃথিবীতে।

বিরিক্ষো[১] ঠ্যালে[২] পাকীর[৩] ভাসা[৪], ঠ্যাঙ্গ ভাইঙ্‌লে[৫] হবে কি দশা
ঐ রকম মানষির[৬] দেহারে।
একদিন আইস্‌বে[৭] দুরন্ত শমন, পরাইবে কটিন[৮] বন্ধন[৯]
মিনতি কইর্‌লে ছাড়িয়া যাইবে না॥

(উত্তম দাশ। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ২ ॥

এ ভোব সইংসারে[১০] রে, মোন না মজিল্‌ রে
চলো চলো দ্যাশে[১১] যাই।
নিদুয়া[১২] পাতারে[১৩] গচ[১৪], তারও হইল শত ঠ্যাল[১৫]
সেই না ঠ্যালে বগিলা[১৬]রে কইরচে[১৭] ভাসা[১৮]।
আহারের কারণেরে, জমিনে নামিল রে[১৯] সেও বন্দী ময়ার জালে॥
অথুটা শিমিলার[২০]নাও,টলমল করে গাও বত্তিশ বাঁধা খসিয়া পড়েরে জোড়া
মোন কাষ্ঠের[২১] নৌকাখানি, (আর) পবন কাষ্ঠের বৈঠাখানি
সেও ঠেকিল্‌[২২] বালুচরে রে॥

(চিত্তরঞ্জন দেব—বাংলার পল্লীগীতি । পৃঃ ২১৫)

ঘ. তুখ্যা বা মনশিক্ষা

॥ ১ ॥

এ দেহার গৈরব মিছা[২৩] জলের ভুলুকারে[২৪]
উড়িয়া যাবে পরাণপাখী পড়িয়া রবে দেহা[২৫]।
ভাই বলো ভাতিজা বলো সোম্পত্তিরো[২৬] ভাগী
আগে কইরবে[২৭] ধনের বাটা[২৮] পাছোত্‌[২৯] দেহার গতি॥
কাণ্ডা[৩০] বাঁশের খাট পালং[৩১] (ওরে) শুকনা পাটার ডরি[৩২]
চাইরজনাতে[৩৩] লইয়া যাইবে শ্মশান ঘাটার[৩৪] বাড়ি।

শব্দার্থঃ ১-বৃক্ষ ২-ডালে ৩-পাখীর ৪-বাসা ৫-ভাঙলে ৬-মানুষের ৭-আসবে ৮-কঠিন ৯-বাঁধন ১০-সংসারে ১১-দেশে ১২-ধুধু ১৩-প্রান্তরে ১৪-গাছ ১৫-ডাল ১৬-বক ১৭-করেছে ১৮-বাসা ১৯-নেমে এল ২০-শিমুল গাছ ২১-কাঠের ২২-আটকে গেল ২৩-মিথ্যা ২৪-বুদ্বুদ ২৫-দেহ ২৬-সম্পত্তি ২৭-করবে ২৮-টাকাকড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা ২৯-পরে ৩০-কাঁচা ৩১-পালঙ্ক ৩২-দাড়ি ৩৩-চারজনে ৩৪-শ্মশান ঘাট।

(আহা) হাতে নিবে জোখা নোড়ি[১] রে মোন্ কানদেতে[২] কোদাল
নিজ ঘর ছাইড়্যা গেইল্ নিদুয়া[৩] পাতার[৪] ॥
তলে দিবে ধাম[৫] খড়ি রে মোন্ উপ্রে দিবে খড়ি
তিন পাক্ ঘুরিয়া কহে বোলো[৬] হোরি হোরি ॥

(পানিয়া দাস। কোচবিহার)

॥ ২ ॥

ফান্দে[৭] পড়িয়া বগা কান্দেরে[৮]—
ফান্দ পাতিচে[৯] ফান্দুয়া[১০] ভাইরে পুঁটি মাচো[১১] দিয়া
ওরে) মাচের নোভে[১২] বোকা বগা পড়ে উড়াল দিয়া।
ফান্দে পড়িয়া বগা করে টানাটুনা[১৩]
(ওরে) আহারে কোন কুষ্কুরার[১৪] সুতা হলং লোহার গুণা[১৫] রে
ফান্দে পড়িয়া বগা করে হায় হায়
(ওরে) আহারে দারুণ বিদি[১৬] সাতী[১৭] ছাড়্যা[১৮] যায়রে ॥
উড়িয়া যায়রে চকোয়ার পংখী[১৯] বগীক্[২০] বলে ঠারে[২১]
(ওরে) তোমার বগা বন্দী হইচে[২২] ধল্লা নদীর[২৩] পাড়ে রে।
এই কাথা[২৪] শুনিয়া বগী দুই পাংখা[২৫] মেলিল্
(ওরে) ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিল্ রে ॥
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দেরে
বগীক্ দেখিয়া বগায় কান্দেরে ॥

[রেকড : আব্বাসউদ্দিন]

মারফতী

॥ ৩ ॥

লোকে বলে বলেরে ঘরবাড়ি ভালা নায়[২৬] আমার
কি ঘর বান্ধিমু আমি শূন্যেরই মাঝার।
ভালা[২৭] কইর‍্যা ঘর বান্দিয়া কয়দিন থাকমু[২৮] আর
আয়না দিয়া চাইয়া[২৯] দেখি পাক্না[৩০] চুল আমার।

শব্দার্থ: ১-লাঠি ২-কাঁধে ৩-ধুধু ৪-প্রান্তর ৫-মোটা কাঠ ৬-বলে। ৭-ফান্দে ৮-কাঁদে ৯-পেতেছে ১০-শিকারী ১১-মাছ ১২-লোভে ১৩-টানাটানি ১৪-রেশমী সুতা ১৫-তার ১৬-বিধি ১৭-সাথী ১৮-ছেড়ে ১৯-চকোর পাখী ২০-স্ত্রী বক ২১-ইশারায় ২২-হয়েছে ২৩-ধরলা নদী ২৪-কথা ২৫-পাখা। ২৬-ভাল নয় ২৭-ভালো ২৮-থাকবো ২৯-চেয়ে ৩০-পাকা।

এই ভাবিয়া হাছন রজায় ঘর দুয়ার না বান্দে
কোথায় নিয়া রাখবো আল্লায় তাই ভাবিয়া কান্দে।
জানতো যদি হাছন রজা বাঁচবো কত দিন
দালান কোঠা বানাইতো করিয়া রঙ্গীন ॥

(পূব বাংলার লোকসংগীত : দীনেন্দ্র চৌধুরী । পৃঃ ১৫৭)

॥ ৪ ॥

মোনরে—।
আপন কর্মদোষে সব হারাইলি, দোষ দিবি কাঁয়[১]
পুবান[২] পচ্চিয়া[৩] বাও[৪], আদাকিষ্ণের[৫] ভাঙ্গা নাও[৬]
ঠমকি ঠমকি উঠে পানি।
মোনরে—।
ইঙ্গলা পিঙ্গলার ঘর, ঘুণে কইর্‌ছে[৭] জরোজরো[৮]
খইস্যা[৯] পড়িল্‌ তোর বত্তিশ বন্দনের[১০] জোড়া
জোড়ার উপর জোড়ারে, পবন কাষ্ঠের নৌকারে
সেইনা নৌকা ঠেকিল্‌ বালুচরে ॥
মোনরে—।
ও পাড়ে কদম্বের গছ, ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল করে পাত্‌[১১]
তার উপ্‌রে জোড় বগিলার[১২] ভাসা[১৩]।
আহারে লোভেরে, জমিনে পড়িয়ারে
সেই না বগা ঠেকিল ময়াজালে[১৪] ॥

(পাতকী বর্মণ। জলপাইগুড়ি)

॥ ৫ ॥

ওরে দুনিয়ার মজা কেউ পাইল্‌ কেউ পাইল্‌ না।
এই তো ভোবের[১৫] কাণ্ড কারখানা।
দুই নিয়াই দুনিয়া, এই আছে এই নাই
তিতা মিঠা কিছুই বুঝলাম না ॥

শব্দার্থ: ১-কাকে ২-পূর্বদিকের ৩-পশ্চিমী ৪-বায়ু ৫-রাধাকৃষ্ণের ৬-নৌকা ৭-করেছে ৮-ঝাঁঝরা ৯-খ'সে ১০-বাঁধনের ১১-পাতা ১২-বকের ১৩-বাসা ১৪-মায়াজালে ১৫-ভবের (দুনিয়ার)।

দুইদিনের তরে ভাই শ্রীপুত্র[১] বান্দোব[২] পাই
দুইদিন বাদে ছাইড়বে সব জনাই
(আর) আসিলাম কিবা কাজে করিলাম কিবা কাজ
কি করিম্‌ নাই তার ঠিকানা ॥
ওরে ভাইব্‌তে ভাইব্‌তে[৩] জনম গ্যালো, ভাবোনা শ্যাষ হইল্‌ না
এই তো ভোবের কাণ্ডকারখানা ॥
(রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল : পৃঃ ২২৭)

৬. উদাসী মানস ॥ ১ ॥

আরে ও ভাবের দোত্‌রা—।
নবীন বয়াসে[৪] মোক্‌[৫] করলুরে বাউদিয়া ।
যখন দোত্‌রা তোক্‌[৬]নিলাম হাতে নিষিত করে মোক্‌ পাড়ার লোকে
নিষিত করে মোক দয়াল বাপো ভাই[৭] ।
তোর জইন্যে[৮] মোর গেরাম-বাদী থানাত্‌[৯] দেয় ইজাহারী
দারোগা বাবু হাতোত্‌ দেয় দড়ি ।
আজ তুই দোত্‌রা আখলিরে[১০]মান রূপা দিয়া মুই বান্দাবরে কান[১১]
নয়া গছের মানিকের মতন ॥
(শৈলেন্দ্রকুমার রায় । কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর)

॥ ২ ॥

ওরে ও কাটোল[১২] কাটের[১৩] দোতরা রে—
অলপো[১৪] বয়াসে[১৫] করলু[১৬] মোক্‌ জনমের বাউদিয়া ।
যেদিন দোত্‌রা হাত্‌ত[১৭] নেই[১৮] নিষিত[১৯] করে মোক বাপো মায়
নিষিত করে মোক পাড়ার নোক ॥
তুই দোত্‌রা মোর আখলিরে মান সোনা দিয়া মুই বান্দাবোরে[২০]কান
উপা[২১] দিয়া বান্দাবোরে নয়ান[২২]
সদায় মোন ন্যায়[২৩] তোক যতন করি
পুত্র বলিয়া তোক কোলাত তুলিয়া নেই ॥
(নিত্যানন্দ বর্মণ । দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)

শব্দার্থ : ১-স্ত্রীপুত্র ২-বন্ধু ৩-ভাবতে ভাবতে ৪-অল্প বয়সে ৫-আমাকে ৬-তোকে ৭-বাবা ও ভাই বা দাদা ৮-জন্যে ৯-থানাতে ১০-রাখলিরে ১১-দোতরার কান ১২-কাঠাল ১৩-কাঠের ১৪-অল্প ১৫-বয়সে ১৬-করলি ১৭-হাতে ১৮-নিই ১৯-নিষেধ ২০-বান্ধাবো ২১-রূপা ২২-নয়ন ২৩-ইচ্ছা হয় ।

২. কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচনা

॥ ১ ॥

ওকি তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে।
নইজ্জা[১] নাইরে তোরে[২] কালা, নইজ্জা নাইরে তোরে
ওরে কাপড় চুরি কইর্যা[৩] গাচোত্ ক্যানে থুলুরে[৪]।
হাতোত্ ধরোং[৫] তোরে কালা, পাওবা[৬] ধরোং তোর
গচের কাপড় পাড়িয়া দে তুই যাং[৭] এলা[৮] ঘরোত্ রে ॥
এ্যাকে তো শীতের দিন, তাতে আছোং জলে
এ্যাত কষ্ট দেকিয়া[৯] কি তোর দয়া নাই[১০] হয় মনেরে।
দেরী ক্যানে করিস কালা মানষি[১১] বুজি[১২] আইসে
এত রঙ্গ দেকিয়া কি তোর আশ না মিটেরে ॥
হাতের বাঁশী ফেলিয়া কালা কাপড় পাড়ি দে
ডাঙ্গায় উঠি কাপড় পিন্দি[১৩] যাং এলা ঘরোত রে[১৪] ॥

(অজন্তা রায়। শালবাড়ী, জলপাইগুড়ি)

॥ ২ ॥

ও মা জননী বিদায় দ্যাও মা যামোঁ বৈদ্যাশে[১৫]।
ন্যাও[১৬] মা তোমার সিঙ্গাবেণু, বিদায় দ্যাও মা রামকানু
জনমে জনমে আর না হইবে দেখা ॥
বলাই দাদা আখোয়াল[১৭] বসিয়া করে ঠাকুরাল[১৮]
আমায় দ্যায় মা ধেনু চরাইবারে।
যার ক্ষেতে যায় মোর ধেনু, কাড়িয়া লয় মা সিঙ্গাবেণু
ছাওয়াল[১৯] বলি না মারে পরাণে ॥
যবুনা[২০] পার হইয়া যামো[২১], পরার[২২] মাকে মা বলিম্[২৩]
যে খোয়াইবে[২৪] আদর করিয়া ॥

(রেকর্ড : ধীরেণ সরকার)

শব্দার্থ : ১-লজ্জা ২-তোর ৩-করে ৪-রাখলি ৫-ধরি ৬-পা ৭-যাই ৮-এখন ৯-দেখে ১০-হয় না ১১-মানুষ ১২-বুঝি ১৩-পরে ১৪-ঘরেতে ১৫-বিদেশে ১৬-লও ১৭-রাখাল ১৮-খবরদারি ১৯-ছেলেমানুষ ২০-যমুনা ২১-যাবো ২২-পরের ২৩-বলবো ২৪-খাওয়াবে।

॥ ৩ ॥

ওরে আগত[১] জনা চারেক, পাছোত্[২] জনা চারেক
সগ্গারে[৩] কানে কানে সনা।[৪]
সগ্গারে হাতে হাতে মোহন বাঁশীরে, রাদার[৫] বন্দুয়া কোনজনা ॥
যমুনার[৬] পাড়ে পাড়ে ধেনু লইয়া সদায়[৭] ঘোরে
সগ্গারে গালায়[৮] ফুলের মালা
সগ্গার হাতে হাতে সনার বলেয়ারে,[৯] রাদার বন্দুয়া কোনজনা ॥
ওরে শ্যাম কালা মোর বাজান বাঁশী
মনে করিম্ মুই দেকিয়া[১০] আসোং[১১]
ওরে মনে করিম মুই উঁড়িয়া যাম্, বন্দুয়াক দেকিয়া আসি ॥

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

৩. চৈতন্যলীলা অবলম্বনে রচনা

॥ ১ ॥

ও পাণ কান্দেরে—
কলিযুগের ওরে ভাব দেকিয়া রে।
না যান বাচা[১২] মোর সন্ন্যাসী হয়্যা[১৩] রে ॥
কে তোরে দিয়াচে গালি ওরে ক্যান ছাড়েন বাচা ঘরবাড়ী
ওরে ঘরে অইলো[১৪]বাচা বিষ্ণুপিয়া[১৫]ওরে তাক্ দেকিয়া বান্দো হিয়া
ও পাণ কান্দেরে। না যান বাচা মোর সন্ন্যাসী হয়্যা রে ॥

(নারায়ণ রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

॥ ২ ॥

ও মা জননী—।
সেইদিন হাতে[১৬] মোন মোর উড়াং বাইরং[১৭] করে রে।
কোথাকার কোন সন্ন্যাসী আইলো কন্নে[১৮] কিবা মন্ত্র দিল
ওরে আউলিয়া[১৯] মাথার চুলি[২০], ঘাড়ে নিবো মা ভিক্কার ঝুলি
ওরে চলিয়া যামো[২১] মদু[২২] সঙ্গে সঙ্গে গো মা ॥

শব্দার্থ: ১-আগে আগে ২-পিছনে ৩-সকলের ৪-সোনা ৫-রাধার ৬-যমুনা ৭-সর্বদা ৮-গলায় ৯-বলয় বা বালা ১০-দেখিয়া ১১-আসি ১২-বাছারে ১৩-হয়ে ১৪-রইলো ১৫-বিষ্ণুপ্রিয়া ১৬-হতে ১৭-উড়ু উড়ু করে ১৮-কানে ১৯-এলোমেলো ২০-চুল ২১-যাবো ২২-মধু।

ওরে খমক খঞ্জনী হাতে জনা চারেক বৈরাগীর সাতে[১]
ওরে চলিয়া যামো বোজের[২] কুঞ্জে কুঞ্জে গো মা ॥

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

৪. প্রেম নিবেদন

ক. নারী পুরুষকে ॥ ১ ॥

পাণ[৩] কান্দে মোর মৈষাল বন্দুরে[৪] —।
মৈষ[৫] চরান মৈষাল বন্দু ঘাটের উজানে
(ওরে) বাঙর ভৈষের ঘণ্টির বাইজে[৬]
মোন মোর উড়াং বাইরং[৭] করে রে ।।
মৈষ রাখ মৈষাল বন্দু বাড়ীর বগলত্[৮] রে
মুই নারীটা দেখা দিম্[৯] সকালে বৈকালে রে ।
ভার বান্দেন ভারাটি বান্দেন[১০] মৈষাল ছাড়ি আপন ময়া[১১]
(ওরে) আজি কেনে দেখোং[১২] মৈষাল মোক ছাড়িয়া যাইবার কায়া[১৩]
তোমরা যাইমেন[১৪] দূর দ্যাশে আমার হইবে কি
দিনে-আইতে[১৫] ও'রে মৈষাল কান্দি কান্দি মরি রে ॥

(কেশব বর্মণ। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ২ ॥

পাণ কান্দে মৈষাল বন্দুরে— ।
আমার বাড়ী যাইও মৈষাল, অইনা বরাবর
ডালিমের তলোত্[১৬] বাড়ী আমার দক্ষিণ-দুয়ারী[১৭]ঘর ।
আমার বাড়ী যাইও মৈষাল, বইসুতে দিমোঁ[১৮] মোড়া
জল খাওয়ার দিমোঁ তোমার শালি ধানের চিড়া ।
মৈষ চরাইতে যানরে মৈষাল অরণো[১৯] জোঙ্গলে[২০]
অরণো মৈষে খাইবে ধান বান্দিয়া[২১] মাইরবে[২২] তোরে ।
মৈষ আকো[২৩] অইনা মৈষাল অইনা মৈষ বাতানে[২৪]
তোমাক্ দ্যাক্তে[২৫] আইলাম পানি নিবার ছলেরে ।।

শব্দার্থ ঃ ১-সঙ্গে ২-ব্রজের ৩-প্রাণ ৪-বন্ধু ৫-মোষ ৬-বাজনায় ৭-উড়ু উড়ু করে ৮-নিকটে ৯-দেবো ১০-পোটলা পুটলি গোছান ১১-নিজের মায়া ১২-দেখি ১৩-ইচ্ছা ১৪-যাবেন ১৫-দিনে রাতে ১৬-তলায় ১৭-দক্ষিণ-মুখী ১৮-দেবো ১৯-অরণ্যে ২০-জঙ্গলে ২১-বেঁধে ২২-মারবে ২৩-রাখো ২৪-বাথানে ২৫-দেখতে ।

মৈষ চরাইতে যান রে মৈষাল, হাতে নিয়া ব্যানা[১]
তোর পেঁদোনে[২] গুটুকি ধুতি[৩], মোর পেঁদোনে ত্যানা রে।
তোর মৈষালক দুরগত[৪] দ্যাকিয়া মৈষাল আইগিয়া[৫] দিলো রে ছাতি
আশ-পড়শী গালি দিল, মৈষাল ভাতারি রে ॥
ওপাড়ে ন্যাপরা ঘাস মৈষাল, মৈষে না খায় ঘিনে[৬]
আলো চাউলের ন্যাটকা ভাত[৭], চেংড়ি ময়ার গুণে।
তোর মৈষালক দুরগত দ্যাকি মৈষাল গামছা দিলংরে আনি
বাপো মায়ে দিচে[৮] গালি বলি কলঙ্কিনী রে ॥
তুমি যদি যাওরে মৈষাল, কাইন্দবে[৯] আমার হিয়া
ঘাড়ের গামছা দিয়া যাও, থাকিম[১০] বুকে লয়্যারে ॥

(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী. । পৃঃ ৮৮-৮৯

॥ ৩ ॥

যাইও যাইও কালা আগুনেরো ছলে—।
ও শ্যাম কালিয়ারে ॥
তোর কালার উজানে[১১] বাড়ী, মুণ্ডি নারী চিটুল[১২] আড়িরে[১৩]
তোর কালার বাবরীরে চুল, মোরো যৈবন হুলুস্থুলু[১৪] রে
তোর কালার মুকেরে হাসি[১৫], মোরো নারীর দাঁতে মিশি
তোর কালার জোড় ভুরু, মোরো নারীর কমোর[১৬] সরু রে ॥
তোর কালার সেঁওলাই ধুতি[১৭], মোরো নারীর হাতে মুটিরে[১৮]
তুই কালা য্যামন[১৯] দান্তাল[২০] হাতী, মুণ্ডিও[২১] নারী ভরযুবতী রে
যাইও যাইও কালা, আগুনেরো ছলে রে ॥

(নীহার বড়ুয়া : গৌরীপুর)

শব্দার্থ : ১-একরকম বাদ্যযন্ত্র ২-পরনে ৩-গিঁট দেওয়া খাটোকাপড় ৪-দুর্গতি ৫-এগিয়ে ৬-ঘৃণায় ৭-নরম ভাত ৮ দিয়েছে-৯কান্দবে ১০-থাকবো ১১-উঁচু জায়গায় ১২-বাল ১৩-বিধবা ১৪-উন্দাম ১৫-মুখে হাসি ১৬-কোমর (কটিদেশ) ১৭-বাহারী ধুতি ১৮-নকশাকরা বাউটি বা বালা ১৯-যেমন ২০-দাঁতাল (পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হাতী) ২১-আমিও।

॥ ৪ ॥

হি দিয়া[১] না যান মৈষালরে, হুদিয়া[২] না যান্ মৈষালরে
মোর নারীর দুয়ার দিয়া যান।
হু পাড়ে সিনান করে গোয়ালেরো নারী, এ পাড়ে মদ্যম[৩] আচে[৪] চায়া[৫]
হু দিয়া না যান্ মৈষালরে, মোর নারীর দুয়ার দিয়া যান ॥
ঢালুয়া খোপাত্[৬] করি, তোক্ মুই করিম্ পার
পার হইলে দিমোঁ[৭] জাতিকুল।
ও মোর পাণের মৈষাল রে—
না জানোঁ[৮] মুই সাঁতার, না জানোঁ মুই পহরিবার[৯]
না জানোঁ হে ভুরা বাইবার[১০] ॥
ঢালুয়া খোঁপাত্ করি তোক্ মুই করিম্ রে পার ॥

(সুবচনী রায়। বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর)

॥ ৫ ॥

আরে ও সলঙ্গা নায়ের মাজি[১১]—।
কোনদিন ভাটাইবেন[১২] নৌকা আমরাও যেন জানি মাজিরে।
আমার বাড়ী যান্‌রে মাজি হস্তে লইয়া দড়ি
ওকি ওরে ছাগোল কিনিবার আশে যান্ আমার বাড়ী
আশা ছিল সঙ্গে যামোঁ মাও হইল্‌রে বৈরী
(ওকি) ওরে এমন নিদারুণ পিতা হস্তে দিল দড়িরে ॥
আমার বাড়ী যাইবার ঘাটা পন্থ বরাবরি[১৩]
আমগচ আর যাম ফল ওইডা আমার বাড়ীরে।

(নারায়ণ রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

॥ ৬ ॥

আরে ওহো কালা রে—।
তুই ছাড়িয়া না যাইস্‌রে ও মোর বুকে শ্যাল[১৪] দিয়া
হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে (আহারে) কাণ্ডিখনী[১৫] গচের গুয়া[১৬] ॥
চক্‌বাজারের বগলেরে বগলে গোয়ালের বসতি
(ওরে) দৈ ও দুদ খাইবার আশে বাড়াইলোং পীরিতি।

শব্দার্থঃ ১-এদিক ২-ওদিক ৩-মেজো ৪-আছে ৫-চেয়ে ৬-বিশাল খোঁপায় ৭-দেবো ৮-জানিনা ৯-পার হতে ১০-ভেলা বাইতে ১১-মাঝি ১২-ভাসাবেন ১৩-সোজা পথ বরাবর ১৪-শেল ১৫/১৬ সুপারী গাছের মত লম্বা ও সরু কোমর।

চক্‌বাজারের বগলেরে বগলে বানিয়ার[১] বসতি
(ওকি) সোনা পিন্দিবার আশে বাড়াইলোং পীরিতি ॥
তোরষা নদীর পাড়েরে পাড়ে মাউতে[২] চরায় হাতী
তোর কালার সুরতি[৩] দ্যাকিয়া আমরা দিলোং জাতি
(ওরে) গচের বসন্তোকালে ফুলবা ধরে ঝোপা
(ওরে) নারীর বসন্তোকালে তুলিয়া বান্দে খোপা ॥
আরে ওহো কালারে—
তুই ছাড়িয়া না যাইস্‌রে ও মোর বুকে শ্যাল দিয়া।

(নীহার বড়ুয়া। গৌরীপুর)

॥ ৭ ॥

ওকি কানাই রে—।
কোন সাইতে[৪] বাড়াইলাম পাও[৫] খ্যাওয়া ঘাটোত[৬] কানাই নাই নাও[৭]
খ্যায়োনিক[৮] খাইচে কোন অরোণের[৯] বাগে রে[১০] ॥
সোন্দর কানাই রে—।
পুবালি পচ্চিয়া বাও জোড় বাদাম কানাই তুল্যা দ্যাও
গহীন গাঙে ধরেয়া দ্যাও নাও রে।
আঁটো নদীর[১১] খরো ধার[১২] মইদে মইদে[১৩] কানাই বালুচর
আপন হাতে ধরিও নাওয়ের হাল রে ॥
কোদালে কাটিয়া মাটি কলা গাড়লাম সারি সারিরে
বাইগ্‌চায় ঘেরিয়া নিইল বাড়ীরে ॥
আইস্‌পার[১৪] কইলে পাণোনাত্‌[১৫] তাই কাটিরে কালার পাত
দোনো ঝনে[১৬] বসিয়া খামো ভাতো রে[১৭]
আইসপে বইলে পাণশুয়া[১৮] তাই পাইড়ে[১৯] গচের গুয়া
দোনো ঝনে কাটিয়া খামো গুয়ারে ॥

(লোকসাহিত্য: ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী. । পৃ: ২১)

শব্দার্থঃ ১-ব্যবসায়ী ২-মাহুতে ৩-সুন্দর রূপ ৪-সময়ে ৫-পা ৬-পারের ঘাটে ৭-নৌকা ৮-পারানি ৯-অরণ্যের ১০-বাঘ ১১-আবর্তপূর্ণ (ঘূর্ণীপাক-পূর্ণ) ১২-খরস্রোতা ১৩-মধ্যে মধ্যে ১৪-আসতে ১৫-প্রাণনাথ ১৬-দুজনে ১৭-ভাত ১৮-প্রাণের শুকপাখী ১৯-পেড়ে।

॥ ৮ ॥

রায়ডাক নদীর ঘাটোত্ বসি দোত্রা বাজাও আপন খুশী।
দোত্রায় মোক করিচেরে[১] ঘর ছাড়া।
তোর দোত্রার মৈষালী ডাঙ্গে পাড়ার চেংড়ীর মনডা ভাঙ্গে
বগলত্ ডাকায়[২] চক্ষুতে ইশিরা[৩] ॥
ও মোর মৈষাল বন্দুরে না বাজান তমান[৪] খুটারে[৫] দোত্রা
নারীর মোন মোর করলুরে ঘর ছাড়া।
ওরে অ্যাকেতো সুতারো বাইজন[৬] কিনা সুরে বাজে
তোর দোত্রার বাইজন শুনি মোন্ অয়না মোর ঘরে রে ॥

(আয়েশা সরকার। কোচবিহার)

॥ ৯ ॥

ওরে বান্দিনু[৭] বাড়ী গুয়া উনু[৮] সারি সারি
গুয়ার বাগুচায়[৯] ঘিরিয়া লইলে বাড়ী রে ॥
আইস্পে[১০] মোর পাণের শুয়া তায় পাড়াইম্ গচের গুয়া
মুই নারীটা কাটিয়া খাইম্ তাক্।
আইস্পে মোর পাণের নাত[১১] তায় কাটাইম্ কালার পাত[১২]
মুই নারীটা বসিয়া খাইম্ বোলভাত রে।
ওরে মহাকালের ফল য্যামোন মোর নারীর যৈবন ত্যামোন
খায়া[১৩] দ্যাকেন কালা যৈবন ক্যামন মিঠা রে ॥

(ময়না রায়। হলদিবাড়ী, জলপাইগুড়ি)

খ. পুরুষ নারীকে

॥ ১ ॥

অন্দ মন্দ[১৪] না কইস কইন্যা[১৫] রে
কইন্যা ভাইগ্যোর[১৬] বড়য় দোষ।
মুই হলুঁ ধনীর ছাইলা[১৭], হনু পরার পোষ রে।
কি নারে আছিল[১৮] ভাইগ্যে চরাণ অইন্যের[১৯] মৈষ রে ॥

শব্দার্থঃ ১-করেছে ২-কাছে ডাকে ৩-চোখে ঈশারা করে ৪-তোমার ৫-সর্বনাশা ৬-বাজনা ৭-তৈরী করলাম ৮-রোপণ করলাম ৯-বাগিচায় ১০-আসবে ১১-প্রাণনাথ ১২-কলাগাছের পাতা ১৩-খেয়ে বা আস্বাদন করে ১৪-ভালমন্দ ১৫-কন্যা ১৬-ভাগ্যের ১৭-ছেলে ১৮-ছিল ১৯-অন্যের।

ভাদর আশ্বিন মাসে, ঔদের[১] বড় জ্বালা
দারুণ পেমে জ্বলেয়া যেমন ফ্যালায় নদীর বালা রে।
কায়ার সইতে[২] যেমন ছায়াছপির[৩] গতি
তুমি হন মোর সাজো জায়া মুই তোমার পতি ॥
(রেকর্ড : কেদার চক্রবর্তী)

॥ ২ ॥

ওরে আইসপার[৪] কইলেন কড়াল[৫] মত
তোমার বাড়ীত মানষি[৬] যত, বাইরা খানকাত্[৭] জাগায়[৮] না ধরে
বাইরা খানকাত মানুষ দ্যাকি[৯]দৌঁড়িয়া[১০] গেনু[১১]কাইনচা[১২]বাড়ীত্
ভাতের ফ্যান[১৩] মোর গায় দিলেন ঢালিয়া।
বিসয়াস[১৪] যদি না হয় তোর, পিরাণ[১৫] খুলি দ্যাকেক[১৬] মোর
সারা গায় মোর ফোসা[১৭] পরিচে[১৮] ॥
(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী, ১৩৮২। পৃঃ ৩৫)

॥ ৩ ॥

ও তোর মোন্ ক্যানে আন্দার কইন্যা হে
কইন্যা ঝুরে দুই নয়ান[১৯]।
আইস কইন্যা তোমার সঙ্গে করি আলাপন।
কোনবা দ্যাশে ঘর কইন্যা, কোন বা দ্যাশে বাড়ী
তোমার সঙ্গে যাইম্[২০] কইন্যা হইবাম্[২১] দেশান্তরী।
বাড়ী ঘর মোর ভালয়[২২] নাগে না ॥
ধিকো ধিকো[২৩] তোর বাপো মায়, ধিকো তাদের হিয়া
এতবড় হইচেন কইন্যা, তাও না দেয় বিয়া।
হিন্দের[২৪] জ্বালা কেউ তো বুজে না[২৫] ॥

—

শব্দার্থঃ ১-রোদের ২-সঙ্গে ৩-চলচ্চিত্র ৪-আসতে ৫-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৬-মানুষ ৭-ঘরের বারান্দায় ৮-জায়গা (স্থান সংকুলান হয়নি) ৯-দেখে ১০-দৌড়ে ১১-গেলাম ১২-ঘরের পিছন দিকে ১৩-ভাতের মাড় ১৪-বিশ্বাস ১৫-জামা ১৬-দেখে নাও ১৭-ফোস্কা ১৮-পড়েছে ১৯-দু চোখে জল পড়ে ২০-যাবো ২১-হবো ২২-ভালো ২৩-ধিক ধিক ২৪-হৃদয়ের ২৫-বোঝে না।

যেদিনা[১] দেখিনু কইন্যা ঐনা নদীর ঘাটে
সেদিন থাকি[২] অবুজ[৩] মোন মোর মানা নাই মানে[৪]।
কাম কাজ মোর ভালয় নাগে না।
তোমার মত সোন্দরী[৫] কইন্যা আর তো দেখি নাই
হামার গালায় দ্যান যে মালা সঙ্গে চলি যাই
কতয় সুকে[৬] রইবু[৭] দুইঝনা[৮]।
তুমি বিনা পাণ তো বাঁচেনা ॥

(পাণিয়া দাস। কোচবিহার)

গ. পারম্পরিক

॥ ১ ॥

আরে তোমরা গেইলে[৯] কি আসিবেন মোর মাহুত বন্দুরে।
হস্তীরে নড়ান হস্তীরে চরান, হস্তীর গালায় দড়ি
(ওরে) সইত্যো[১০] করিয়া কনরে[১১] মাহুত, কোনবা দ্যাশে বাড়ীরে ॥
হস্তীরে নড়াওঁ, হস্তীরে চরাওঁ হস্তীর পায়ে বেড়ি
(ওরে) সইত্যো করিয়া কইলাম[১২] কইন্যা কুচবিহারে বাড়ীরে ॥
হস্তীরে নড়ান হস্তীরে চরান হস্তীর গালায় দড়ি
ওরে সইত্যো করিয়া কনরে মাহুত, ঘরে কয়ঝনা নারীরে ॥
হস্তীরে নড়াওঁ হস্তীরে চরাওঁ চম্পা নদীর পাড়ে
ওরে সইত্যো করিয়া কইলাম কইন্যা বিয়াও[১৩] না করিরে ॥

(প্রতিমা বড়ুয়া ও ভূপেন হাজারিকা। রেকর্ড নং এন ৭৬০৮৮)

॥ ২ ॥

এ পাড়ে গাও ধোয় গোয়ালেথ নারী
ও পাড়ে বৈদ [১৪] আচে[১৫] চায়া[১৬]।
না পাবু[১৭] না খাবুরে[১৮] বৈদ না পুরিবে তোর আশা
ওরে বৈদ্য মিচায়[১৯] থাকিস তুই চায়া ॥

শব্দার্থ ঃ ১-যেদিন ২-থেকে ৩-অবুঝ ৪-মানা মানে না ৫-সুন্দরী ৬-সুখে ৭-থাকবো ৮-দুজনে ৯-গেলে ১০ সত্য ১১-বলুন ১২-বললাম ১৩-বিয়ে ১৪-বৈদ্য ১৫-আছে ১৬-চেয়ে ১৭-পাবে ১৭-খাবে ১৮-মিথ্যাই।

কি করে তোর উপে[১] হে কইন্যা কি করে তোর ক্যাশে[২]।
ওহে কইন্যা পাগল করলে[৩] মোক্ তোর কালো মুখের[৪] হাসিরে ॥
কালো নদীত্ কুম্ভীরের ভয়, মানুষ গরু ধরিয়া খায়
ওহে কইন্যা, এই দরিয়া ক্যামনে হমো পার রে ॥
(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাংলা একাডেমী. । পৃঃ ১৮)

॥ ৩ ॥

ঐ গদাধরের পাড়ে পাড়ে রে ও মোর মাউতে[৫] চরায় হাতী
কি ময়া[৬] নাগাইলেন[৭] মাউতরে ও তোর গালায়[৮] অসের[৯] কাটি[১০]।
ওরে উচা করি বান্দেন ছাপোর[১১] রে ও মুঞি আইস্তে যাইতে দেখিম্
ওরে উচা করি বান্দেন মাচা রে[১২] মুঞি জল ভরিতে দেখিম্ ॥
দুদো[১৩] খোয়াইলেন[১৪] দইও খোয়াইলেন রে মাউত,
না খোয়াইলেন মাটা[১৫]
এইবার হাতে ছুটি গেইল্ কি তোর
আসা যাওয়ার ঘাটা[১৬] ॥
না কান্দেন না ভাবেন কইন্যা হে কইন্যা না ভাঙেন অসের গালা
এইবার যদি ঘুরিয়া আইসোং[১৭] রে তোর সোনায় বান্দাইম্ গালা
এইবার যদি বাউড়ী[১৮] আইসোং রে ॥
(নীহার বড়ুয়া। গৌরীপুর)

॥ ৪ ॥

ও কইন্যা হস্তে কদম্বের ফুল তিন কইন্যা জলোক্[১৯] যায়
কার বা ক্যামন গুণ কইন্যা হে।
আগের জনায়[২০] যেমন ত্যামন, ও কইন্যা পাচের[২১] জনায় মন্দ
মধ্যে জনাকার কেশী খাটো[২২] আগের জনায় ভাল কইন্যা হে ॥

শব্দার্থ : ১-রূপে ২-কেশে ৩-করলো ৪-মুখের ৫-মাহুতে ৬-মায়া ৭-লাগালেন ৮-গলায় ৯-রসের ১০-মালা ১১-একচালা ঘর ১২-বাঁশের তৈরী বিশ্রামের স্থান ১৩-দুধ ১৪-খাওয়ালেন ১৫-দুধ থেকে তোলা মাখন ১৬-রাস্তা ১৭-আসলে ১৮-বাড়ী ১৯-জলে ২০-জনে ২১-পিছনের ২২-খাটো চুল।

কোনবা দ্যাশে ঘর বন্দুরে, বন্দু কিসের ব্যাপার[১] কর
সইত্যো করিয়া কও বন্দু বিয়াও নাই করিচোং[২] বন্দু হে।
উজান দ্যাশে ঘর কইন্যা হে ও কইন্যা ভাটিত্[৩] ব্যাপার করি
সইত্যো করিয়া কইলাম কইন্যা বিয়াও না করি কইন্যা হে।
বলদ নাড়াও[৪] বলদ চরাও[৪] ওরে কইন্যা বলদোক্[৪] মারং কোড়া
বলদের পিটে[৫] তুলিয়া নিচোং সারিন্দা দোত্রা কইন্যা হে॥
তালের মত গুয়া[৬] বন্দু হে, বন্দু কলার পাতের[৭] পান
বাটা ভরা সুপারী আচে বন্দু, বন্দু আমার বাড়ী যান।
কোন দুয়াইর্যা ঘর কইন্যা কুনদি[৮] তোমার ঘাটা
সইত্যো করিয়া কওহে কইন্যা কোনটে হমো[৯] দেকা[১০] কইন্যা হে।
পুব-দুয়াইর্যা[১১] ঘর বন্দু হে ও বন্দু পচ্চিম[১২] দিয়া ঘাটা
সইত্যো করিয়া কইলাম কাথা[১৩] বাড়ীত হমো দেকা বন্দু হে॥

[আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড নং এন

॥ ৫ ॥

ওত্তোরে[১৪]কল্লে[১৫]ম্যাঘ ম্যাঘালি[১৬], পচ্চিমে চিল্কিয়া[১৭]উটিল্[১৮]দেয়া[১৯]
পার করো হে নবীন নাইয়া, আন্দার করি আইলো দেয়া॥
কালোত্ কালো হে, কালোত্ কুকিলা[২০]
ফেছকায়[২১] ধরে নানান ভ্যাস[২২]
তাহার চাইতে অদিক কালো কইন্যা তোমার মাতার[২৩] ক্যাশ।
নালোত[২৪] নালো হে, নালোত্ ওড়া ফুল
তাহার চাইতে অদিক নালো কইন্যা তোমার সিতার[২৫]সেন্দুর।
ধলোত্ ধলো হে ধলোত্ গাইয়ের দুদ[২৬]
তাহার চাইতে অদিক ধলো কইন্যা তোমার চান্দ মুক॥
ও পার করো হে নবীন নাইয়া॥

[লোকসাহিত্য ; ১২ খণ্ড। বাংলা একাডেমী, পৃঃ ৩১]

শব্দার্থঃ ১-ব্যবসা ২-করি নাই ৩-নীচু অঞ্চলে ৪-বলদের ৫-পিঠে ৬-সুপারী ৭-কলাপাতার মত ৮-কোনদিকে ৯-হবে ১০-দেখা ১১-পূর্ব-মুখী ১২-পশ্চিম ১৩-কথা ১৪-উত্তরে ১৫-করেছে ১৬-মেঘে ঢেকে গেছে ১৭-চমকে ১৮-উঠেছে ১৯-বৃষ্টি ২০-কোকিল ২১-একধরনের নানা বর্ণের পাখী ২২-বেশ ২৩-মাথার ২৪-লাল ২৫-সিঁথির ২৬-দুধ।

॥ ৬ ॥

ও নাথ কইন্যা ও জল ভররে সুন্দর কইন্যা জলে দিয়া ঢেউ
একলা ঘাটে আইসাছো[১] কইন্যা সঙ্গে নাইকো কেউ।
তুমি তো আজার[২] ছেইলা[৩] বিভাও[৪] করিতে পার
পরার রমণী দেইখ্যা[৫] কেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মর।
আমি তো আজার ছেইলা বিভাও করিতে পারি
তোমার মত সুন্দর কইন্যা মিলাইতে নারি।
আমার মত সুন্দর কইন্যা যদি মিলাইতে চাও
গালায় কলসী বাইন্দা জলে ঝম্প দেও।
কোণ্ঠে[৬] পামোঁ কলসি কইন্যা কোণ্ঠে পামোঁ দড়ি
তুমি হইলে যমুনার[৭] জল আমি ডুব্যা মরি ॥

(বাঙলার লোকসাহিত্য ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৭৩)

॥ ৭ ॥

ও মৈষালরে ও মৈষাল —।
হাতোত দেখোঁরে মৈষাল নালো রে নাটি[৮]
কান্ধে[৯] দেখোঁরে মৈষাল আঙ্গিয়া[১০] ছাতি
মাথাত্ দেখোঁরে মৈষাল মনিরাজ পাগুড়ী[১১] রে মৈষাল ॥
ও কইন্যারে ও কইন্যা—।
তোর কইন্যার পীরিতির আশে,[১২] বাপো ভাই ছাড়িলাম দ্যাশে
তোরময়া মুই ক্যামনে পাসরিম্[১৩] ॥
ওকি মৈষাল রে ও মৈষাল—।
এখে[১৪] মৈষাল তোর পরম রে দুখ[১৫] এলুয়া কাশিয়া[১৬] কাটিবে রে বুক
না করিস তুই বাঙ্গর ভৈষের[১৭] চাখিরি রে ॥

(উত্তম দাশ। দিনহাটা, কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-এসেছো ২-রাজার ৩-ছেলে ৪-বিয়ে ৫-দেখে ৬-কোথায়। ৭-যমুনা ৮-লাঠি ৯-কাঁধে ১০-রঙিন ১১-পাগড়ী ১২-প্রেমের আশায় ১৩-এড়াবো ১৪-এযে দেখি ১৫-খুবই দুঃখ ১৬-কাশবনের ঘাস ১৭-মোষের।

॥ ৮ ॥

যামো যামো যামো কইন্যা হে ও কইন্যা যামো আমি চলি
যাইবার সময় কওহে তুমি মনের কাথা খুলি কইন্যা হে।
ও মুই কান্দিনু কাটিনু তুই বন্দুয়ার বাদে রে
ও মোক ছাড়িয়া না যান রে ॥
দিনু কিনা দিনু মোর পরাণ তোক্ বন্দুয়ার বাদে রে ॥
ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো কইন্যা হে কইন্যা মিছাই তোমারময়া
দিনের ব্যালা ভাটিত গেইলে দিনোত পড়ে ছেয়া কইন্যা হে।
ও মুই মালা গাথিনু তোক বন্দুয়ার বাদে রে
ও মোক ছাড়িয়া না যান রে ॥
পীরিতির সুতাত[১] এ মালা গাথিচোং বদল করিয়া নাও ওরে
মালা ফিরিয়া[২] না দ্যান রে।
বদল বদল করেন কইন্যা হে কইন্যা বদলের নাই দায়
ফুলের যৈবন শুকিয়া গেইলে ভোমরা উড়ি যায় কইন্যা হে।
ও মুই বুঝিনুং বুঝিনুং তুই বন্দুয়ার মনডারে
ও মোক ছাড়িয়া যাইমেন রে।
কনু কিনা কনুরে বন্দু সঙ্গে করিয়া ন্যাও মোরে ॥
দ্যাকো দ্যাকো দ্যাকো কইন্যাহে ও কইন্যা আমার ময়া ছাড়ো
বনের পংখী বনে গেইলে আইসে নাকি আরও কইন্যা হে ॥

(রেকর্ড : আব্বাসউদ্দিন)

৫. বিরহ জ্বালা

ক. নারীর বিরহ

॥ ১ ॥

ওকি ও বন্দু কাজল ভোমরা রে—।
কোনদিন আসিবেন বন্দু, কয়া[৩] যাও কয়া যাও কয়া যাও রে।
যদি বন্দু যাবার চাও, ঘাড়ের গামছা থুইয়া[৪] যাও রে ॥
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে
মোর বন্দুর ময়া তেমন রে
ওকি ও কাজল ভোমরা রে ॥

(আব্বাসউদ্দিন। রেকর্ড নং এন ১৭০০৬)

শব্দার্থ: ১-প্রেমের সুতায় ২-ফিরায়ে ৩-বলে ৪-রেখে।

॥ ২ ॥

ওকি ও মোর দান্তাল[১] হাতীর মাউত্[২] রে।

যেদিন মাউত্ শিকার যায় নারীর মোন মোর ঝুরিয়া অয়[৩] রে।

আকাশেতে নাইরে চন্দ্রো[৪] কি করে তার তারা

যেবা নারীর সোয়ামী নাই, তার দিনে আদিয়ারা[৫] ।।

পুষ্করণীতে[৬] নাইরে পানি, নৌকা ক্যামনে চলে

যেবা নারীর পুরুষ নাইরে তার উপে[৭] কি কাম করে ।।

ওকি ও মোর মাকনাহাতীর[৮] মাউত রে—।

যেদিন মাউত্ উজান যায়

নারীর মোন মোর ঝুরিয়া অয় রে ॥

(শ্রাবণী রায়। বন্ধুনগর, জলপাইগুড়ি)

॥ ৩ ॥

ওকি ধিকো ধিকো ধিকো মৈষাল ও—

ও মৈষাল ধিকো তোমার হিয়া।

কুন[৯] পরাণে যাইমেন[১০] মৈষাল

হামাক্[১১] ছাড়িয়া মৈষাল ও—।।

হাটবা যাইছেন বাজার যাইছেন

কিনিয়া আইন্‌বেন[১২] কি।

ছাওয়াল[১৩] বাপের নাল ফতুয়া

হামার দাঁতের মিশি মৈষাল ও ।।

হায়রে তোমরানি যাইমেন চাখিরিতে মৈষাল

মোর ঝুরিছে হিয়া মৈষাল—ও ।।

(চিত্তরঞ্জন দেব—বাংলার পল্লীগীতি। । পৃঃ ৪৭২-৭৩)

॥ ৪ ॥

ওকি পাণ-ধন[১৪] ক্যামন কইর‍্যা[১৫] বাইচ্‌বেরে[১৬] মোর জীবন।

মাসের পরে মাসরে গেইল[১৭] আইল বছর ঘুইর‍্যা[১৮]

কৈ রৈলা[১৯] মোর পাণের পতি আইলানা[২০] আর ফির‍্যা[২১]।

শব্দার্থঃ ১-দাঁতাল ২-মাহুত ৩-রয় ৪-চাঁদ ৫-আঁধিয়ারা ৬-পুকুর ৭-রূপে ৮-যে হাতীর দাঁত ওঠেনি ৯-কোন ১০-যাবেন ১১-আমাকে ১২-আনবেন ১৩-ছেলের ১৪-প্রাণপতি ১৫-করে ১৬-বাঁচবে ১৭-গেল ১৮-ঘুরে ১৯-রয়েছো ২০-আসলেনা ২১-ফিরে।

গচের[১] শোবা[২] ফলরে যেমন চিরাল[৩] নাগলে[৪] জল
আমার শোবা তুমি রে বন্দু নিদানের[৫] সম্বল।
মউরের[৬] শোবা পচ্ছুরে[৭] যেমন গানের শোবা শোর[৮]
আমার শোবা তুমিরে বন্দু সিন্হার[৯] সেন্দুর ॥
নায়ের শোবা বৈঠারে বন্দু গাঙের[১০] শোবা কূল
নারীর শোবা পতিরে বন্দু অকূলের কূল।
ওকি পতিধন ক্যামন কইর‍্যা বাঁইচ্‌বেরে মোর জীবন ॥

(নবীন মোহান্ত। বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর)

॥ ৫ ॥

ও নাগর কানাই রে—।
বেলা গেইল্‌ সঞ্জে[১১] হইল্‌ ও কানাই
ওংসে জ্বলে মোমের বাতি।
না জানি মোর প্রাণোনাত্‌[১২] আইসবে কত আতি[১৩] ॥
ও নাগর কানাই রে—।
আত একফর[১৪] হইল কানাইরে বেড়ানে দিলা মন
আন্দিয়া[১৫] বাড়িয়া রনু[১৬] জাইগ্‌বো কতক্ষণ।
আত দুফর[১৭] হইল ও সে গচে ডাকে শুয়া[১৮]
গা তুইলে[১৯] খাও ব্যটার পান নারী কাটে গুয়া।
আত চারফর হইল্‌ কানাইরে কুকিল[২০] ছাড়ে ভাসা[২১]
আধিকার[২২] সনে পেম করিয়া না পুরিল্‌ আশা ॥

(শর্বরী রায়। কোচবিহার)

॥ ৬ ॥

ও মুই কার আশে থাকোং দয়াল রে
ও দয়াল বাপো ভাইয়ের দ্যাশে।
বাইষ্যা কাল গেইল কান্দি কান্দি।
ও দয়াল বন্দু মোর না আইসে ॥

শব্দার্থ : ১-গাছের ২-শোভা ৩-জল পেলে ক্ষিরাই বা শশা যেমন তরতাজা হয়ে ওঠে ৪-লাগলে ৫-শেষকালের ৬-ময়ূরের ৭-পাখা ৮-শেহরী ৯-সিঁথির ১০-নদীর ১১-সন্ধ্যে ১২-প্রাণনাথ ১৩-রাত্রি ১৪-একপ্রহর ১৫-রেঁধে ১৬-রইলাম ১৭-দ্বিপ্রহর ১৮-শুকপাখী ১৯-তুলে ২০-কোকিল ২১-বাসা ২২-রাধিকার।

আশিন[১] মাসে দুর্গাপুজারে আগোণ[২] মাসে আস[৩]
ফাগুন মাসে ডোলসোয়ারী[৪] চৈত্তিরু[৫] মাসে বাশ[৬] ।।
বাশ পুজাত্ ঐ জাগের[৭] গান রে ঐনা কসির[৮] বাড়ী
টানিয়া পিন্ধিতে[৯] ফাড়িল[১০] শাড়ী যৈবন হইল মোর আড়ি[১১] ।।
যৈবনের ঢলেরে বন্দু ভাসিয়া যায় মোর গাও
কতয়দিন হইল্ বাণিজে যাবার দ্যাশে ফিরান নাও ।।
(পিগু রায়। খুরলা, আসাম)

॥ ৭ ॥

হায় বিদি[১২] মোর এই ছিল কোপালে[১৩] ।
কোপালের দুক্ক[১৪] হায়রে কায়[১৫] খণ্ডাবার[১৬] পারে ।
যেমন বাইষ্যার[১৭] নদীত্ ভরিয়া ওটে[১৮] জল
ঐ মতো নারীর যৈবন করে টলোমল রে ।।
শিশুতে কইরচেন[১৯] বিয়াও ছাড়িয়া গেইলেন ঘরে
পাকিচে[২০] ডালিম্বের ফলরে[২১]'পারিয়া[২২]খাইবে পরে ।
তোমার অঙের[২৩]ফলরে খাইবে বাদুলে[২৪] চুষিয়া
বিদ্যাশে পড়িয়া অইলেন কারবা[২৫] নাগ্যা[২৬] পাইয়া ।।
ডালিম্বেরো ফল দেকিয়া চোরের পাকাপাকি[২৭]
আর কতয়কাল[২৮] রাখিমু ডালিম চোরক দিয়া ফাঁকি ।।
(মেধী রায়। খুরলা, আসাম)

॥ ৮ ॥

বাতানে না যান মৈষাল রে—।
ও মৈষাল বাঙোরে[২৯] হাসিবে রে, ও মৈষাল কাচোরে[৩০] হাসিবে রে
ষোলশো মৈষের বাতান মৈষাল রে
না যান না যান মৈষাল বাতানে রে ।।

শব্দার্থ : ১-আশ্বিন ২-অগ্রহায়ণ ৩-রাসপূর্ণিমা ৪-দোলপূর্ণিমা ৫-চৈত্র ৬-বাঁশ পূজা ৭-জাগের গান বা পালা গান ৮-ব্যক্তিবিশেষের নাম ৯-পড়তে ১০-ছিঁড়িল ১১-শত্রু ১২-বিধি ১ -কপালে ১৪-দুঃখ ১৫-কে ১৬-খণ্ডন করতে ১৭-বর্ষার ১৮-ওঠে ১৯-করেছেন ২০-পাক ধরেছে ২১-নারীর উন্নত স্তনের তুলনা ২২-পেড়ে ২৩-রঙিন বা পাকা ফল ২৪-বাদুড়ে ২৫-কার জন্যে ২৬-নাগাল ২৭-ইশারা ২৮-কতদিন ২৯-বুনো মোষের বাচ্চা ৩০-সংকর জাতীয় মোষ ।

তোরে কারণে[১] মৈষাল ভাত আন্দিয়া[২] থুইচোং[৩] রে
তোরে কারণে মৈষাল বিছিমা[৪]পাড়িছোং[৫]রে।
মৈষাল আসিবে বুলি[৬] দুয়ারে নাই দ্যাও' ঠাঙ্গা[৭] রে
ঘুরিয়া আইসোং বুলি[৮] মৈষাল গেইল মোর কুত্তি[৯] রে ।।
আল্যায়[১০]না দেখিনু মৈষালক গিন্দাহেলানী[১১] দিয়া
কাঁও বুজি মারিলে মৈষালক বিষের নাড়ু খোয়াইয়া[১২]।
ও মৈষাল অ্যালাও'[১৩] ঘুরিয়া আইসেক্[১৪] রে
ঐ বাতানে না যান মৈষাল রে ।।

(নীহার বড়ুয়া। গৌরীপুর, আসাম)

॥ ৯ ॥

বিদ্যাশে অইলে[১৫] সোনা বন্দুরে।
শুতিয়া[১৬] সপ্পনে[১৭] দেকি[১৮] বন্দুর কোলে শুতিয়া আচি
বিচিনা[১৯] হাসতেয়া[২০] দেকি বন্দু নাই মোর কোলে রে।
পন্তে[২১] দেকি মরার মাতা[২২] মোনে ওটে[২৩] বন্দুর কতা[২৪]
না জানোঁ সোনার বন্দু আচে কিবা হালে রে ।।

(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। পৃঃ ১০৫)

॥ ১০ ॥

যৈবনের ঢলেরে বন্দু ভাসিয়া যায় মোর গাও
কতয়দিন হইল বাণিজ্য যাবার দ্যাশে ফিরান নাও।
তোলা মাটির কলা য্যামোন, হল্‌ফল্‌ হল্‌ফল্‌ করে
ঐ মতো নারীর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে ।।
শাক তোলং মুঞি মুটি মুটি কোচর করোং ভারী
ঐ মতোই দারুণ যৈবন বাইরায় কাপড় ফাড়ি[২৫] ।।
য্যামোন বাইষ্যার[২৬] নদীত্ ভরিয়া ওটে জল
ঐ মতো নারীর যৈবন করে টলোমল।

শব্দার্থ : ১-জন্যে ২-বেঁধে ৩-রেখেছি ৪-বিছানা ৫-পেতেছি ৬-মনে করে ৭-দরজায় আগড় দিয়ে আটকানো ৮-বলে ৯-কোথায় ১০-এখন ১১-একপাশে হেলান দিয়ে ১২-খাইয়ে ১৩-এখন ১৪-আসুন ১৫-রইলে ১৬-শুয়ে ১৭-স্বপনে ১৮-দেখি ১৯-বিছানা ২০-হাতড়িয়ে ২১-পথে ২২-মাথা ২৩-ওঠে ২৪-কথা ২৫-কাপড় ছিঁড়ে ২৬-বর্ষার।

ধূ ধূ চরে কাশিয়ার[১] ফুল পুবাল হাওয়ায় ঢোলে[২]
মোর নারীর অন্তরডা হায় ঢোলে যৈবন কালে ॥
লোকে য্যামোন ময়না পোষে পিঞ্জিরায় ভরেয়া[৩]
ঐ-মতো নারীর যৈবন রাখিচোং[৪] বান্দিয়া ॥

(নীহার বড়ুয়া। গৌরীপুর)

॥ ১১ ॥

বাতান বাতান করেন মৈষাল ও—
কিও মৈষাল বাতান কইরচেন[৫] বাড়ী।
যুব্বা নারী ঘরে থুইয়া, কাও[৬] করে চাখিরি[৭] মৈষাল ও ॥
উজানে কইরচে ম্যাঘ ম্যাঘালি রে
কিও মৈষাল দখিন খাইলেক বানে
অ্যামোন ধনীর চাখিরি করেন, বিদায় না দেন ক্যানে। মৈষাল ও ॥
বাতান দ্যাকোং[৮] আউলা ঝাউলা রে[৯]
কিও মৈষাল বাতান ভরা গোবর
খান্ দান বাতানে থাকেন, বাড়ীর নাই তোর খপর[১০] রে ॥
অকারি চাউলের[১১]ভাত রে, কিও মৈষাল বক্‌না ভৈষের দুদ্[১২]
তুই মৈষাল বাতানে থাকিস আমার পোড়ে বুক মৈষাল ও ॥
খরালির[১৩] ছয়োমাস রইলেন মৈষাল রে কিও মৈষাল মৈষের বাতানে
বাইষ্যার ছয়োমাস থাকিয়া যান বাড়ীত্ আসিয়া রে ॥
ছোট্টকালে হইচে বিয়াও[১৪] রে মৈষাল, কিও মৈষাল বয়স ভাটি[১৫] গ্যালো
না হইলোং ছাওয়ার[১৬] মাও, মনে দুস্ক মোর অইলো[১৭] মৈষাল রে ॥
দুদো খাইলেন দইও খাইলেন রে কিও মৈষাল আরো খাইলেন মাটা[১৮]
ছয়োমাস থাকিয়া যান ও মৈষাল কোলাত বাজুক[১৯] ব্যাটা মৈষাল ও ॥
বাতান ছাড়েক বাতান ছাড়েক রে
কিও মৈষাল ঘুরিয়া আইসেক বাড়ী
গালার হার ব্যাচেয়া দিম্ মুঞি[২০]
ঐ চাখিরির কড়ি মৈষাল ও ॥

(নীহার বড়ুয়া। গৌরীপুর)

শব্দার্থ: ১-কাশফুল ২-দোলে ৩-খাঁচায় ভরে ৪-রেখেছি ৫-করেছেন ৬-কে ৭-চাকুরী ৮-দেখছি ৯-এলোমেলো ১০-খবর ১১-আকাঁড়া ১২-মোষের দুধ ১৩-খরা ১৪-বিয়ে ১৫-বয়স বেড়ে গেল ১৬-ছেলের ১৭-রইলো ১৮-দুধ থেকে তোলা মাখন বা ননী ১৯-কোলে ছেলে ২০-দেব আমি।

॥ ১২ ॥

বাড়ীর আগে শলোয়ারে[১] বাউগোন[২]
ধিকি ধিকি জ্বলে মোর মনের আগুন।
ছোট ননদি, ভাই ক্যানে তোর বিদ্যাশে অইলো[৩]।
অবোলা[৪] সরোলা[৫] জাতি, আইনচে[৬] ননদি মোক্ বিয়াও করি
ছোট ননদি, ভাই ক্যানে তোর বিদ্যাশে অইলো ॥
আগে যদি জাইনতাম্[৭] হায়, বিয়াও করি সাদু বিদ্যাশ যায়
তে হইলে মরনু হয় সাদু গালায় দড়ি দিয়ারে ॥

(লোকসাহিত্য : খণ্ড। পৃ: ১০০)

॥ ১৩ ॥

পতিধন কতয় দিন আর রবু[৮] পন্হ[৯] চায়া।
ওরে নিপাতি গুলঞ্চের[১০] আজি রে ঐনা ফুটিল্ জোড়া ফুল রে
আজি মাঘ যায় আর ফাগুন আইসে পরাণ ব্যাকুল রে ॥
ঐ না হাসির চায়া[১১] কান্দন বেশি কাহয়[১২] না খৈতায়[১৩]
বৈদ্যাশে সোয়ামী ধন মোর চক্ষু না পোচায়[১৪] রে ॥
ওরে মুই তো আদরের নারী যৈবন জোয়ার
সুকের[১৫] অঞ্জনী[১৬] নাহি নিন্দতে[১৭] পোহায় রে ॥
ঐ না সোনার সোয়ামী আমার রে, তার প্যাটান[১৮] শোবার চুল
আজ মুই আবাগী[১৯] ভরা বাড়ীত্ না পাওঁ কোনয়[২০] কুল রে ॥
পতিধন আর কতয়দিন রবু পন্হ চায়া রে ॥

(রেকড : কেদার চক্রবর্তী)

॥ ১৪ ॥

ধেরে ধেরে[২১] যায়রে বীরবল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চায়
মুই নারী দুক্কোতে[২২] মরো[২৩] মোর বন্দুক্[২৪] আনি দ্যাও ॥
চউকের[২৫] পানিত্[২৬] ওরে বীরবল কালি বানাইয়া
শাড়ীর অঞ্চলে[২৭] ন্যাকিনু[২৮] চিটি[২৯] নেরোলে[৩০] বসিয়া ।

শব্দার্থ: ১-ছোট ছোট ২-বেগুন ৩-রইলো ৪-অবলা ৫-সরলা ৬-এনেছে ৭-জানতাম ৮-রব ৯-পথের দিকে ১০-লতাগুল্ম ১১-চেয়ে ১২-কেহই ১৩-জিজ্ঞাসা করে না ১৪-মুছিয়ে দেয় ১৫-সুখের ১৬-রজনী ১৭-বিনিদ্রা ১৮-পাট করা চুল ১৯-আমি অভাগী ২০-কোনই ২১-ধীরে ধীরে ২২-দুঃখেতে ২৩-মরি ২৪-বন্ধুকে ২৫-চোক্ষের ২৬-জলে ২৭-আঁচলে ২৮-লিখিনু ২৯-চিঠি ৩০-নিরালায়।

কোন জনো আচেরে[১] বীরবল মোর দুক্কো বোজে[২]
কোন দ্যাশে আচেরে বন্দু খপোর[৩] কেবা দিবে ।।
বিদ্যাশেতে গেইচে বন্দু মোর দুক্কো নাহি জানে
কার হাতত্ পাটাইম্[৪] চিটি কোন জনো আচে মোরে ।।
ছোট্টহাতে[৫] পাইলচো[৬]রে বীরবল দুদো ভাত দিয়া
এই বেপোদে[৭] ওরে বীরবল মোর বন্দুক্ দ্যাও আনিয়া ।।

(প্রফুল্লকুমার রায় । চিলকির হাট, কোচবিহার)

।। ১৫ ।।

ওকি পতিধন— ।
পাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি ।
খোপেতে নাইরে কইতর[৮] কি করে তার খোপে
যে নারীর সোয়ামী নাইরে, কি করে তার উপে[৯]
আকাশেতে নাইরে চন্দ্রো[১০] কি করে তার তারা
যে নারীর সোয়ামী নাই দিনে আদিয়ারা[১১] ।।
নদীর বসন্তোকালে[১২] রে ভাঙিয়া নামায় মাটি
নারীর বসন্তোকালেরে পুরুষ গালার কাটি[১৩] ।
পুরুষের বসন্তোকালেরে হস্তে মোহন বাঁশী
নারীর বসন্তোকালেরে মুখে মুচকি হাসি ।।
মাচের[১৪] বসন্তোকালেরে করে উজান ভাটি
(হায়রে) মুই নারী একেলা ঘরে করোং কান্দাকাটি রে ।।

(আব্বাসউদ্দিন । রেকর্ড নং এন ১৭২৮৫)

।। ১৬ ।।

ও কুরুয়া হায় হায়—
কও কুরুয়া মোর বন্ধুর দ্যাশের খপোর[১৫] রে ।
পুবাল পচ্চাও[১৬] রে বায়[১৭] আমার কুরুয়া দুই নয়ানে চায় রে
শাড়ীর অঞ্চল দিয়া মোচোঙ[১৮] কুরুয়ার গায়ের ধুলা রে ।।

শব্দার্থ : ১-আছেরে ২-বোঝে ৩-খবর ৪-পাঠাবো ৫-ছোটবেলা হতে ৬-পেলেছি ৭-বিপদে ৮-কবুতর বা পায়রা ৯-রূপে ১০-চন্দ্র ১১-আঁধার ১২-বসন্তকালে বা পূর্ণ যৌবনকালে ১৩-গলার মালা ১৪-মাছের ১৫-খবর ১৬-পশ্চিমা ১৭-বাতাস ১৮-মুছবো ।

সোনার লাঙ্গল উপার ফাল, মোর বন্দুয়া জুড়েছে হাল
তোরষা নদীর পাড়ে পাড়ে আমার কুরুয়া নিতি আহার করে ।।
বন্দুর দ্যাশের কুরুয়া রে তুই, তোক পীরিত করোঙ মুই
দ্যাখাও কুরুয়া মোর বন্দুর দ্যাশের ময়াল[১] রে

(রেকর্ড । সুখচাঁদ খাটা)

॥ ১৭ ॥

ও মোর তনের বন্দুরে, ও মোর মোনের বন্দুরে
ও মোর পাণের বন্দুরে, মোক্ ছাড়ি নিদয়ার বন্দু
কোণ্টে[২] গেইলি রে ।।
না পুরিল্ আশ রে বন্দু, না পুরিল্ আশ
দিন ঘুরিল্ আতি[৩] ঘুরিল্, ঘুরিল্ বরষ মাস ।।
আসমানেতে[৪] তারা জ্বলে মনোত্ জ্বলে আগুন
সে আগুন ওরে নিবাইবার মান্ষি নাই ।।
কোণ্টে গেইলি, কোণ্টে গেইলি, মোক্ ছাড়িয়া তুই ।।

(বুদ্ধদেব রায় – ১০১টি লোকগীতির স্বরলিপি । পৃঃ ২৮)

॥ ১৮ ॥

(বারমাস্যা-কোচবিহার)

কত পাষাণ বাইন্দাচোং[৫] পতি মনেতে ।
ফাগুন মাসে অদিক[৬] জ্বালা চৈতে[৭] নারীর বরণ কালা
বৈশাখ মাস গেইল্ কইন্যার কান্দিতে কান্দিতে ।।
জ্যৈষ্ট[৮] মাসে মিষ্ট ফল আষাঢ় মাসে নয়া জল
শাওন[৯] মাস গেইল্ কইন্যার শয়নে স্বপনে ।।
ভাদ্দোর[১০] মাসে আউল্যা[১১] ক্যাশ[১২] আশ্বিন মাসে বষ্যার শ্যাষ[১৩]
কাত্তি[১৪] মাস গেইল্ কইন্যার ভাইবৃতে ভাইবৃতে[১৫] ।।
অঘাণ মাসে হেম্তি ধান[১৬] পোষ মাসে শীতের বাণ[১৭]
মাঘ মাস গেইল্ কইন্যার উঠিতে বসিতে ।।

(বুলবুল রায় । কোচবিহার)

শব্দার্থ ঃ ১-দেশের সীমা ২-কোথায় ৩-রাত্রি ৪-আকাশে ৫-বেঁধেছো ৬-অধিক ৭-চৈত্র মাসে ৮-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৯-শ্রাবণ ১০-ভাদ্র মাস ১১-এলোমেলো ১২-চুল ১৩-শেষ ১৪-কার্তিক মাস ১৫-ভাবতে ভাবতে ১৬-হেমন্তকালীন ধান ১৭-শীতের তীব্র কশাঘাত ।

॥ ১৯ ॥

(বারমাস্যা—জলপাইগুড়ি)

কত পাষাণ বেঁধেছু[১] বধু হে—।

অঘাণ মাসে[২] নতুন ধানা পৌষ মাসে নায়ের মালা
বধু মাঘের শীত সহেনা পরাণে ॥

ফাগুন মাসে দেহা কালা চৈত মাসে পেম জ্বালা
বৈশাখ মাসে নানা ফুল ফোটে ফুল বনে ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টি ফল আষাঢ় মাসে নতুন জল
শাবণ[৩] মাসে জল কেলি করে কত বধু সনে ॥

ভাদ্দরেতে তালের পিঠা আশ্বিনেতে শশা মিঠা
কাতিক[৪] গেইল বধু বিনে অইবো[৫] কেমনে ॥

(আছিয়া খাতুন। ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

॥ ২০ ॥

কোনবা আশায় থাকোং মোর পাণ-সোনারে
সোনা বাপো ভাইয়ের দ্যাশেরে—।
এ হেনা যুয়ান বয়াসে[৬] সোনা পতি নাই মোর ঘরোত্ রে ॥

বনে কান্দে বনশুয়া[৭] মোর পাণ সোনারে কান্দে জোড়ের টিয়া
দখ্না বাওয়ে[৮] মোর পাণ সোনারে সোনা যৈবন যায় বাড়িয়া।
ফুল ফুটলে পাণ সোনারে দুরত্[৯] যায়রে বাস[১০]
মদুর[১১] নোবে[১২] কত ভমর[১৩]রে সোনা ঘোরে আশোপাশ।

শাক তোলোং মুঞি মুটিরে মুটি কোচর করোং ভারি
ঐমত মোর দারুণ যৈবন বাইরায়[১৪] কাপড় ফাড়ি[১৫]।
কতদিনে গেইচেন মোর পাণ সোনারে দুরে দেশান্তরে
আর কতয়দিন ঘুইরবেন[১৬] সোনা যৈবন না পাওঁ আখিবারে ॥

(কছিরুল্লা শেখ। গৌরীপুর)

॥ ২১ ॥

তোরষা নদীর উত্লি[১৭] পাত্লি কারবা চলে নাও
নারীর মোন মোর উতলি পার্তলি কারবা চলে নাও
সোনা বন্দুরবাদে[১৮]রে মোর ক্যামন করে গাও ॥

শব্দার্থ : ১-বেঁধেছো ২-অগ্রহায়ণ মাসে ৩-শ্রাবণ ৪-কার্তিক মাস ৫-রইবো ৬-যৌবনকালে ৭-বনের শুকপাখী ৮-দক্ষিণা বাতাসে ৯-দূরে ১০-গন্ধ ১১-মধুর ১২-লোভে ১৩-ভ্রমর ১৪-বের হয় (প্রকাশ পায়) ১৫-কাপড় ছিঁড়ে ১৬-ঘুরবেন ১৭-উথাল পাথাল ১৮-বন্ধুর জন্যে।

কন্দুয়া মোর বাণিজ গেইচে উজানিয়ার দ্যাশে[১]
সেইনা দ্যাশে পুরুষ বান্দা পড়ে নারীর ক্যাশে[২]
নানান জনের নানান কতা[৩] শোনোঙ[৪] না করো আও ॥
একনা তারা দুকনা তারা[৫] তারা ঝিলমিল করে
এমন মজারআতি[৬] যায়রে মোন না অয়[৭] ঘরে।
মনোত্ মোর লইক্ষো কাথা[৮] কারবা আগে[৯] কও ॥

(আব্বাসউদ্দিন : রেকর্ড নং এন ২৭২৪৬)

॥ ২২ ॥

মোর সোনা ছাড়িয়া গেইচে[১০]রে ঐনা দূরে দ্যাশে
অঞ্জনী[১১] কান্দিয়া কাটাঙ[১২] মোর পিয়া নাই আইসে।
নিশার শ্যাষে[১৩] দৈয়ল[১৪] কান্দেরে, খোপে কান্দে পায়রা
বসন্তো ছাড়িয়া যায় রে, ও মোর বাড়ে যৌবনজ্বালা রে ॥
দাঁতে কাটি দিতাম গুয়ারে[১৫] গাল ভরেয়া[১৬] খাইতে
কাঁয় আর[১৭] দেকিবে[১৮]রে যৈবন, মোর বৈরী হইল বিধাতা[১৯] ॥
যৈবনের সোতে[২০] সোনা রে ভাসিয়া যায় মোর গাও
কতদিন বাণিজে গেইচেন রে সোনা দ্যাশে ফিরান নাও ॥

(রেকর্ড . প্রণতি সরকার)

॥ ২৩ ॥

ভাটি[২১] হাতে[২২] আইলেন ভারী[২৩] কাথা পোছোঙ ভারীক সারি সারি
ওকি ভারীরে কও ভারী মোর বন্দুয়া কেমন আচেরে[২৪] ॥
আচে বন্দু তোর ভালে ভালে[২৫] দিনা চারেক[২৬] কইন্যা জ্বর গেইচেরে[২৭]
ওকি কিও কইন্যা চায়া[২৮] পাটাইচে[২৯] জিয়া মাগুর[৩০] মাচ রে ॥
মুঞি তো গোয়ালের নারী, দে দুদ খোয়াইতে[৩১] পারি
ওকি ভারীরে কোণ্টে[৩২] পাইমু মুই জিয়া মাগুর মাচ রে ॥

শব্দার্থ : ১-উঁচু অঞ্চলে ২-নারীর চুলের সৌন্দর্যে ৩-নানা কথা ৪-শুনি ৫-একটি দুটি তারা ৬-মজার (সুন্দর) রাত ৭-রয় ৮-লক্ষ কথা ৯-কার কাছে ১০-গেছে ১১-রজনী ১২-কেঁদে কাটাই ১৩-রাত্রি শেষে ১৪-দোয়েল পাখী ১৫-সুপারী ১৬-গাল ভরে ১৭-কে আর ১৮-দেখবে ১৯-বিধাতা ২০-স্রোতে ২১-নিম্নবঙ্গ বা ভাটির দেশ ২২-হতে ২৩-ভারবাহী ২৪ -আছে ২৫-ভালই ২৬-দিন চার ২৭-হয়েছে ২৮-চেয়ে ২৯-পাঠিয়েছে ৩০-জ্যান্ত মাগুর মাছ। ৩১-খাওয়াইতে ৩২-কোথায়।

বাপ মাও[১] মোর দুরাচার ব্যাচেয়া খাইলেক[২] দুরান্তর
ওকি ভারীরে (বুজি) আর না দেখিমু মুই বন্দুয়ার বাড়ী রে ॥

(রেকর্ড ; ধীরেন সরকার)

॥ ২৪ ॥

ওরে বসন্তো তুই ফিরিয়া যা ঘরে—
যুব্যা নারীর মনের আগুন জ্বালাইস ক্যানে বারে বারে ।
মনে জ্বলে মনের আগুন তাও যে সয় মোর গায়
তোর বসন্তের বাওয়ে[৩] আজি মোর বান্দা মোন আউলায়[৪]রে ॥
বিধি মোক্ পাংখা দিলেক হয়
উড়্যা যায়া বন্দুর সাতে[৫] দ্যাকা হইলে হয়
হৃদো হেলানী দিয়া দুঃখ সুখের কাথা কইলোং হয় ।
পাংখা নাই মোর পাংখা নাই ধইরবারও নাই ডাল
নারীর যৈবন পানের বোটা আখিমু[৬] কতয়কাল রে ॥

(রেকর্ড শেফালী সরকার)

॥ ২৫ ॥

ওরে দৈয়ল তুই কান্দিস ক্যানে- ।
তুই ক্যানে কান্দিস দৈয়ল আতি-নিশাকালে[৭]
তোর দৈয়লের কান্দন শুনি মোরও পরাণ ভাঙে ॥
তুইও য্যামোন কান্দিস দৈয়ল ডালে পড়িয়া
মুইও ত্যামোন কান্দোং দৈয়ল পালঙ্কে শুতিয়া[৮]
বালুটিল্‌টিল্ পংখীরে কান্দে বালুত্ পড়িয়া
মুইও ত্যামোন কান্দোং দৈয়ল বান্দবের নাগিয়া[৯] ॥
বাপো মাও মোর নিদয়া ব্যাচেয়া খাইচে[১০] দূরে
তোর দৈয়লের কান্দন শুনি মোনের আগুণ জ্বলেরে ॥

[তৃপ্তি রায় । জলপাইগুড়ি]

॥ ২৬ ॥

চ্যাংড়া বন্দুরে— ।
আমারে ছাড়িয়া যাবিরে কোথায়

শব্দার্থ ঃ ১-বাবা ও মা ২-বিয়ে দিয়েছে ৩-বাতাসে ৪-এলোমেলো ৫-দেখা ৬-রাখবো ৭-রাত্রি-নিশাকালে ৮-খাটে শুয়ে ৯-বান্ধবের জন্য ১০-বিয়ে দিয়েছে ।

তোমার জইন্যে ভেইবে ভেইবে[১] হইলামরে গচের বাকল[২]
চ্যাংড়া বন্দু তুই মোর নয়ানের কাজল ॥
অংপুরের[৩] অংসুপারী[৪] দিনাজপুরের ছাচি পান
চ্যাংড়া বন্দু মোর আউলাইল্ পরাণ।
তোমার জইন্যে কিন্যা আইন্‌লাম বালুরঘাটের মোটরখ্যান[৫]
চ্যাংড়া বন্দু চইড়্যা বেড়ান তবু ক্যান আমায় ছাইড়্যা যান ॥

(সুশীলা রায়। কোচবিহার)

॥ ২৭ ॥

ওরে আতি[৬] পোভাতকালে[৭] কুকিলা কান্দে ডালে
খঞ্জনা আঙ্গিনায় খ্যালে।
ওরে খঞ্জনা পাখীর আও[৮] কিবা কিবা[৯] করে গাও
আমি নারীরে পোড়া কোপালে ॥
ওরে ও মোর মনোত্ নাইরে সুক[১০] পতি মোর বৈদ্যাশে
পাষাণে বান্দিচোং বুক।
ওরে ও নিদয়ার বন্দু দয়া নাই তোর মোনেরে
আরে ও নিদয়ার কালা নাগাইল না পাঁও তোরে রে
মনডা মোর বাইরাং বাইরাং[১১] করে ॥
ওরে কার পীরিতে মোর বন্দু না আইসে রে
ওরে মোনের দুকনা[১২] কাথারে কঙ বন্দুর নাগাইল পাইলে রে ॥

(রেকর্ড: ধীরেন সরকার)

॥ ২৮ ॥

গেইলে কি আসিবেন সিপাইরে— ॥
ঢাল বান্দেন তলেয়ার[১৩] বান্দেন আর বান্দেন পাগুড়ী[১৪]
বিহাও করি ছাড়িয়া যাইছেন অল্প বয়াসের নারীরে ॥
নম্বা ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া[১৫] যাইচেন গুয়া
পর পুরুষে খাইবে গুয়ারে চোচার[১৬] ভাগী তোমরা রে ॥

শব্দার্থঃ ১-ভেবে ভেবে ২-শরীর শুকিয়ে অস্থিচর্ম সার হয়েছে ৩-রংপুরের ৪-রং সুপারী (রঙীন সুতায় জড়ানো সুপারী) ৫-মোটর গাড়ী ৬-রাত্রি ৭ প্রভাতে ৮-পাখীর ডাক ৯-কেমন কেমন ১০-সুখ ১১-ঘর বার ১২-দুখানি বা দুটি ১৩-তলোয়ার ১৪-পাগড়ী ১৫-রোপণ করে ১৬-খোসা।

নয়া ভিটা নিয়ারে সিপাই উইয়া যাইচেন কালা[১]
বগদুল বাদুড়ে[২] খাইবে কালারে চোচার ভাগী তোমরা রে ॥

(বকুল রায় । বানেশ্বর, কোচবিহার)

খ পুরুষের বিরহ

॥ ১ ॥

ও উড়িয়া যাওরে ওরে বুলবুলি ময়না
উজানি পাকে[৩] আজি মলেয়ায়[৪] তোলাইচে[৫] বাও
মোর না দুক্কের কাথা[৬] যায়া[৭] পিয়ার আগে[৮] কও ॥
উজানী পাহাড়ের ধারে নাচে মউর[৯] শালের ডালে
আখোয়াল[১০] গায় ভাওয়াইয়া গান ঐনা শালের তলে।
ওরে সেইখানে কাজেনা দিগীর[১১] পাষাণ[১২] বান্দা ঘাট
ও তার চাইরপাকে[১৩] ফুলের বাগান জলে হোলার হাট[১৪] ॥
ওরে সেই ঘাটে মোর আইসে পিয়া কাংখে লইয়া কলসী
ওরে কি কব তার উপের[১৫] শোবা য্যামোন কোন ভাবের পরী[১৬]
আরে যারে বুলবুলি তুই মোর পিয়ার দ্যাশে
কয়া[১৭] দেইস[১৮] মুই কমবক্তা[১৯] কান্দিয়া কাটাওঁ নিশি
একেলা ঘরে বসিরে—ও ওরে বুলবুলি ময়না ॥

(রেকর্ড : কেশব বর্মণ)

৬. প্রেমে হতাশা

ক. নারীর আক্ষেপ

॥ ১ ॥

পেম জানেনা অসিক[২০] কালাচান[২১], ওসে ঘুইরে[২২] মরে মোন।
কতয়দিনে বন্দুর সনে হবি[২৩] দরশন বন্দুরে।
একলা ঘরে শুইয়া থাকোং পালঙ্কের উপারে[২৪]
মোন আমার ক্যারম কি কুরুম কি ক্যারম ক্যারন করে ॥

শব্দার্থঃ ১-কলা ২-বাদুড় ৩-উজানের দিকে ৪-বাতাস ৫-তুলেছে ৬-কথা ৭-গিয়ে ৮-প্রিয়ার কাছে ৯-ময়ূর ১০-রাখাল ১১-পুকুর ১২-সিমেণ্ট বাঁধানো ১৩-চারদিকে ১৪-শাপলা ফুলের ছড়াছড়ি ১৫-রূপের ১৬-কল্পনার পরী ১৭-বলে ১৮-দিস ১৯-আমি অভাগা ২০-রসিক ২১-কালাচাঁদ ২২-ঘুরে ২৩-হবে ২৪-উপরে।

বন্দুর বাড়ী আমার বাড়ী যাইতে আইসতে[১] এত দেরী
বন্দু যামো না রব শুদাই[২] কর মানা বন্দুরে।
হ্যাটিয়া যাইতে নদীর জল থাকলুম কি থুকলুম কি খল্লাল খল্লাল[৩] করে ॥
তোমার আশায় বইসে থাকি বটবিরিক্ষির[৪] তলে
মোন আমার উড়াম্ বাইরং[৫] করেরে উড়াম বাইরং করে।
ফাগুন মাইস্যা[৬] ম্যাঘের দিনে[৭]
টম্বর কি টুম্বুর কি[৮] ঝপ্ঝপাইয়া পড়েরে, ঝপঝপাইয়া পড়ে ॥

(কেদার চক্রবর্তী। কোচবিহার)

॥ ২ ॥

অফুলা[৯] শিমিলার[১০] তলে, যুব্বা নারী[১১] বারাবানে[১২]
গাও বয়া[১৩] পড়ে নারীর ঘাম।
কোনজন দরদী হইবে গাওয়ের ঘাম মোচেয়া[১৪] দিবে
সোনামুকেত্[১৫] মোর তুলিরা দিবে পান ॥
বাড়ীর ওত্তোর পাকে[১৬] শাচন্দন বৃক্ষের[১৭] গচ আচে
তাতে দিচে জোড়বা[১৮] কুকিলার ভাসা[১৯]।
কোনজন দরদী হইবে কুকিলার বাচ্চা পাড়িয়া দিবে
সেই হইবে মোর পরোকালের[২০] বান্দোব[২১] ॥
তুলার বালুশটা[২২] বুকেত্ নিয়া মুই নারীটা থাকোং[২৩] শুতিয়া[২৪]
দারুণ চোকেত্[২৫] মোর নিদ্না যে ধরে
যত্সকিরা[২৬] জল আনিতে চলে, সংগায় কাংখে কলোস তোলে
মুই নারীটা ওভাগিনী[২৭] পতি নাই মোর ঘরে
পতি বিনে কলোসের শোবা কাই[২৮] দেইকপে[২৯] মোরে ॥

(লোকসাহিত্য: ১১ খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ১৩৮২। পৃ: ৩)

শব্দার্থ: ১-যেতে আসতে ২-জিজ্ঞাসা করি ৩-জলের শব্দ ৪-বটগাছের ৫-উড়ু উড়ু করে ৬-ফাল্গুন মাসের ৭-বৃষ্টি হলে ৮-বৃষ্টি পড়ার শব্দ ৯-যে গাছে ফুল হয়নি ১০-শিমুল গাছ ১১-যুবতী ১২-ধান ভানে ১৩-গা বেয়ে ১৪-মুছিয়ে ১৫-সোনামুখে ১৬-উত্তরদিকে ১৭-বৃক্ষের ১৮-জোড়া ১৯-বাসা ২০-পরজনমের ২১-বান্ধব ২২-বালিশটা ২৩-থাকি ২৪-শুয়ে ২৫-চোখেতে ২৬-সখীরা ২৭-অভাগিনী ২৮-কে ২৯-দেখবে।

॥ ৩ ॥

আজি আউলাইলেন[১] মোর বান্দা ময়ালরে[২] –
আরে হাতীর পিঠিত্[৩] থাকিয়ারে মাউত্ কিসের বাটুল মারো
ওরে পরার কামিনীক[৪] দেকিয়া জ্বলিয়া ক্যান মররে।
হাতীর পিঠিত্ থাকিয়ারে মাউত থেরা[৫] কলা ভাঙ
(আরে) নারীর বেদনারে মাউত তোমরা কিবা জানো।
হাতীর পিঠিত্ থাকরে মাউত হাতীর ময়া জান
নারীর মনের কাথা কিবা তোমরা জানো ॥

(নীলকমল রায়প্রধান। জামালগঞ্জ, কোচবিহার)

॥ ৪ ॥

আজি নদীর জলে ঘসোন মাজন, নদীত্[৬] উটে[৭] ঢেউ।
মোর নারীর মনেরে আগুন দেইক্লো[৮] না আর কেউ ॥
নদীত্ কান্দে পানকৌড়িরে বনোত্ কান্দে টিয়া
ভরযুবতী নারীরে কান্দে পালঙ্কেতে শুতিয়া ॥
হালুয়ার[৯] শোবা হাল পেন্টিরে[১০], পেন্দোনের[১১] শোবা ধুতি
ভরযুবতী নারীরে[১২] শোবা যার সে আছে পতি ॥

(মালতী রায়। কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

আমি কি দিয়া বান্দিয়া আইক্বো[১৩], আমার এ নয়্যা যৈবন রে।
সোনা না হয় উপা[১৪] না হয় যে মালা গরেয়া[১৫] গালায় দিব।
ট্যাহা[১৬] না হয় পৈসা[১৭] না হয় যে যৈবন বাস্কে[১৮] তুলিয়া থুইমো ॥
মণি না হয় মাণিক না হয় যে যৈবন অঞ্চলে বান্দিবো
গুয়া না হয় পান না হয় যে তাক অতিথিক্ পরশিবো[১৯] ॥
(আরে) চালেরো কুমড়া না হয় যে
ও তাক্ পরশীক্ বিলামো, না হয় চালে তুলিয়া থুইমো ॥
আমি কি দিয়া বান্দিয়া আইকবো রে আমার এ পুড়্যা যৈবন রে ॥

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-এলোমেলো করে দিলেন ২-বাঁধা ময়াল সাপের মত চুল ৩-পিঠে ৪-পরের নারী ৫-কলাগাছের থোর ভাঙা ৬-নদীতে ৭-ওঠে ৮-দেখলো ৯-চাষীর ১০-লাঙ্গল জোয়াল ১১-পরিধান করার ১২-নারীর ১৩-রাখবো ১৪-রূপা ১৫-গড়িয়ে ১৬-টাকা ১৭-পয়সা ১৮-বাক্সে ১৯-অতিথি আপ্যায়ন করবো।

॥ ৬ ॥

ওকি গাড়ীয়াল[১] ভাই—।
কত রবং[২] মুই পংহের[৩] দিকে চায়া রে[৪]।
যেদিন গাড়ীয়াল উজান যায়
নারীর মোন মোর ঝুরিয়া অয় রে ॥
ওকি গাড়ীয়াল ভাই হাকাও গাড়ী তুই চিলমারীর বন্দরে[৫]
আর কি কব দুস্কের[৬] জ্বালা
গাড়ীয়াল ভাই গাতিয়া[৭] চিকন মালা রে
কত কাদিম[৮] মুই নিদুয়া-পাতারে[৯] রে ॥

(সুশীলকুমার রায়। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ৭ ॥

ওকি নাগর কানাই—।
তুই উজান ছাড়ি ভাটির দ্যাশত[১০] কল্লেন[১১] যায়া[১২] বাড়ী
ওরে যৈবনকালে দোনোজনায়[১৩] হলং ছাড়াছাড়িরে ॥
তুইও ছোড[১৪] মুইও ছোড, এক বয়াসের জোড়া[১৫]
(ওরে) মুইনা করচোং অসের গীতি[১৬] তুই বাজান দোতরা ॥
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী অনেক দূরের ঘাটা
(ওরে) ক্যামন করি হইবে দ্যাকা[১৭] ঝোরে চউক্ষের[১৮] পানি ॥
ভোমরা খালি উড়িয়া পড়ে ফুলের মদুর[১৯] বাদে[২০]
(ওরে) তোক্ ভোমরার বাদে[২১] আজি মোর না পরাণ কান্দে রে ॥

(কামিনীকুমার রায়। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ৮ ॥

ও নদীরে, ও মোর তিস্তারে—।
ওরে তোর যামন থৈ থৈ ব্যালা[২২]
সেইমত মোর হৃদের জ্বালা রে
জ্বালায় জ্বালায় মোর শরীল[২৩] হইল্ কালা রে ॥

শব্দার্থ : ১-গাড়োয়ান ২-রবো ৩-পথের ৪-চেয়ে ৫-স্থান নাম ৬-দুঃখের ৭-গেঁথে ৮-কাঁদবো ৯-ধুধু প্রান্তরে ১০-নীচু অঞ্চলে ১১-করেছেন ১২-গিয়ে ১৩-দুজনায় ১৪-ছোট ১৫-একবয়সের সমবয়সী ১৬-রসের গীতি অর্থাৎ প্রেমগান ১৭-দেখা ১৮-চোখের ১৯-মধুর ২০-জন্যে ২১-ভ্রমরের জন্যে ২২-নদীর বুকে ওঠা ঢেউ ২৩-শরীর।

নদী দিয়া কত নৌকা চলে রে
চাইয়া থাকি নদীর আশে রে
কাঙখের কলসী[১] থুইয়া বসি রে
জলের ছলে মুই ঘাটোত্ আসি রে
(ওরে) কোনবা নাইয়া বাজায় বাঁশী রে
কলঙ্কিনী বলে মোরে সকলে রে ॥

(নির্মলেন্দু চৌধুরী—পল্লী বাংলা লোকগীতি। । পৃঃ ২৬)

॥ ৯ ॥

ও বিরিক্ষো[১] শিমিলারে[৩]—গগনে ম্যালে[৪] ঠ্যাল্[৫]
নারী হয়্যা[৬] অসের যৈবন[৭] আইক্বো[৮] কতয়কাল[৯]।
বিরিক্ষো মোর শিমিলারে—॥
পাহাড়ে কান্দে মাল ঘুঘুরা রে[১০] বিরিক্ষো মোন্ যাঁও যাঁও করে।
পরার-পুরুষ[১১] পদ্মের ফুল সদায় মনে পড়ে শিমিলারে ॥
বালু টিল্‌টিল্ পংখী[১২] কান্দেরে, বিরিক্ষো বালুতে পড়িয়া
ভাইটাল-ব্যাপারী[১৩] কান্দে কিসের লাগিয়া শিমিলারে ॥

(ডঃ ভুপেন হাজারিকা। গৌহাটি, আসাম)

॥ ১০ ॥

কালা ভুলিয়া অইতে[১৪] পারিনা রে।
কালা ভুলিয়া যাইতে পারিনা রে ওহোরে পাণের কালা।
কালা দোত্‌রায় ভরেয়া[১৫] গান অদিয়া অদিয়া[১৬] চলিয়া যান রে
ওরে চিকন কালার দোত্‌রার ডাং[১৭] ঘরে না অয় পাগেলা[১৮] মন রে
ওরে চিকন কালার এমনি ময়া
বুজাইলে[১৯] না মানে দেহা
আমের গচের আলোক লতা
দূরের বন্দুর কিসের আশা রে
ওহো রে কালা, পাণের কালা ভুলিয়া অইতে পারিনা ॥

(রেকড : নায়েব আলি)

শব্দার্থ : ১-কাখের কলসী ২-বৃক্ষ ৩-শিমুল গাছ ৪-আকাশে ছড়িয়ে দেয় ৫-ডাল ৬-হয়ে ৭-রঙীন যৌবন ৮-রাখবো ৯-কতদিন ১০-পাহাড়ী ঝিঁ ঝিঁ পোকা ১১-পরপুরুষ ১২-নদীর পাড়ের তিতির পাখী ১৩-ভাটি দেশের ব্যবসায়ী ১৪-রইতে ১৫-দোতারায় সুর তুলে ১৬-অন্যদিক দিয়ে ১৭-দোতারা বাজনার শব্দ ১৮-পাগল ১৯-বুঝালে।

॥ ১১ ॥

কুকিলার[১] কুহ্ কুহ্‌রে—আরে মোর মইওরের[২] ফ্যাকম্[৩]
কোন দ্যাশে থাকিয়া ও মোর বন্দ্ দেখালু স্বপন।
বালাই দেঙ[৪] তোর পীরিতির[৫] মাথাত্ রে ॥
ধনকাঙালী[৬] সাউদের[৭] ছাইলারে[৮]
(আরে) মোর ধনক্[৯] নাই গে মোন্
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা, বন্দ্ বৈদ্যাশে গমন ॥
গচ মইদে[১০] শিমিলার গচ, সগে[১১] ম্যালে[১২] ঠ্যাল[১৩]
নারী হয়া এ অসের যৈবন রাখিম কতয়কাল।
বালাই দেঙ তোর পীরিতির মাথাত্ রে ॥

(যোগীন রায়। হলদিবাড়া, কোচবিহার)

॥ ১২ ॥

তুই মোর নিদয়া কালিয়ারে।
ও মোর কালিয়া দয়া নাই তোর পাণেরে।
আঙ্গিনা সাম্‌টিয়া[১৪] ঘরোনা নেপিয়া ঘরোনা পুছিনু[১৫] রে
ও মোর কালিয়া বেড়াইয়া[১৬] নাই মোর ঘরে রে ॥
ছ্যাকা[১৭] না পাড়িয়া কাপড় ধুইয়া কাপড় শুকানু রে
ও মোর কালিয়া পিন্দিয়া[১৮] দ্যাখাইম্ মুই কাক রে
ভাতোনা[১৯] চড়েয়া[২০] ভাতোনা আন্দিয়া[২১] ভাতোনা বাড়িলু রে
ও মোর কালিয়া খাওয়াইয়া[২২] নাই মোর ঘরে রে ॥
সুপারী কাটিয়া পানোনা সাজেয়া[২৩] খিলি না বনানু রে
ও মোর কালিয়া কার মুখোত দিম্ তুলিয়া রে।
বিচিনা ঝাড়িয়া বিচিনা পাড়িয়া মসুরী ট্যাঙ্গানু[২৪] রে
ও মোর কালিয়া শোয়াইয়া নাই মোর ঘরে রে ॥

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়া, কোচবিহার)

শব্দার্থ ঃ ১-কোকিলের ২-ময়ূরের ৩-পেখম ৪-অবজ্ঞা করি ৫-প্রেমের ৬-ধনের প্রত্যাশী ৭-সওদাগরের ৮-ছেলে ৯-ধনে ১০-গাছের মধ্যে ১১-স্বর্গে (আকাশে) ১২-বিস্তার করে ১৩-ডাল ১৪-ঝাঁট দিয়ে ১৫-ঘর পরিষ্কার করে ১৬-বেড়ানোর লোক নেই ১৭-ক্ষারে কেচে ১৮-পরে ১৯-ভাত ২০-চড়িয়ে ২১-ভাত বেঁধে ২২-খাওয়ার লোক ২৩-পান সাজিয়ে ২৪-টানলাম।

॥ ১৩ ॥

দৈয়ল রে[১]—কার জইন্যে[২] আকিবোরে[৩] সোনার যৈবন[৪] ।
লাজে[৫] নাই কঙ[৬] দৈয়ল রে দৈয়ল বাপো মায়ের আগে[৭] ।
তোলা মাটির কলা য্যামন হল্‌ফল্‌ হল্‌ফল্‌[৮] করে
ঐ মত সোনার যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে ॥
দ্যাওয়ায়[৯] করে ম্যাঘম্যাঘালি তোলায় পুবাল বাও
সোনার যৈবন আমার সাতে[১০] করে একায় বাও রে[১১] ।
বালুটিল্‌টিল্‌ পংখীরে কান্দে দৈয়ল বালুতে পড়িয়া
মোর নারীর হিয়া কান্দেরে পাণের বান্দব লাগিয়া ॥
বোনের[১২] পংখী বন্দীরে তুই পিঞ্জিরার মাজে[১৩]
কও তো দৈয়ল তোমার যৈবন লাগে কোন কাজে ।
যারে দৈয়ল ছাড়িয়া দিনু হাওয়ায় উড়ি যাইও
মোর সব দুস্কের কাতা[১৪] বাগো মাওরে কইও ॥

(রেকর্ড : হরেন দাস)

॥ ১৪ ॥

নাইয়ারে—চাপাও নৌকা কোমলা[১৫] সোন্দরীর ঘাটে
নাও বায়া[১৬] যাও নাইয়ারে তোর সে মনের সুক[১৭]
ওরে নায়ের বাদাম[১৮] তুলিয়া রে নাইয়া দেখাও চান্দো[১৯] মুক[২০] ॥
মোনে কতয় দুস্ক নাইয়ারে চিতে বড়য় দুস্ক
(ওরে) নদীর পাতারের মত ভাঙে নারীর বুক রে ।
নদীর মাজে[২১] থাকো নাইয়ারে নায়েরো কাণ্ডারী
(ওরে) ওভাগোনীর[২২] নাইরে নাইয়া যৈবনের ব্যাপারী রে ॥

(উমাকান্ত রায়বমণ । কোচবিহার)

শব্দার্থ : ১-দোয়েল পাখী ২-কার জন্যে ৩-রাখবো ৪-যৌবন ৫-লজ্জায় ৬- বলিনি ৭-বাবা মায়ের কাছে ৮-বেশ পুরুষ্ট হয় ৯-বৃষ্টি ১০-আমার সঙ্গে ১১-তুফান তোলে ১২-বনের ১৩-মাঝে ১৪-কথা ১৫-কমলা ১৬-বেয়ে ১৭-সুখ ১৮-নৌকার পাল ১৯-চাঁদ ২০-মুখ ২১-নদীতে ২২-অভাগিনী ।

॥ ১৫ ॥

পড়োশী[১] আপোনার[২] নোওয়ায়[৩] বান্দব রে।
ঐ নলের[৪] আগুন তলে রে তলে, খাগড়ার[৫] আগুন জ্বলে
(আর) মোর আবাগীর[৬] মোনের আগুন জ্বলে মোনের তলে।
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী মইদ্যে[৭] ক্ষীরোল নদী[৮]
(ওরে) আইসতে[৯] যাইতে খুলুৎ খালাৎ[১০] পাংখা নাই দেয় বিদি।
কোড়া কান্দে কুড়িরে কান্দে কান্দে বালিহাঁস
(আর) বোনেরো[১১] হরিণী কান্দে ছাড়িয়া মুকের ঘাস রে॥
দলবাড়ীখান্[১২] দলোরে দলো[১৩] তাইতে বাগের[১৪] বয়[১৫]
তোমরা ক্যানো আইস্বেন বান্দোব আমরায়[১৬] গেইলোং হয়[১৭]
ঝরি পড়ে ইমিরেঝিমি[১৮] মলেয়ায় [১৯] তোলায় বাও[২০]
ছাইঞা দুয়ারে আসিয়ারে বান্দোব খোপায় মোচ[২১] পাও রে॥
(নীহার বড়ুয়া : গৌরীপুর)

॥ ১৬ ॥

পাণ বাচেনা[২২] যৈবন জ্বালায় মরি।
উড়িয়া যায় রে সল্লীরে পংখী[২৩] পড়ে জোড়ে জোড়ে[২৪]
হায়রে দারুণ বিদি[২৫] মুঞি একেলায়[২৬] ঘরে রে॥
নাউফুল[২৭] কুমড়ার ফুলরে সইঞ্জা[২৮] হইলে ফুটে
মোর আবাগীর মোনের আগুন বিচিনায় শুতিলে[২৯] উটে
ন্যাপ[৩০] দিয়া ঢাকিলে নেকেন[৩১] যৈবন ঢাকা যায়
কাপড়ের বন্দনে কিরে[৩২] যৈবন বান্দা যায় রে॥
কোলের বালুশক্ রে[৩৩] মুঞি পোড়্যা[৩৪] করিম্ ছাই
যেনা দ্যাশে[৩৫] দোসর মিলিবে সেই দ্যাশোত্ যাইরে॥
(বয়ান শেখ। গৌরীপুর)

শব্দার্থঃ ১-প্রতিবেশী ২-নিজের ৩-নয় ৪-নলগাছ ৫-খাগড়া ঘাস ৬-অভাগিনী ৭-মধ্যে ৮-ক্ষীণকায়া নদী বা ক্ষিরোল নামের নদী ৯-আস্তে ১০-জলে চলার শব্দ ১১-জঙ্গলের ১২-জংলজ ঘাস দ্বারা আবৃত বাড়ী ১৩-টলোমলো ১৪-বাঘের ১৫-ভয় ১৬-আমরা (এখানে আমি অর্থে) ১৭-গেলে হয় ১৮-রিমঝিম্ বৃষ্টি ১৯-বাতাসে ২০-ঝড় ওঠে ২১-খোঁপায় মোছ বা পরিষ্কার কর। ২২-প্রাণ বাঁচেনা ২৩-বনের পাখী২৪-জোড়ায় জোড়ায় ২৫-নিদারুণ বিধাতা ২৬-একলা ২৭-লাউফুল ২৮-সন্ধ্যে ২৯ শুয়ে পড়লে ৩০-লেপ ৩১-কিনা ৩২-বাঁধনে ৩৩-বালিশকে ৩৪-পুড়িয়ে ৩৫-যে দেশে।

॥ ১৭ ॥

মনে বড়য় দুস্ক সকীরে[১] চিতে[২] বড়য় দুস্ক ।
(হায়রে) নদীর কাছারের[৩] মত ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক ।
ও সকী, মনকে বুজাবো[৪] রে কত ॥
নদীর চিকণ[৫] বাণ বরিষা বালার চিকণ[৬] বাও
নারীর চিকণ পরার পুরুষ[৭] ছাওয়ার চিকণ[৮] মাও ।
আশিন কাত্তিকো[৯] মাসে কুরুয়া করে আও
(হায়রে) গিরির[১০] ঘরের বউ বনুস[১১] চিন্তে বাপো মাও ॥
অনল নিবাইতে[১২] গেইলাম যমুনারি জলে
ওসে বাইরার[১৩] অনল না হয় অনল নিবে[১৪] কেমনে রে ॥
(রেকড : চিন্তাহরণ রায়)

॥ ১৮ ॥

রে বিদি নিদয়া—।
পরথম[১৫] যৈবনকালে না হৈল[১৬] মোর বিয়্যা[১৭]
আর কতয়কাল[১৮] রহিম ঘরে একাকিনী হয়্যা[১৯] ।
হাইল্যা[২০] পৈল[২১] মোর সোনার যৈবন মলেয়ার ঝড়ে
মাও বাপো মোর হৈল বাদী না দিল পরার ঘরে[২২] ।
বাপোক[২৩] না কওঁ সরমে মুই মাওক[২৪] না কওঁ লাজে
দিকিদিকি[২৫] তুষের আগুন জ্বলছে দেহার মাজে[২৬]
বুক ফাটে তাও মুখ ফোটে না লাজ সরমে ভরে
খুলিয়া কৈলে[২৭] মনের কাতা[২৮] নিন্দা করে পরে ॥
এ্যামন মোন মোর করেরে বিদি অ্যামন মোন মোর করে
মোনের মতো চেংড়া দেখি ধরিয়া পালাওঁ দূরে ॥
(মধুপর্ণী , শ্রাবণ । পৃঃ ৪৮-৪৯)

শব্দার্থ : ১-সখীরে ২-চিত্তে বা মনে ৩-পাড়ের ৪-বুঝাবো ৫-নদীর সৌন্দর্য ৬-বালুকা রাশির সৌন্দর্য ৭-অন্য পুরুষ বা প্রেমিক ৮-মায়ের সৌন্দর্য ছেলে কোলে নিলে ৯-কার্তিক মাস ১০-গৃহস্থের ১১-বউ বা স্ত্রীলোক ১২-নিভাতে ১৩-বাইরের ১৪-নিভাই ১৫-প্রথম ১৬-হোল ১৭-বিয়ে ১ -কতদিন ১৯-হয়ে ২০-হেলে ২১-পড়লো ২২-বিয়ে দেওয়া ২৩-বাবাকে ২৪-মাকে ২৫-ধিকিধিক ২৬-দেহের মাঝে ২৭-খুলে বললে ২৮-কথা ।

॥ ১৯ ॥

রে বনের[১] বায়ৈ[২]রে— ।
নাইলের[৩] আগাত্[৪] নাল[৫] শালুকা বাঁশের আগাত্ টিয়া ।
আর কতয়দিন আইক্বো[৬] যৈবন অঞ্চলে বান্দিয়া ॥
আর কতয়দিন আইক্বো যৈবন বাপো মাও'র ঘরে
আর কতয়দিন আইকবো যৈবন চাচা-চাচির[৭] ঘরে রে ॥
আমার তৈল আইনবে[৮] শিশির মুক-মোড়া[৯] হয়্যা
আমার সেন্দুর আইন্বে সোনার কোটায়[১০] ভর্যা ॥
রে বুনের বায়ৈ রে আর কতয়দিন আইক্বো সোনার যৈবন রে ॥

(অনিতা সাহা। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ২০ ॥

সকীরে, আর কি দেকা[১১] পামো[১২] জেবনে[১৩]
আমার দিনে দিনে তন[১৪]হইল ক্ষীণ[১৫]সকী ভাবদে ভাবদে[১৬]তাহারি ।
দুই নয়ানের[১৭] জলে আমার বক্ষি[১৮] বাসে[১৯] নদী
এ্যাতয়দিনে[২০] ক্ষয় হইতাম পাষাণ[২১] হইতাম যদি ।
আমার হাড়-মাস হইল ফাঁপা, অন্তর-কাটা[২২] পোকারে ।
হইতাম যদি জলের কুম্ভীর, খুজ্যা[২৩] দেক্তাম[২৪] জলে
হইতাম যদি বোনের বাগরে[২৫]খুজ্যা দেক্তাম জোঙ্গলে
দারুণ-বিদি যদি দিত পাখারে সকী দেক্তাম জগত ভমে[২৬]
সকীরে আর কি দেকা পামো জেবনে ॥

(অনিল রায়। জটেশ্বর, কোচবিহার)

॥ ২১ ॥

কোন্ বনে ডাকিল্ কুকিল[২৭]রে— ।
ও মোর কুকিল হিয়ায় নাগালু[২৮] মন্নয়া[২৯]রে ॥

শব্দার্থ : ১-বনের ২-বাবুইপাখী ৩-শাপলা ফুল ৪-মাথায় ৫-লাল ৬-রাখবো ৭-কাকা-কাকিমা ৮-আনবে ৯-মুখ আটকানো শিশিতে ১০-কৌটোতে ১১-দেখা ১২-পাবো ১৩-জীবনে ১৪-শরীর ১৫-শীর্ণ ১৬-ভাবতে ভাবতে ১৭-দু নয়নের ১৮-বক্ষ ১৯-ভাসে ২০-এতদিনে ২১-পাথর ২২-পোকায় কাটা ২৩-খুঁজে ২৪-দেখতাম ২৫-বাঘ ২৬-ঘুরে ২৭-কোকিল ২৮-লাগালে ২৯-মায়া ।

সুবর্ণের পালঙ্কেরে কুকিল আছিনু মুই শুতিয়া
(ওরে) তুই ক্যানে ডাকিলু কুকিল মুকে গান ভরেয়া[১]।
শালশৈলের বৃক্ষে কুকিল বসিয়া কান্দাও বন
কি গান শোনাইলেন মোরে ঘরে না অয়[২] মোন রে ॥
যৈবন জোয়ারে কুকিল ভাস্যা চলি আমি
(ওরে) ক্ষীরোল নদীত্ পাংখা হেলেয়া[৩] দ্যাকিয়া যাও তুমি
মনোত্ ফোটে চাম্পা কুসুম বনোত্ ফোটে হোলা
ওরে দুরের বন্দু দুরেই অইলো[৪] কিসের ভালোবাসা রে ॥

(কামিনীকুমার রায় · দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ২২ ॥

ধিকো ধিকো ধিকো[৫] মৈষালরে মৈষাল ধিকো গাবুরালী[৬]
এ হেনা[৭] সুন্দর কইন্যাক্ ক্যামনে যাইমেন[৮] ছাড়ি মৈষাল ও ॥
তকোনে[৯] না কইচোং মৈষালরে মৈষাল না যান্ চরুয়া পাড়া[১০]
চরুয়া-পাড়ার চেংড়ীগিলা[১১] জানে গুয়া পড়া[১২] মৈষাল ও ॥
ভার বান্দেন ভারাটি বান্দেনরে মৈষাল বান্দো মাতার ক্যাশ
আজিকা না দ্যাকোং মৈষাল ছাইড়বেন হামার দ্যাশ মৈষাল ও ॥
তমরা[১৩] যাইমেন্ ভৈষ বাতানেরে মৈষাল আমার পোড়ে হিয়া
এই সোনার যৈবন াক আখিমু[১৪] কাপড়ে বান্দিয়া মৈষাল ও ॥

(নীহার বড়ুয়া। গৌরীপুর)

॥ ২৩ ॥

ওকি ওরে কদমের ছেঁয়া[১৫], তোর তলে ভুকাও বারা[১৬]
বক্কো বায়া[১৭] পড়ে নারীর ঘাম।
কায়[১৮] মোর দরদী হইবে বুকের ঘাম মোচেয়া[১৯] দিবে
সোনা মুকে তুলিয়া দিবে পান ॥

শব্দার্থ: ১-গান ভরে ২-না রয় ৩-পাখা মেলে ৪-রইলো ৫-ধিক ধিক ধিক ৬-যৌবন ৭-এমন ৮-যাবেন ৯-তখনই ১০-যে পাড়ায় বাথান রয়েছে ১১-মেয়েরা ১২-মন্ত্রপূত সুপারী ১৩-তোমরা ১৪-রাখবো ১৫-ছায়া ১৬-ধান ভানা ১৭-বেয়ে ১৮-কে ১৯-মুছিয়ে।

ওরে ও কদমের ছেয়া সবল হয়্যা চড়লাম গচে
ডাল ভাইঙ্গা পড়লাম নীচে
কোন সাতী[১] মোক্ চড়াইল্ পেম গচে[২] রে ॥

(মালতী রায়। কোচবিহার)

॥ ২৪ ॥

মৈষ চরান মোর মৈষাল বন্দুরে বন্দু কোনবা[৩] চরের মাজে[৪]
এলা ক্যানে[৫] ঘণ্টির বাইজন[৬] না শোনোং মুই কানে মৈষাল রে ॥
অদিয়া অদিয়া[৭] যান মোর মৈষালরে মৈষাল দোত্‌রা বাজেয়া
কোনবা কাথায় হইচেন গঁসা[৮] না দ্যাকেন ফিরিয়া।
তকনে না কইচোং মৈষালরে মৈষাল না যান গোয়ালপাড়া
গোয়ালপাড়ার চেংড়ীগিলা[৭] জানে ধুলা-পড়া মৈষালরে।
তকনে না কইচোং মৈষালরে মৈষাল না যান্ মৈষের ধুরা[৯]
ছল করিয়া কাড়িয়া নিবে হাতের দোত্‌রা মৈষালরে ॥

(রেকর্ড : গোপাল দে)

॥ ২৫ ॥

ওকি অ্যাকবার আসিয়া সোনার চান[১০] মোর যান্ তো দ্যাকিয়ারে ॥
অদিয়া অদিয়া যান্ রে বন্দু ডারা[১১] না হন্ পার
ওহোরে থাউক বোল্ তোর দিবার থুবার[১২] দ্যাকা পাওয়াই ভার ॥
কোড়া কান্দে কুড়ি কান্দে·কান্দে বালিহাঁস
ওহোরে ডাহুকীর কান্দনে মুই ছাড়িনু ভাইয়ের দ্যাশ রে ॥
আইলত্ ফোডে আইল্ কাশিয়া[১৩] দোহ্‌লাতে[১৪] ফোডে হোলা[১৫]
ওহোরে বাপোমাও ব্যাচিয়া খাইচে[১৬] সোয়ামী পাগেলা রে।
লোকে য্যামোন ময়নারে পোষে পিঞ্জিরায় ভরেয়া
ওহোরে সেইমত নারীর যৈবন রাখিচোং বান্দিয়ারে ॥

(কামিনীকুমার রায়। দিনহাটা, কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-সাথী ২-প্রেমগাছ ৩-কোন ৪-মাঝে ৫-এখন কেন ৬-বাজনা ৭-পাশ কাটিয়ে ৮-গোসা বা রাগ ৯-মোষের আস্তানা বা বাথান ১০-চাঁদ ১১-সীমানা ১২-দেওয়া খোওয়ার কথা থাক ১৩-কাশফুল ১৪-নীচু জমিতে ১৫-হোগলা গাছ ১৬-বিয়ে দিয়েছে।

॥ ১ ॥

খ. পুরুষের হতাশা

কইন্যারে ও কইন্যা— ।
ময়া[১] নাগেয়া[২] ছাড়িয়া গেইলেন্ মোক্ ।
অ্যাতোই যদি কইন্যা আছিল্ মনে, এ ময়া নাগাইলেন ক্যানে ॥
তোর কইন্যার পীরিতির আশে বাপো ভাই ছাড়িলাম দ্যাশেরে
পীরিত করিয়া কইন্যা ভাসাইলেন সাগোরে ।[৩]
তোর কইন্যার পীরিতির হানা, ভাসি যাওঁ মুই সাগোরের ফ্যানা
তুমি বিনা ওরে কইন্যা না দ্যাখি কিনারা রে ॥

(নিত্যানন্দ বমণ। দেওয়ানগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)

॥ ২ ॥

কইন্যা মোক ঠকালুঁ[৪]রে— ।
ও তুই মোক কান্দালু,[৫] ওই মত করি তুইও কান্দিবুঁ রে ॥
আশা দিলোং[৬] ভরসারে দিলোং, পীরিতের বাদে[৭]
অ্যালায়[৮] ক্যানে এমন হলুঁ দেকা না দেইস্ মোক্ ।
তোমার পাড়া আমার পাড়া মইদ্যে[৯] তোরষা নদী
মনে কয় দেকিয়া আইসোঙ্ পড়োশী হইল্ বাদী ।
বড়য় আশায় গেলুঁরে কইন্যা তোক্ পাইবার আশে
ওকি আশা দিয়া মোক্ ঠকালুঁ নিদুয়া পাতারে[১০]রে ॥

(রেকড : বিরজা সেন)

॥ ৩ ॥

বাওকুমটা[১১] বাতাস য্যামন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
(ওরে) ঐ মতো মোর গাড়ীর চাকা পন্হে পন্হে ঘুরে রে
ওকি গাড়ীয়াল মুই চলোঁ রাজপন্হেরে ॥
বিয়ানে[১২] উটিয়া[১৩] গরু গাড়ীত্ দিয়া জুড়ি
(ওরে) সোনামালার সোনা বাদে চান্দের দ্যাশে ঘুরি
গাড়ীর চাকা ঘোরে আরও মদ্যে করে আও[১৪]
ওরে ওই মতো কান্দিয়া ওটে আমার সব্বো গাও রে ॥

শব্দার্থ : ১-মায়া ২-লাগিয়ে ৩-সাগরে ৪-ঠকালি ৫-কাঁদালি ৬-আশা দিলে ৭-প্রেমের জন্য ৮-এখন ৯-মধ্যে ১০-ধুধু প্রান্তরে ১১-ঘূর্ণী বাতাস ১২-সকালে ১৩-উঠে ১৪-শব্দ করে ।

দ্যাশ বৈদ্যাশে[১] বেড়াও[২]রে মোর সোনার বাদে
ওরে সেও সোনা অবশেষে ঘরোত্ বসি কান্দেরে
ওকি গাড়ীয়াল মুই চলোঁ রাজপন্থেরে ॥

(রেকর্ড : আব্বাসউদ্দীন)

৭. বিচ্ছেদ (পেয়ে হারানোর বেদনা)

ক. নারীর বেদনা

॥ ১ ॥

অল্প বয়াসে[৩] যার পতি নাইরে—।
সেইও ওভাগিনী[৪] ক্যামনে পরাণ[৫] বান্দে ॥
রাইখ্যা গেইল্ পতি মোরে নলি বাঁশের ডেরা[৬]
বিনা জড়োত্[৭] বাইঙ্গা[৮] পড়ে সেই বাঁশের ডেরা।
সেই ওভাগিনী ক্যামনে পরাণ বান্দে
পাণ কান্দে মোর পরাণ-পতির আগে[৯] ॥
ভাদোর[১০] যাইয়া আশিনো[১১] মাসে ঢাক বাজে ঢ্যান্ঢানা
সেইও দুই মাস গেইল্ কইন্যার কান্দিয়া কান্দিয়া।
অ্যামন কালে[১২] যার পতি নাইরে
সেইও ওভাগিনী ক্যামনে পরাণ বান্দে ॥

(সুশীলা রায়। বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর)

॥ ২ ॥

আহা রে—।
ওরে বাপোর[১৩] দ্যাশের ওরে হংসা[১৪]
তুই কান্দিস ক্যানে বয়ড়ার গচে পড়িয়া রে।
বাপোর দ্যাশের হংসা তুই, চিটুল-বিদুয়া[১৫] মুই
বাপোর দ্যাশের হংসা তুরা[১৬] মুইও হলুঁ সোয়ামী হারা রে ॥
হংসা হাত ধরোঙ তোর পাওও ধরোং তোরে
উড়্যা উড়্যা উড়্যা হংসা উড়্যা যাও রে
আকাশে পাংখা মেল্যা বাপের দ্যাশোত চলিয়া যাও রে
আহা রে, ওরে বাপোর দ্যাশের ওরে হংসা ॥

(বাঙলা পল্লীগীতি। পৃঃ ২১৯)

শব্দার্থঃ ১-দেশ বিদেশে ২-বেড়াই ৩-বয়সে ৪-অভাগিনী ৫-প্রাণ ৬-কাঁচা বাঁশের খড় ৭-বিনা ঝড়ে ৮-ভেঙ্গে ৯-প্রিয়তম পতির জন্যে ১০-ভাদ্র মাস ১১-আশ্বিন মাস ১২-এই সময়ে ১৩-বাবার ১৪-হাঁস ১৫-বালবিধবা ১৬-তোরা।

॥ ৩ ॥

উগ্‌লা[১] কাথা[২] কন্‌না[৩], নেবা আগুন[৪] মোর জ্বালান না।
বিয়ার সোয়ামী মোর গেইচে রে মরিয়া ॥
উগলা কাথা কইলে পরে, দুই নয়ানের জল ঝরে
মোনের আগুন মোর ওটে[৫]রে জ্বলিয়া ॥
বিয়ার আইতে[৬] মোর পাণ পতি সেইদিন হইতে গেইচে-ছাড়ি
অ্যাক্‌না[৭] ঘরোত্‌ থাকোং পড়িয়া ॥
বাপো মাও মোর নিদয়া, ট্যাকার নোবে[৮] দিচে বিয়া
অবোদ[৯] একটা পাগোলক্‌[১০] ধরিয়া।
আশ পড়োশী গেরামবাসী সগ্‌গলে[১১] দ্যাকে[১২] মোর দিকি[১৩]
সাতেবা[১৪] কার মুই যাঁওরে বারেয়া[১৫] ॥
নিড়ানি ছাড়িয়া রে চল পুত্‌রা[১৬] বারেয়া যাইরে
মাচের মইদে হইল ধুত্‌রা সগাইর[১৭] মইদে পুত্‌রা
ক্যামন করিয়া থাকিস মাওই বুড়া তাওঐটাক লাগিয়া ॥
(লোক সাহিত্য : ১১ খণ্ড। ১৩৮২, পৃঃ ১১)

॥ ৪ ॥

ওহোরে বাবার দ্যাশের ওরে কুরুয়া[১৮]—।
আজি ক্যানে কান্দেন তোমরা চন্দন বৃক্ষের ডালেরে।
ওরে ফানুসিয়া[১৯] পঙ্খী তুই চিটুল-বিদুয়া[২০] মুই রে
আজি কিবা খপর[২১] ওরে কইওরে আমার আগে॥
ওরে লোহা দিয়া বান্দিনু ঘর,সুকের কতা[২২]তোমার না সইল ভররে
সেও ঘর মোর ভাঙ্গিয়া নিল্‌ ঝড়ে।
ওরে যৈবনেতে কাদো মাকি[২৩] অ্যাকেলা পালঙ্কে থাকি
বালুশ ভেজে মোর চার পোর[২৪] আইত[২৫], কান্দি কান্দি রে ॥
কুরুয়া পাও[২৬] ধরোং তোরে কুরুয়া মাতা[২৭] খান মোরে
কুরুয়া দোহাই তোমারে আজি উড়ান উড়ান কুরুয়া উড়ান ওরে।

শব্দার্থ : ১-এইসব ২-কথা ৩-বলবেন না ৪-নেভা আগুন (মনের জ্বালা) ৫-ওঠে ৬-বিয়ের রাতে ৭-একলা ৮-লোভে ৯-অবোধ ১০-পাগলকে ১১-সবাই ১২-দেখে ১৩-আমার দিকে ১৪-কারো-সঙ্গে ১৫-বের হয়ে ১৬-বেয়াইয়ের অন্য ছেলে ১৭-সকলের ১৮-কুরুর পাখী ১৯-ফানুসের মত ২০-বালবিধবা ২১-খবর ২২-সুখের কথা ২৩-কাদা মেখে ২৪-চারপ্রহর ২৫-রাত ২৬-পা ২৭-মাথা।

ওরে আকাশেতে পাংখা মেলি বাবার দ্যাশে তোমরা যান চলি
মুই নারীটা চায়ারে[১] থাকিম[২] দুরে
বাবার কাছে যায়া[৩] কইবেন তোমরা
আজি আগুন জ্বলে তোমার বেটির কোপালে[৪] রে ॥

(অনিতা রায় । কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

ওকি হায় বিদি—আজি ঘটগচায়[৫] নাই পড়ে কালি
তাতে বিদি মোক্ করিলে আড়ি[৬]
আজি স্বামীধন মরিয়া আই মোর, আই মোর সে হইল হানি
আজি তিনদিন হা'তে[৭] পড়ে আই মোর, আই মোর সে চোক্ষের পানি ।
আজি স্বামীধন মরি আই মোর আই মোর সে হইল দুঃখ্
আজি নদীর কাছারের[৮] মত আই মোর ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক
আজি কাণ্ঠা বাশের[৯] ঝুরিঝুরি[১০] আজি তাইতে লাগে ঘুণ
আর কতয়দিন[১১] রহিম[১২] আই মুই, আই এ যৈবনের গুণ ।

(রেকর্ড : যজ্ঞেশ্বর বর্মণ)

॥ ৬ ॥

কিসের মোর আন্দোন[১৩]কিসের মোর বাড়ন কিসের মোর হলুদি বাটা
মোর পাণোনাথ[১৪] অইন্যের[১৫] বাড়ী যায় মোরে আঙ্গিনায় দিয়া ঘাটা[১৬] ॥
ও পাণ-সজনী[১৭]কার আগে কব দুস্কের[১৮] কতা[১৯] ॥
আর যদি দ্যাকোং আর যদি শোনোং অইন্যজনের সঙ্গে কতা
এ হেনা যৈবন সাগরে ভসিামো[২০] পাষাণে ভাঙ্গিমো মাতা[২১] ।
মোর বন্দু গান গায় মাতা তুল্যা না চায়
মুই নারী যাঁও জলের ঘাটে
থম্‌কি থম্‌কি হাটোং[২২] চোউক্ষে[২৩] ইশিরা করোং, তবু বন্দু না দ্যাখে মোরে
ওকি হায়রে বন্দু পাগোল হইতে পারে ॥

শব্দার্থ ঃ ১-চেয়ে ২-থাকবো ৩-যেয়ে ৪-পোড়া কপাল ৫-পূজার স্থানে গাছপূজা প্রসঙ্গে ৬-বিধবা ৭-হতে ৮-পাড় ৯-কাঁচাবাঁশের ১০-ঘুণে খাওয়া ১১-কতদিন ১২-সহ্য করবো ১৩-রাঁধা ১৪-প্রাণনাথ বা স্বামী ১৫-অন্যজনের ১৬-আমার সামনে দিয়ে ১৭-প্রাণের সখী ১৮-দুঃখের কথা ২০-ভাসাবো ২১-মাথা ২২-থমকে থমকে ২৩-চোখে ।

নিন্দের[১] আলিসে[২] হাত পড়ে বালুশে[৩] মনে করোং বুজি বন্দু আচে
চ্যাতন[৪] হয়্যা দ্যাখোং[৫] বন্দু নাই বোগলত[৬]
বুকখানা মোর ছ্যাং ছ্যাঙ্গা[৭] হইচে[৮]।
ও পাণ সজনী কার আগে কব দুক্কের কতা ॥

(দময়ন্তী বর্মণ। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ৭ ॥

গতর[৯]না উটে[১০] কইন্যার চরণ না চলে
অঙ্গের বসন বিজিল[১১] তার নয়ানের[১২] জলে।
ভাদোর মাসে য্যামন দ্যাওয়া[১৩] বরিষণ করে
সেই ওভাগোনীর[১৪] পইরন[১৫] পাটের শাড়ীত্ নয়ানুজল ঝরে ॥
আউলাইন্যা[১৬] মাতার[১৭] ক্যাশ[১৮] উড়্যা উড়্যা[১৯] পড়ে
এমন সময় যদি কাউয়া[২০] কা কা কইরবার লাগে[২১]
ক্যামনে সেই কইন্যায় জীবন কাটে ॥
আহারে দারুণ-বিদি[২২] কেন হইলা বাম[২৩]
য্যান বিনা দোষে পিতা বনে দিলা রাম
(আহারে) বিয়ার আইতে[২৪] যেবা নারী হইল কাঁচা-আড়ি[২৫]
সেই ওভাগোনী ক্যামনে পরাণ বান্দে ॥

(কৃষ্ণা রায়। কোচবিহার)

॥ ৮ ॥

নদীর পাড়ের কুরুয়া[২৬]রে মোর জামের গচের[২৭] শুয়া[২৮]
আজি ক্যানে কান্দেন অমন করি চোউক্ষের[২৯] জল ফ্যালায়া[৩০]।
কোড়ারে[৩১] মুইও কান্দোং চিটুল-বিদুয়া[৩২] হয়্যা ॥
ঢাল-কাউয়াটার[৩৩] কান্দন শুনি মনের আগুন জ্বলে
পতি যে মোর মরি গেইচে[৩৪] আদর নাই মোর ঘরে
কোড়ারে মুইও কান্দোং চিটুল-বিদুয়া হয়্যা ॥

শব্দার্থঃ ১-নিদ্রার বা ঘুমের ২-ঘোরে ৩-বালিশে ৪-জেগে দেখি ৫-দেখি ৬-কাছে ৭-খালি মনে হয়েছে ৮-হয়েছে ৯-শরীর ১০-ওঠে ১১-ভিজিল ১২-চোখের ১৩-মেঘ ১৪-অভাগিনীর ১৫-পরা ১৬-এলোমেলো ১৭-মাথার ১৮-চুল (কেশ) ১৯-উড়ে উড়ে ২০-কাক ২১-কা কা রবে ডাকে ২২-নিদারুণ বিধাতা ২৩-বিমুখ ২৪-রাত্রে ২৫-বাল বিধবা ২৬-কুরুর পাখী ২৭-গাছের ২৮-শুকপাখী ২৯-চোখের ৩০-ফেলে ৩১-পানিকৌড়ি ৩২-বাল-বিধবা ৩৩-দাঁড় কাক ৩৪-মরে গেছে।

জলে কান্দে জল-কোড়ারে কুড়িক্[১] নাগিয়া
মুই আবাগী[২] কান্দোং বসি পতিক্[৩] হারেয়া[৪]।
না মিটিল্ মোনের আশা ভাঙ্গিল্‌রে মোদের ভাসা[৫]
আজি ভরা যৈবন ক্যামনে রাখিম্ পতিক্ হারেয়া রে ॥

(কৃষ্ণকান্ত রায়বর্মণ। কোচবিহার)

॥ ৯ ॥

সোনার নাইয়া ভাবের বন্দু[৬] মোর গেইচে[৭] ছাড়িয়া রে ॥
কি বাণ মারিলে নারীর হৃদয় চায়া রে ॥
যে নাইয়ায় করিবে পার তাক্[৮] দিম্[৯] মোর গালার[১০] হার
এলুয়া কাশিয়ার ফুল, নদী হইল হুলুস্থুল রে।
যদি বন্দুর নাগাইল পাঁও[১১] ছাড়িয়া দিবার নও রে[১২]
সোনার নাইয়া, ভাবের বন্দু মোর গেইচে ছাড়িয়া রে ॥
আগে যদি জাইন্‌তাম[১৩] বন্দু যাইমেন[১৪] ছাড়িয়া রে
কোলার ছাওয়া[১৫] ফ্যালায়া দিয়া আকিতাম[১৬] বান্দিয়া রে ॥

(লোকসাহিত্য: ১১ খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ১৩৮২। পৃঃ ১২৪-২৫)

॥ ১০ ॥

সোনার বন্দুরে আশার ভাসা[১৭] না ভাঙ্গেন মোরে[১৮]।
আগে যদি জাইন্‌তাম রে বন্দু যাইমেন ছাড়িয়া
মাতার বেণী দিয়া বন্দু আকিতাম বান্দিয়া রে ॥
থোপের বাঁশ[১৯] কাটিয়ারে বন্দু নদীত্ দিলু বানা[২০]
তুই বন্দু আইস্‌পার[২১] বলি[২২] নাইয়োর[২৩] করলু মানা রে ॥
সোনার বন্দুরে আশার ভাসা না ভাঙ্গেন মোরে ॥

(লোকসাহিত্য: ১১ খণ্ড বাংলা একাডেমী, ১৩৮২। পৃঃ ১২৫)

॥ ১১ ॥

বাণিজ বাণিজ করেন পাণ সাদুরে
সাদু বাণিজের কিবা রীতি—।

শব্দার্থঃ ১-স্ত্রী পানকৌড়ির জন্যে ২-অভাগিনী ৩-পতিকে ৪-হারিয়ে ৫-বাসা (বা সংসার) ৬-প্রেমের বন্ধু ৭-গিয়েছে ৮-তাকে ৯-দেবো ১০-গলার ১১-হাতের কাছে পাই ১২-দেবনা ১৩-জানতাম ১৪-যাবেন ১৫-কোলের ছেলে ১৬-রাখতাম ১৭-বাসা ১৮-আমার ১৯-ঝাড়ের বাঁশ ২০-বেড়া বা বাঁধ ২১-আসবে ২২-বলে ২৩-বাবার বাড়ী থেকে কেউ নিতে আসা।

যকোন না ছিলাম মুই বাপোমাওয়ের[১] ঘরে
তকনে[২] নাই যান্ সাদু দূরের বাণিজে।
যকোন আসিয়া হইলাম সোয়ামীর যোগ্যমান
সাদু একন আসিচে তোমার বৈদ্যাশে গমন ॥
না কান্দেন না কান্দেন নীলা ভাঙ্গিবে অসের[৩] গালা[৪]
এইবার বাণিজে আসি নীলা সোনায় বান্দাইম্ গালা ॥
তমরা যাইমেন দূরদ্যাশে আমাক লাগে ধান্দা[৫]
তোমার হাতের ছিরি আংটি[৬] থুইয়া যান্ বোল্ বান্দা।
তোমার হাতের আংটি খামো না নিমো না পড়শীক বিলামো[৭]
যেইদিনা উটিবে[৮] সাদুর কাথা আংটি হস্তে করিয়া নেমো ॥
না কান্দেন না কান্দেন নীলা ভাঙ্গিবে অসের গালা
এইবার বাণিজে আসি নীলা সোনায় বান্দাইম্ গালা ॥

(সোনামুখী শেখ। কোচবিহার)

॥ ১২ ॥

ওরে নদীর নাম কচুয়া মাচ মারে মাচুয়া[৯]
মুই নারীটা দিচোং ছাকাপারা[১০]।
সোনার বন্দু আদিয়া যায় কাপড় ধুইতে হব দ্যাকা
শালবাড়ীর তলে তলে মুই যাং যবুনার জলে
শালময়না উড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে।
ওরে শালময়না তোতার ছাও[১১] পুষিলে করে আও[১২]
ওরে শাল ময়না এমনি ময়া জানে।
মরিয়া গেইচে বিয়ার সোয়ামী ময়া নাই ছাড়িচেরে[১৩]
চল দিদি যাই ময়না পাড়িবারে ॥

(নারায়ণ রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-বাবা মায়ের ২-তখন ৩-রসের ৪-গলা ৫-ভয় হয় ৬-শ্রী আংটি (বিয়ের সময় দেওয়া আশীর্বাদী আংটি) ৭-পড়শীকে বিলিয়ে দেবো না ৮-উঠবে ৯-মাছুয়া বা জেলে ১০-উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি ১১-তোতা বা ময়না পাখীর বাচ্চা ১২-শব্দ করে বা ডাকে ১৩-মায়া ছাড়েনি।

খ. পুরুষের বেদনা

॥ ১ ॥

আজি ঐলা[১] কাথা[২] মন[৩] পড়েসে[৪] গে আবো[৫]
ওকি আবো নোদারী[৬] মরিয়া।
ছয়োমাস ভোরিয়া[৭] কান্দোং দোহলাত্[৮] বসিয়া॥
অ্যাকেতে গিস্সানির[৯] দিন আছত্ থাকিয়া[১০]
কায়[১১] আবো হুকাবে পাংখা[১২] বোগলত্[১৩] বসিয়া।
ওকি ক্যারাত্ কি কুরুত্[১৪] করিয়া॥
(আবো) গসা হোইয়া[১৫] না খাঁও ভাত, আছত্ থাকিয়া
কায় আরো ডাকাবে আবো কি কইরোঁ কি কইরোঁ[১৬] বলিয়া।
(আবো) সগায়[১৭] যাছে[১৮] গমীরা[১৯] দেইখ্বার[২০] মাইয়া ধরিয়া[২১]
মোরও আছে নাল ফতাটা[২২] কায় যাইবে পিন্দিয়া।
ওকি আবো নোদারী মরিয়া॥

(দিপালী বহুনীয়া। কোচবিহার)

৮. পরকীয়া প্রেম

ক নারীর প্রেম

॥ ১ ॥

অ্যাকেতো ছয়ফ্যাস[২৩] গুজরাণ[২৪] বুড়া শাউড়ী[২৫]
ঘরের ননোদির জবালায় হাটখোলায় বাড়ী।
বাইরা বাড়ীত্ থাকিয়ারে বন্দু ঈশিরা করেন কি
কোলার ছাওয়ার[২৬] জইন্যে[২৭] বন্দু বার্য়াবার[২৮] না প্যারি॥
গসা না হন সোনার বন্দু ফিরি যাও বাড়ী॥
অ্যাকেতো দোত্রার ডাং মোন হইল মোর উচাটন
পানিয়ামরা[২৯]আচে ঘরোত্ ক্যামন করি হবো দেকা বন্দুর সাতে[৩০]

শব্দার্থ : ১-ঐকথা ২-কথা ৩-মনে ৪-পড়ে যায় ৫-দিদিমা/ঠাকুমা ৬-নতুন বউ ৭-ধরে ৮-নীচু জমিতে ৯-গরমকাল ১০-বসে থাকা ১১-কে আর ১২-পাখা নাড়বে ১৩-পাশে ১৪ পাখা নাড়ানোর শব্দ ১৫-রাগ হওয়ায় ১৬-কি করছো কি করছো ১৭-সকলে ১৮-যাচ্ছে ১৯-গম্ভীরা পালাগান ২০-দেখতে ২১-প্রেয়সী বা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ২২-লালরঙের ফোতা (মেয়েদের কাপড়) ২৩-অভাবী ২৪-দিন গুজরাণ করা ২৫-বুড়ী শাশুড়ী ২৬-কোলের ছেলে ২৭-জন্যে ২৮-বের হতে ২৯-মরার স্বামী ৩০-বন্ধুর সঙ্গে।

নিন্দের আলিশে হাত পড়ে বালুশে
নিশা আইতে[১] ওহে পতি ডাকাই তোমাকে
অসিয়া[২] বন্দু আইস্‌চে[৩] পতি ঘরের পাচোতে[৪] ॥
(লোকসাহিত্য ; ১১ খণ্ড। বাংলা একাডেমী. পৃঃ ১৯)

॥ ২ ॥

এ পাড়ে আমার বাড়ী ও পাড়ে বন্দুর বাড়ী
মাঝোত্‌ ক্ষিরোল নদীর খেওয়া[৫] ॥
ওরে কাজল ভোমরা গরুর আথোয়াল[৬]রে
মোর কোলায়[৭] কান্দে বাচ্চা ছাওয়াল[৮] ।
ওরে কাজল ভোমরার গুন গুন স্বরে
আউলাইল্‌[৯] মোন্‌ মোর ঘরে ঘরে
ওরে অকুল যমুনার জলে কায় দিবে খেওয়া রে ॥
না জানোং মুই সাতার না জানোং মুই পহরিবার[১০]
না জানোং মুই ভুরা বাইবার[১১]
ওরে অগম দরিয়ার[১২] মাজে[১৩] কায় দিবে খেয়ারে
মুই নারী ক্যামনে দিম্‌ পাড়ি রে ॥
(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী. কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

ওরে সোনার দ্যাওরা[১৪]—
তোক্‌ দিয়া মোর নাই হয় ক্যানরে বিয়া ॥
তোর দ্যাওরার য্যামন মোনের আশা
মোনের মত বান্দো মুই ঢালুয়া-খোপা[১৫]
তোরে মোরে দারুণ বিদি[১৬] ক্যান নাই নেকে জোড়া[১৭] ॥
ওরে সোনার দ্যাওরা—
থুইয়া আসেক মোক্‌ বাপো মাওয়ের[১৮] ঘরে
বাপো মাওয়ের ঘরে যামোঁ বারাবানি[১৯] ভাত খামোঁ
যদি দ্যাওরা তুই থাকোং আজি[২০]
কিবা কইরবে তোমার দ্যাশের কাজী[২১] ॥

শব্দার্থঃ ১-গভীর রাতে ২-রসিক ৩-এসেছে ৪-ঘরের পাশে ৫-ক্ষিরোল নদীর ব্যবধান ৬-রাখাল ৭-কোলে ৮-ছোট ছেলে ৯-এলোমেলো ১০-পার হওয়া ১১-কলাগাছের ভেলা চালাতে ১২-গভীর নদী ১৩-মাঝে ১৪-দেওর (স্বামীর ছোট ভাই) ১৫-বড় খোঁপা ১৬-নিষ্ঠুর বিধাতা ১৭-মিলনের কথা লেখেনি ১৮-বাবা মায়ের ১৯-ধান ভেনে ২০-রাজী ২১-বিচারক।

তোর দ্যাওরার পীরিতির এমনি গুণ কোলের ছাওয়া মুই করচোঁ খুন
অ্যাতই যদি দ্যাওরা ছিল মনে, ক্যানে পেম করিলে আমার সনে
ওরে সোনার দ্যাওরা তোক্ দিয়া নাই হয় ক্যানরে বিয়া ॥
(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাংলা একাডেমী, পৃঃ ৩৯)

॥ ৪ ॥

তর বাবা ঘুমাইলরে, ছাওয়া[১] তুইওরে ঘুমাও
ঝরি পড়ে ইমিরেঝিমি[২] মলেয়ায় বয় বাও[৩]।
ঘরের পাচোত্[৪] সোনা বন্দু ভিজিয়া মরে গাও ॥
শিমুল কাটের[৫] কপাটখানি হালাইলে হালে[৬]
আইস্তে আইস্তে[৭] মারো মজা ননদি জাগে।
ডাইনে আচে খোকার বাপো বামে শুতিচি[৮] আমি
আইস্তে আইস্তে আইসেন বন্দু ট্যার না পায়[৯] সোয়ামী ॥
মাজিয়ায়[১০] আচে তুষের আগুন আইস্তে ফ্যালান পাও
শিতানে[১১] আচে পানের বাটা চুন তাকিয়া খাও[১২]।
ডাইনে আচে পাণের সোয়ামী বামে চাপিয়া বইসো
শিতানে আচে বান্দা হুক্কা পানি ফ্যালেয়া[১৩] খাইও ॥
আহারে সোনার বন্দু আইস্তে আইসো ঘরে
তোমার জইন্যে কোমল পাণ সদাই ক্যামন করে।
ছিকায়[১৪] আচে দুদের খোরা[১৫] পাড়িয়া নিয়া খাও
বাইরায় ক্যান বন্দু ভিজিয়া মরেন গাও ॥
(ত্রিফুল্ল রায়। কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

দ্যাওয়ার ঝরি[১৬] আইলোরে ও তার পড়ে টোপা টোপা[১৭]
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু[১৮] ঝাড়িয়া বান্দোং খোপা।

শব্দার্থ: ১-ছেলে ২-বৃষ্টি পড়ার শব্দ ৩-জোরে বাতাস উঠেছে ৪-ঘরের পিছনে ৫-শিমুল কাঠের ৬-ধাক্কা দিলে হেলে পড়ে ৭-আস্তে আস্তে ৮-শুয়েছি ৯-টের না পায় ১০-মেঝেতে ১১-মাথার কাছে ১২-চুন লাগিয়ে ১৩-জল বদল করে ১৪-পাটের তৈরী জিনিষপত্র রাখার ব্যবস্থা ১৫-দুধের ক্ষীর ১৬-বৃষ্টি ১৭-টপ্ টপ করে ফোটা পড়া ১৮-অল্প বয়সের পুরুষ।

ঝরি পড়ে টাপুর টুপুর ঘুমি বয়ে বাও[১]
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু দেইক্‌পে[২] শাউড়ি[৩] মাও।
ঝরি পড়ে টাপুর টুপুর দ্যাওয়ায় নিলে আড়ি[৪]
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু ঘুরিয়া যাও মুই বাড়ী ॥
ঝরি পড়ে টাপুর টুপুর জলোত্‌ আইলাম আমি
খানকায়[৫] থাকিয়া মোরে দ্যাখিবে[৬] সোয়ামী।
ঝরি পড়ে টাপুর টুপুর দ্যাওয়া ওটে[৭] চিল্‌কি[৮]
বাইর থাকিয়া মোরে দ্যাকিবে ননোদি রে ॥

(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী, পৃঃ ৭৭)

॥ ৬ ॥

ওরে ভাটি দ্যাশের[৯] আরে কবিরাজ—
ভাল্‌ করিয়া দ্যাকেন[১০] ছাওয়ালের[১১] নাড়ী।
আমাবইস্যা[১২] মঙ্গলবার সেইদিনা গেচনু[১৩] ভারার[১৪] পার
চমকি উঠিল্‌ ছাওয়ার গাও কিবা ওগো হইল্‌ রে।
যদি ছাওয়াল ভালয়[১৫] হয়, তোমার সাতে কবিরাজ গেনু[১৬]হয়
ভাল করিয়া দ্যাকেন ছাওয়ালের নাড়ী ॥
যদি পীরিত করিতে চান বাড়ীর বোগলত[১৭] বাড়ী ন্যান[১৮]রে
ভাল্‌ করিয়া দ্যাকেন ছাওয়ালের নাড়ী ॥

(পূর্ণিমা রায়কত্‌। জলপাইগুড়ি)

॥ ৭ ॥

ও শ্যামের বাঁশীরে, কুলের বা'র কল্লে আমারে ॥
কালা ছোঁড়া বাউরীওলা[১৯] না জানে পীরিতির খেলা
ও শ্যামের বাঁশীরে কুলের বার কল্লে আমারে ॥
যকন[২০] আমি আন্দোনে[২১] বসি তকোন[২২] কালা বাজান বাঁশী
ও বাঁশীরে ভিজা কাট[২৩]চোউকায়[২৪] দিয়া ধুমার[২৫] ছলে কান্দি।

শব্দার্থ : ১-বাতাসে ঘূর্ণি ওঠা ২-দেখবে ৩-শবাশুড়ি ৪-মেঘ বাদ সেধেছে ৫-বাইরের ঘরে ৬-দেখবে ৭-বিদ্যুৎ ৮-চমকে ওঠে ৯-নীচু অঞ্চলের ১০-দেখবেন ১১-ছেলের ১২-অমাবস্যা ১৩-গিয়েছিলাম ১৪-নীচু জমিতে ১৫-ভালো বা সুস্থ হয় ১৬-গেলে হয় ১৭-নিকটে ১৮-করেন ১৯-বাবরী চুল ওয়ালা ২০-যখন ২১-রন্ধনে বা রান্নায় ২২-তখন ২৩-ভিজা কাঠ ২৪-চুলায় বা উনুনে ২৫-ধুঁয়ো।

বাঁশীতে ভরেয়া[১] মদ্ন বার করো কুলবদ্ন[২]
বাঁশীতে ভরেয়া গান বার করো সোনার চান্ ॥
ও শ্যামের বাঁশীরে কুলের বার কল্লে আমারে ॥
(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী, পৃঃ ১১৯-২০)

॥ ৮ ॥

ডাকাইত[৩] বন্দুয়া তুই মোরে—।
শিশুকালে আম কুড়্যাচি[৪] আমের তলে ভাসা
ওরে কাড়িয়া লইতেন অঞ্চলের আম দেহাত্[৫] দিয়া ঢেসা[৬]।
ফুল মইদ্যে সরিষার ফুল অসমতীর[৭] শোবা[৮]
ওরে সেইনা ফুল তুলিয়া আমার ভরেয়া দিতেন খোপা রে ॥
ডাকাইত বন্দুয়া তোমার হস্তে মোহন বাশী[৯]
ওরে বাশীতে ভরেয়া গান এলাও বাজান বাশী রে ॥
শিশুকালে শিশুরে কাথা ঐটা সব্বোনাশা
ওরে সেই নালসে[১০] এলাও আইসেন পুরাতে মনের আশা ॥
ডাকাইত সাজিয়ারে তমরা[১১] মোন কইরাচেন[১২] চুরি
তোমার বাশীর সুরে সুরে মোন মোর বেড়ায় ঘুরি।
না বাজান বাশীরে বন্দু দেহাত আগুন ধরে
ওরে আমিতো পরার নারী[১৩] বন্দী পরার ঘরে রে ॥
(রেকর্ড : সুরেন দাস)

॥ ৯ ॥

দিনের দ্যাওরা[১৪] আইতের[১৫] বন্দুরে মাল্লে জাতিকুল
তোক্ দ্যাকিয়া[১৬] মোর যোবতীর[১৭] মোন হইল্রে আকুল।
আইতে আইতে যান বন্দুরে চোরা কয় মাইন্সে[১৮]
তোর সাতে পেম করিয়া মরনু রে হাতাশে[১৯] ॥
যকন তুমি যান বন্দুরে এ গানো গাইয়া
বিচিনাত্[২০] শুতি শোনো গান কান্দোঁয়ে বইসা[২১]

শব্দার্থ ঃ ১-ভরে ২-কুলবধূ ৩-ডাকাত ৪-আম কুড়িয়েছি ৫-গায়ে ৬-ধাক্কা দিয়ে ৭-রসমতী ৮-শোবা ৯-মোহন বাঁশী ১০-লোভে ১১-তুমি ১২-করেছেন ১৩-পরের স্ত্রী ১৪-দেবর ১৫-রাত্রের ১৬-দেখে ১৭-যুবতীর ১৮-মানুষে ১৯-হতাশায় ২০-বিছানায় ২১-বসে।

পাংখা যদি দিত বন্দুরে ওভাগোনীর[১] গায়
উড়্যা যায়া[২] পন্নু না হয় তোক্ বন্দুয়ার পায় ॥
ঘরের বরি[৩] পানিয়ামরা রে বাইরায়[৪] ননোদি
তারো চায়া অদিক বরি গেরামের আশ-পড়োশেী রে[৫] ।
দ্যাকা কইরবার না পাঁও বন্দুরে আতি নিশা ভাগে[৬]
চউক[৭] মুজলে[৮] দ্যাকোং বন্দুরে আইসেনো[৯] সপোনে[১০] রে ॥
(আজিমুদ্দিন মিঞা। শিলিগুড়ি)

॥ ১০ ॥

নউতোন[১১] পাতিলে রে[১২] এ ভাত আন্দিনু[১৩] রে
সেও ভাত মোর বন্দুয়ায় নাই রে খায় ।
বন্দুক্ ভাত আনিয়া দিতে দ্যাকিল্[১৪] পানিয়ামরায়[১৫] রে
ভয়ে সোনা বন্দু মোর কাইণ্ডা দিয়া[১৬] দোড়ায়[১৭] ॥
মনেরো হরষে রে বিচিনা পাতিনু রে
সোনা বন্দু মোর না আইল্ ক্যানে ।
আগে খায়া[১৮] পানিয়ামরায় বিচিনা দখল করিচে রে
ভয়ে সোনা বন্দু মোর না আইসে বোগোলে[১৯] ॥
ওরে তুই বন্দু আইসবার বইলে[২০] পান সাজানু বাটাতে
আরে স্যাও[২১] পান মোর শুকিয়া হইল্ ঝুনা
পানিয়ামরায় খাইচেরে পান এ গালো ভরেয়া রে
সোনা বন্দু মোর না আইসে ক্যানে ॥
ওরে তুই বন্দু আইসবার বইলে দোর খুলি আকিলাম[২২] রে
সারা আইত[২৩] দোর মোর উদাও[২৪] পড়্যা রইচে
ওরে বন্দুয়ার বদোলে[২৫] চোরায়[২৬] সাদ মিটাইচে রে[২৭]
সোনা বন্দু মোর না আইসে ক্যানে ॥
(লোকসাহিত্য ; ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী, । পৃঃ ৮২-৮৩)

শব্দার্থ ঃ ১-অভাগিনী ২-উড়ে গিয়ে ৩-ঘরের শত্রু ৪-বাইরে ৫-পাড়া-পড়শী ৬-নিশি রাত্রে ৭-চোখ ৮-বুজলে ৯-আসেন ১০-স্বপ্নে ১১-নতুন ১২-হাঁড়িতে ১৩-রাঁধলাম ১৪-দেখলো ১৫-ঘাটের মড়া (এক্ষেত্রে স্বামীকে বোঝানো হচ্ছে) ১৬-বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ১৭-দৌড়ায় ১৮-খেয়ে ১৯-কাছে ২০-আসবে বলে ২১-সেই ২২-রেখেছিলাম ২৩-সারারাত ২৪-উদোম (উন্মুক্ত) ২৫-পরিবর্তে ২৬-চোর ২৭-মনের সুখে কাজ সেরেছে বা চুরি করেছে ।

॥ ১১ ॥

ওকি অ্যাকবার আসিয়া মোর সোনার চান যান্ তো দ্যাকিয়ারে
ও চান্ আমার বাড়ী তোমার বাড়ী মইদ্যে[১] হীরা নদী
কি যামোঁ তোমার বাড়ীরে চান পাংখা[২] নাই দ্যান বিদি[৩]।
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী মইদ্যে ব্যাতের আড়া[৪]
কি যামোঁ তোমার বাড়ীরে চান্ আমার কোপাল পুড়া[৫] ॥
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী একেত[৬] আঙ্গিনা
আত হালে মোর সোনার চান দিন হইলে ভাগিনা ॥

(উত্তমকুমার দাশ। কোচবিহার)

॥ ১২ ॥

ভাগিনা ধান মাড়িয়া দে।
মরুচের[৭] গচগিলা[৮] থাগড়াথুগড়ী[৯] ফল বিস্তর ধরে
হাত বাড়াইতে মরুচের গচ হালিয়া দুলিয়া পড়ে।
ভাগিনা গেইসে[১০] অনেক দূরে খপরে[১১] না পাই
আনত পুরন্তির পাত্[১২] নেকিয়া[১৩] পাটাই।
সগার ভাগিনা ধান বানে আতারে পাতারে[১৪]
মোর ভাগিনা ধান বানে মোর মন্দির ঘরে ॥[১৫]

(বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড। আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৭৬)

খ. পরনারীর প্রতি পুরুষের প্রেম

॥ ১ ॥

আশা দিয়া সকীন[১৬] চেংড়ীটা[১৭] ভাসাইলেন গাঙের[১৮] জলে
ইয়ার বিচার কইরবে এশ্বোরে।[১৯]
তারিক[২০] দিয়া সকীন চেংড়ীটা বসিয়া থাকোঁ[২১] গচ তলে
সারা আইতে[২২] মোক্ মশায় কামড়াইচে ॥

শব্দার্থ: ১-মধ্যে ২-পাখা ৩-বিধাতা ৪-বেতের বেড়া ৫-কপাল পোড়া বা অভাগী ৬-একইতো ৭-লংকা ৮-গাছগুলি ৯-থোকা থোকা অনেক ফল ধরে ১০-গিয়েছে ১১-খবর ১২-পাতা ১৩-লিখে ১৪-যেখানে সেখানে ১৫-আমার মনের অন্তরে ১৬-সৌখীন ১৭-অল্পবয়সী নারী ১৮-নদীর ১৯-ঈশ্বরে ২০-তারিখ বা সময় ২১-থাকি ২২-সারারাতে।

ওরে চোকীদার[১] হাকে চেংড়ীটা ককোন[২] যোন মোক্ ধরে
তোর ছোড[৩] জায়ে মোক্ মাচ ফ্যালেয়া[৪] দিচে ॥
আঁদারি[৫] আইতে সকীন চেংড়ীটা বসিয়া থাকোঁ গচ তলে
তোর সোয়ামী মোর গাওয়োত্[৬] মাগরা[৭] দিয়াচে।

ওরে তোর কাতাতে[৮] সকীন চেংড়ীটা বসিয়া অনু[৯] চুয়ার[১০] পাড়োতে
তোর ননোদি মোর গাওয়োত্ মুতিচে।
খোরের পড়োত্[১১] কচুবনে সারা আইতে মশা পোন্ পোন্ করে
সারা আইতে ব্যাঙে মোর গাওয়োত্ মুতিচে।

থাকো থাকো পাণের বন্দু থাকো পরাণ বান্দিয়া
অ্যাক্‌দিনে মোনের আশা দিইম্[১২] পুরা কর্যা।
যিদিন পানিয়ামরা না থাইক্‌পে[১৩] বাড়ীত্
সিদিন[১৪] আসিয়া বন্দু মোর শোতেন[১৫] বোগলত্ ॥[১৬]

(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী, পৃঃ ১৫-১৬)

॥ ২ ॥

বুকের[১৭] ওপোর[১৮] কিগো মামী বুকের ওপোর কি।
তোমার মামা কইরবে[১৯] খেলা নাটিম[২০] কুন্দেছি[২১]।
ভাগিনা গাবী দোয়া[২২] দে ॥

নাবীর[২৩] কাচোত্ কিগো মামী, নাবীর কাচোত্ কি
তোমার মামা কইরবে খেলা ডিগি[২৪] দিয়াচি।
তোমার ডিগিত্ কত পানী মামী নামিয়া দেকি।
আমার ডিগিত্ ভাগিনা কিসোত্[২৫] নামিবার চাও
চৈত-বৈশাক[২৬] মাসে ভাগিনা চউড়ে[২৭] না পাও থাও[২৮] ॥

আশ পড়শের গাই[২৯] দোয়াইতে নামী নিচোং আনা আনা
তোমার গাই দোয়াইতে মামী খোলোং[৩০] কানের সোনা।
আমার বাড়ীত্ যাইও ভাগিনা বইসপার দিমোঁ পিড়া
জল খাবার দিমোঁ ভাগিনা শালী ধাইন্যের[৩১] চিড়া।

শব্দার্থ : ১-চৌকীদার ২-কখন ৩-ছোট ৪-ফেলে ৫-অন্ধকার ৬-গায়ে ৭-থুথু ৮-কথায় ৯-রইলাম ১০-কুয়ার ১১-দেওয়ালের ধারে ১২-দেবো ১৩-থাকবে ১৪-সেইদিন ১৫-শোবেন ১৬-কাছে ১৭-বুকের ১৮-উপর ১৯-করতে ২০-লাট্টু ২১-তৈরী করেছি ২২-দুইয়ে ২৩-নাভি ২৪-দিঘী ২৫-কিজন্য ২৬-চৈত্র-বৈশাখ ২৭-লম্বা বাঁশা ২৮-ঠাঁই ২৯-গাভী ৩০-খুলবো ৩১-ধানের।

না চাও[১] তোমার খই মামী না চাও[২] ট্যাঙা দই[১]
বুকের ওপোর নাউ[২] ধরিচে তাক্ পাইলে নই ॥
(লোক সাহিত্য : ১১ খণ্ড । বাঙলা একাডেমী : । পৃঃ ১০৬-১০৭)

৯. দুঃখের পাঁচালী

॥ ১ ॥

ও মোর কাগারে[৩] কাগা—।
কি খপর আনিচোং বাপোর দ্যাশের রে।
দুষ্টা বাপোর এমন মোন, তিনশো টাকা নিয়ারে পণ
ব্যাচেয়া খাইলেন মোক্[৪] দূরান্তর দ্যাশেরে ॥
তোর কাগার ধরোং পাও, কি খপর কাগা কয়া যাও
ও মোর কাগারে ক্যামন আচে মোর অবাগী মাও[৫]।
আজি পাষাণ বুকেতে ধরি দূর দ্যাশে আছোং পড়ি রে
ও মোর কাগারে নারীর মোন মোর ঝুরে[৬] আতি-দিনেরে[৭] ॥
তুই মোর পরাণের কাগা শুনেক ক্যানে মোর কাথা
মায়ের আগে কবেন[৮] যায়া মোর দুস্কের[৯] কাথা
আজি রবে মাও মোর কান্দিয়া কাটিয়া রে ॥

(তারিণী বিশ্বাস। কোচবিহার)

॥ ২ ॥

কিও বাবার দ্যাশের ঘুঘু রে[১০]—।
না ডাকিস না ডাকিস ভরা দুফুরে[১১]।
মোর ভাতের থালা বাড়ায় জ্বালারে, তোর না ডাকে ও ঘুঘু রে ॥
ছোডকালে দেখছোং ঘুঘু তোক্ হামার বাড়ীর পাছোত্[১২]
যৈবনেতে আসিলু ঘুঘু আমার পাছোত্ পাছোত্
তুই বুজি বাসিস বালো[১৩] ও সোনা ঘুঘুরে।
মোর বৈনের[১৪] দ্যাশে যাওরে ঘুঘু তিস্তা নদীর পাড়ে
কন্ যায়া মোর দুস্কের কাথা ও সোনা ঘুঘু রে ॥

(সঞ্চিতা। রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা)

শব্দার্থ : ১-জমানো দই ২-লাউ ৩-কাক ৪-আমার বিয়ে দিয়েছে ৫-মা ৬-কাঁদে ৭-রাতদিনে ৮-বলবেন ৯-দুঃখের ১০-ঘুঘুপাখী ১১-দুপুরে ১২-পিছনে ১৩-ভালবাসিস ১৪-বোনের।

॥ ৩ ॥

পরথম[১] অঘাণ মাসে নয়া হেম্‌তি ধান
কাঁও[২] কাটে কাঁও ঝাড়ে কাঁও করে নবান।
যার ঘরে আছে অন্ন আঁধে বাড়ে খায়
যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখে চায় ॥
কয় মাস গেইল্‌ কইন্যার না পুরিল আশ
লহরী যৈবন ধরি নামিল পোষ মাস।
পৌষ না মাসোতে কইন্যা খায় আলোয়া
ভাল্‌ ভাল্‌ ফুটিয়াছে কেকেটি[৩] কমলা।
কেকেটি কমলা ফুটে আরো ফুটে মালী
তরুণ বয়াসের ব্যালা[৪] ছাড়িল সোয়ামী ॥

(দময়ন্তী রায়। জলপাইগুড়ি)

১০. প্রিয়জনের বিপদাশঙ্কা

॥ ১ ॥

আরে ও মোর জোঙ্গলিয়া[৫] হাতীরে, মিনতি করুঁরে তরে
ওভাগোনীটাক্‌[৬] আড়ি না করিস এ ভোব সইংসারে ॥
হাতীরে মোর সোয়ামী কাঞ্চা সোনা
তোর পিঠিত্‌ চাড়বারে[৭] জানে না।
হাতীরে পায়ে ধরি মিনতি করি কহিচুঁরে[৮] তরে
মোর সোয়ামীটাক্‌ আখিসরে হাতী আদরে যতনে ॥
হাতীরে মস্ত বড় দেহাটা[৯] তর সয়না তর মশার কামড়
ছট্‌ফটায়া[১০] না নিগাইস্‌[১১] সোয়ামীটাক্‌ মোর ॥

(কুমার নিধিনারায়ণ। কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-প্রথম ২-কেউ ৩-কেওড়াফুল ৪-অল্প বয়সে ৫-জঙ্গলের ৬-অভাগিনীকে ৭-চড়তে ৮-বলছিরে ৯-দেহ ১০-ছটফট করে ১১-নিস্‌ না (বা মেরে ফেলিস না)।

॥ ২ ॥

ও পাণ সাদুরে[১] —।

তমরা[২] যাইমেন[৩] সাদু দুরেদ্যাশে না করেন সাদু পরার আশ রে[৪]

আপন হস্তে আন্দিয়া[৫] খান ভাতরে।

কোছার[৬] কড়ি সাদু না করেন ব্যয়

পরার নারী সাদু আপন লয় রে[৭]

পরনারী সাদু পরধন[৮], আস্তায় ঘাটে দরশন

পরার নারী সাদু তমার বদিবে[৯] পরাণ রে ॥

পুবিয়া[১০] পচ্চিয়া[১১] বাও খোপা[১২] চায়া সাদু বান্দেন নাও

উচা চায়া দেন ওরে চৌকা[১৩]।

ডারি মাজি[১৪] পরার ব্যাটা খাইতে নাইতে সাদু না দ্যান খোটা

মারিবে তমাকু নাওয়ের গুরায়[১৫] বান্দিয়া রে ॥

শওরের[১৬] নারীগণ, হরিয়া নিবে সাদু ধনজন রে

বন্দী কইরবে তমাক ঐনা কারাগারে রে।

অণ্ট অলংকার সাদু খুল্যা[১৭] লও হাসি মনে সাদু বিদায় দ্যাও

আমি যাইমু সাদু বাপো মাওয়ের ঘরে রে ॥

(বিরজা সেন। কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

ও মোর সাদুরে সাদু।

অল্প বয়াসে[১৮] সাদু বাণিজে যান, গহীন নদীর সাদু ভরা বান রে

সাদু দ্যাওয়া দেকিয়া ছাড়েন উজান নাও রে ॥

পুবালো[১৯] পইছালা[২০] বাও খোপা চায়া সাদু বান্দেন নাও

ডারি মাজি সাদু রাইখেন সাবধানে রে।

ডারি মাজি পরার পুত[২১] খাইতে দিতে সাদু না দ্যান দুখ

সাদু মাইরবে তোমাকু সাদু বৈঠার আগাল দিয়া

মাইরেবে তোমাকু সাদু নাওয়ের গুরাত্ বান্দিয়া রে ॥

শব্দার্থ : ১-প্রাণ সাধুরে ২-তোমরা ৩-যাবেন ৪-আশা ৫-রেঁধে ৬-গচ্ছিত টাকা ৭-নয় ৮-পরের সামগ্রী ৯-বধ করবে ১০-পুবালী ১১-পশ্চিমা ১২-খাঁড়ি ১৩-পাহারা ১৪-মাঝি ১৫-নৌকার গলুইয়ের ১৬-শহরের ১৭-খুলে ১৮-অল্প বয়সে ১৯-পুবালী ২০-পশ্চিমা ২১-ছেলে।

যেইদিগে[১] সাদু বালুচর সেইদিগে সাদু বান্দেন ঘর
আপন হস্তে সাদু আন্দিয়া খান ভাত রে।
যেইদিগে সাদু সাউদের ম্যালা[২] সেইদিগে সাদু বান্দেন ভেলা
আপন হস্তে সাদু করেন ব্যাচাকিনা[৩] রে ॥
কোছের কড়ি সাদু না করেন ব্যয় পরনারী সাদু আপন নোয়ায়
পরনারী সাদু বদিবে পরাণ রে ॥

(নীহার বড়ুয়া। গৌরীপুর)

॥ ৪ ॥

ছয়ো মাসের কড়াল[৪] করি, গেইল্ মাউত[৫] মোর শিকার-বাড়ী[৬]
ছয়োমাস গেইল্ পুরি[৭] মোর মাউত না আইলো ঘুরি[৮]।
ও মোর হাতীরে—॥
যাইবার ব্যালা গেইল্ সাতে[৯] একা কেন হাতী দওরোজাতে[১০]
কওরে হাতী মোর মাউতের খপর[৮] রে।
যদি মাউত মোর আইসে ভালে[১১] পাটা[১২] দিম্ মুই হালে হালে[১৩]
আরোয় দিইম্ মুই উড়ানি পারেয়া রে[১৪] ॥

(সুরেন্দ্রনাথ বসুনীয়া। কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

বিদ্যাশেতে যাইছেন পতিধন ভালা করিয়া থাইকেন[১৫]
এই নারীর মনের কাথা মনে তোমার রাইখেন[১৬] পতিহে।
না চাই না চাই আর কোন না চাই
অইন্য[১৭] কাথা মনোত্ না দ্যান ঠাই
পতি সতীনারীর ধন, তাহো[১৮] কিবা জানেন পতিহে ॥

শব্দার্থ: ১-যেদিকে ২-সওদাগরের ভীড় ৩-কেনা বেচা ৪-অঙ্গীকার করে ৫-মাহুত ৬-হাতী ধরার আস্তানা ৭-পূরণ হল বা পার হল ৮-ফিরে আসেনি ৯-সঙ্গে ১০-দরজাতে ১১-ভালভাবে ফিরে আসে ১২-পাঁঠা ১৩-জোড়ায় জোড়ায় ১৪-পায়রা ১৫-থাকবেন ১৬-রাখবেন ১৭-অন্য ১৮-তা বা সে কথা।

দোষবা করি গুনবা করি[১] নেহাই[২] তমার পর
তুমি বিনা আমার পতি শূইন্য[৩] এইনা ঘর পতিহে ॥
না থাউক না থাউক[৪] না থাউক ট্যাহা কড়ি
পতি বিনা কি করিম্ শূইন্য ঘর বাড়ী
কোপালে থাইক্‌লে[৫] হইবে ট্যাহা তাহো কিবা মানেন[৬] পতিহে ॥

(নীলকমল রায়প্রধান। জামালদহ, কোচবিহার)

১১. পরদুঃখে কাতরতা

॥ ১ ॥

ওরে পচ্চিয়া[৭] বাতাস তুই বড়য়[৮] নিদয়ারে
সোনার চাঁদোক্[৯] দিচোং[১০] বড়য় দুখ
নিদুয়া পাতারে[১১] ক্ষ্যাত[১২] ঘাসোত[১৩] ভরিচে[১৪]রে
না নিড়াইলে[১৫] মনোত্ নাইরে সুক[১৬] ॥
ঐনা ক্ষ্যাত্ নিড়ায় চাঁদ মোর ভরা দোপেপারে[১৭]
অইদে[১৮] সোনার পুড়ি গেইচে[১৯] মুক[২০]রে
তিয়াসে[২১] ফাটেবা চান্দের ছাতি ফাটিচেরে
ঘরের ভিত্‌রে[২২] ক্যামনে বান্দি[২৩] রাখোং[২৪] বুক রে ॥

(দময়ন্তী বর্মণ। কোচবিহার)

॥ ২ ॥

বারো মাসে বারো ফল গেইল্ মাউত হস্তী বাড়ীরে[২৫] ।
ওরে কান্দে মাউত হস্তীর পিঠিত্ চড়ি রে ॥
চৈতো বৈশাকের অইদ পিঠি-ফাটি[২৬] পড়ে ঘাম
কান্দে মাউত হস্তীর কাঙ্গে[২৭] চড়ি রে ॥
যার মাথাত পাগুড়ি সেই করুক চাখিরি
চাখিরির নাইরে বাপো ভাই, কান্দে মাউত হস্তীর কাঙ্গে চড়িরে ॥

(তারিণী রায়। জলপাইগুড়ি)

শব্দার্থ : ১-দোষই কবি আর গুণই করি ২-হইনা ৩-শূন্য ৪-না থাকলো ৫-থাকলে ৬-স্বীকার করেন ৭-পশ্চিমা ৮-বড়ই ৯-চাঁদকে ১০-দিয়েছো ১১-ধূ ধূ প্রান্তরে ১২-খেত (জমি) ১৩ ঘাসে ১৪-ভরে গেছে ১৫-পরিষ্কার না করলে ১৬-সুখ ১৭-দুপুরে ১৮-রোদে ১৯-গিয়াছে ২০-খম, ২১-তৃষ্ণায় ২২-ভিতরে ২৩-বেঁধে ২৪-রাখবো ২৫-হাতী ধরার আস্তানায় ২৬-পিঠে বেয়ে ২৭-কাঁধে।

দেবার্চনা

॥ ১ ॥

[গম্ভীরা গানে শিব]

ধর ধর দিস্‌না ছাড়্যা[১], লিয়া[২] চলেক্[৩] সঙ্গে কর্যা
ওই বুড়হাটা[৪] দিলেক বড়ই দুখ হে।
ধান বুইন্‌লে[৫] দ্যায় না পানি ওই বুড়হাটা বড়ই শনি
সদায় রাখে মুদের[৬] প্যাটে ভুখ হে ॥
দামড়ার উপর[৭] চড়্যা বুড়হা কুচুনীপাড়ায়[৮] বেড়ায় ঘুর্যা
ঠাট্‌কুহারা[৯] জানেই কত তুক হে ॥

(বাংলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব, । পৃঃ ১১)

॥ ২ ॥

[গোরক্ষনাথ বা শিবের পূজা]

শিব নাচোরে শিব সাজে কানাকড়িটা ঝুমুর বাজে
বাজেকো ঝুমুর বাজেকো তাল, এই গিরিটা জগত ভাল্ ॥
জগতেরও রুনিঝুনি সোনারে বান্দিনু টুনি
সোনারে খেরুয়া বাশ অ্যাক দুয়ারে ন্যাখো হাঁস।
হাঁস ন্যাখো জোরে জোরে[১০] পারোয়া[১১] ন্যাখো পঁচিশ জোর
পারোয়ার ডাক শুন্যা গিরির বউটা না খায় গুয়া
খায় গুয়াতে না খায় চুন পান্হা ভাতে ঢালে নুন[১২]।

(রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল—চারুচন্দ্র সান্যাল । পৃঃ ১৫৫)

॥ ৩ ॥

[তিস্তাবুড়ি বা ভেদেই খেলার গান]

মুটি মুটি[১৩] মোর বথুয়া শাক, দোনো হাতে মোর তেত্‌লির পাত[১৪]
হেনা মোর ক্যাশ।
হি বাড়ীর[১৫] চ্যাংরেলা[১৬] ছ্যাবেলা[১৭],
খেচিয়া ধোরলে[১৮] মোর গাওয়ের পাছরা[১৯]
নিন্দের ছোয়া[২০] মোর ভোক নালাছে[২১]
হেনা মোর ক্যাশ।

(চারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ি)

শব্দার্থঃ ১-ছেড়ে ২-নিয়ে ৩-চল ৪-বুড়াটা ৫-বুনলে (রোয়া হলে) ৬-মোদের ৭-ষাঁড়ের উপর ৮-কোচদের পাড়ায় ৯-হাসি মস্করা ১০-জোড়ায় জোড়ায় ১১-পায়রা ১২-লবন ১৩-মুঠোমুঠো ১৪-তেঁতুলের পাতা ১৫-ওই বাড়ীর ১৬-অল্পবয়সী ১৭-ছেলে ১৮-টেনে ধরলো ১৯-গায়ের বস্ত্র ২০-ঘুমন্ত ছেলে ২১-ঘুম থেকে জেগে উঠে ক্ষুধায় কাঁদছে।

॥ ৪ ॥

[তিস্তাবুড়ির পূজা]

নাহি জল নাহি থল নাহি তারা আকাশ
এই ছিরি মন্তর[১] না হয় ছিরিকো বিলাস।
বাম হাতে চম্পা কেলা ডাহিনে শঙ্ক[২] জল
তাহার উপর আসন কৈল ধর্ম নিরঞ্জন।

পূবে না বন্দিব পীর পাকাম্বর দক্ষিণে বন্দিব মা কালীর চরণ
পচিমে[৩] বন্দিব সমুন্দ্র[৪] সাগর উত্তরে বন্দিব পাণপবাহিনী[৫] বুড়ি ॥
আকাশে পন্নাম[৬] করি আকাশের কামিনী
পাতালে পন্নাম করি পাতাল বাসুকী ॥

শূন্যের মইদ্যে[৭] পন্নাম করি বুড়াবুড়ি
পাটের[৮] মইদ্যে পন্নাম করি মহামায়ী তিস্তাবুড়ি ॥

(চারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ি)

॥ ৫ ॥

[বিষহরা গান]

ডাণ্টা ডাখালী তমান দিয়া ঢালি
মোনের তিকে[৯] বুড়া গেইল্ দূর তীখে[১০] চলি।
বুঝায় অবুঝায় নাগাইল্ জেরপেটা জেরপেটি
কাহ ধূতি ছিড়ি সাজাইল কোপীনী।
কাহ মাতাত্[১১] বান্দিল্ মাইয়ার পাটানী ॥[১২]

কাহ ঘর ছাড়িল্ গারাস্তি ছাড়িল্
চড়চড়েয়া ফুটানিত্ বাইগোন ভাজিল্
কারো ঘরের মাইয়া ছাড়িল্ হাড়ি
কারো ভাতার হলেক নয়া ব্যাপারী ॥

(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড। বাঙলা একাডেমী পৃঃ ৫৪-৫৫)

॥ ৬ ॥

[বনদেবীর বন্দনা]

লাম লাম[১৩] বনদুর্গা ষাইট্ শ্যাওড়ার নীচে
ক্যাম্‌নে লামবাম[১৪] আমি শাড়ী নাই মোর অঙ্গে
সইয়ারে[১৫] পাঠেয়া[১৬] দিচি নমি বাজারের শ'রে[১৭]

শব্দার্থ : ১-শ্রীমন্ত্র ২-শঙ্খ ৩-পশ্চিমে ৪-সমুদ্র ৫-প্রাণপ্রবাহিনী ৬-প্রণাম ৭-মধ্যে ৮-ছবির মধ্যে ৯-দুঃখে ১০-তীর্থে ১১-মাথায় ১২-মেয়েদের বস্ত্র ১৩-নামো নামো ১৪-নামবো ১৫-বান্ধবীকে ১৬-পাঠিয়ে ১৭-শহরে।

শাড়ী যে আইনচে সইয়া সিপরায় বইলে
লাম লাম বনদুর্গা যাইট শ্যাওড়ার নীচে ॥
(উপেন্দ্রনাথ বর্মণ। জলপাইগুড়ি)

খ. বিয়ের গান

॥ ১ ॥

[বরণ ডালা ও গায় হলুদের গান]

কুলার জনম কোণ্টে[১] কুলার জনম কোণ্টে
কুলার জনম হাড়ি ভাইয়ের বাড়ী গে।
ঘোটের[২] জনম কোণ্টে ঘোটের জনম কোণ্টে
ঘোটের জনম কুমহার ভাইয়ের বাড়ীগে।
হোলদির[৩] জনম কোণ্টে হোলদির জনম কোণ্টে
হোলদির জনম গিরোস ভাইয়ের বাড়ীগে।
(চারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ি)

॥ ২ ॥

[জল ভরার গান]

ও জল বরি[৪] আনে রে—।
আগে যায় ঐ কইন্যার আবো[৫] পিছে কইন্যার মাও
তার পাছোত্ ঘোম্ঘর[৬] দেওয়া সমন্দীয়া[৭] যাও।
এক চোকে[৮] কান্দে মাওএ[৯], আর এক চোকে জল বরে
আইচে পাছোত্ মাসি পিসী উলু জোকার দেয় রে।
কইন্যার মাও জল বরায় সাক্ষী[১০] থাকিল্ ওই নদী ॥
চাইর কলার চাইর মারোয়া[১১] চাইলন বাতি[১২] সব সাজাইচে
আইজকা রাইতোত্ এলায় গাবুরা আসিবে রে।
বরক্ বরণ করেরে বৈরাতী[১৩] বিয়ার আয়জন[১৪] করিচে
বাপ মাও তর সউগ[১৫] হইল্ পর রে ॥
না কান্দেন না কান্দেন মাও মুঞি যামো পরার ঘর রে[১৬] ॥
(সুনীতা রায়বর্মন। কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-কোথায় ২-ঘটের ৩-হলুদের ৪-ভরে ৫-দিদিমা/ঠাকুমা ৬-ঘোমটা দেওয়া ৭-জা ৮-চোখে ৯-মায়ে ১০-সাক্ষী ১১-মুড়া বা কোণা ১২-বরণডালা ১৩-পুরোহিত ১৪-আয়োজন ১৫-সকলে ১৬-পরের ঘর বা শ্বশুরবাড়ী।

॥ ৩ ॥

[কন্যা বিদায়ের গান]

ওকি ও গাড়ীয়াল ভাই —।
ওরে আইস্তে[১] বোলান[২] গাড়ীয়াল ও ধেরে[৩] বোলান গাড়ী
ওরে এক নজর দ্যাকিয়া লই মোর দয়াল বাপো বাড়ী ॥
মাও কান্দে ওই দুয়ার ধরি
বাপো কান্দে ওরে ছোট বুইনটাক[৪] কোলাত্ করি
মাইঝুলা[৫] বুনে কান্দে ওরে আছারি পিছারি।
ওরে আইস্তে বোলান গাড়ী গাড়ীয়াল ওরে ধেরে বোলান গাড়ী ॥

(তরু রায়কত। জলপাইগুড়ি)

গ. জীবনের ছবি

॥ ১ ॥

আই মোক্ ব্যাচেয়া খা[৬] হে খা—।
গাবুর[৭] হয়্যা মন বান্দিয়া না যায়রে রওয়া[৮] ॥
ওহো একদিনা[৯] আয়না দিয়া দেকিচোং[১০] মোর দেহাটা[১১]
পরার ছাওয়া[১২] কোলাত্ নিলে অকুমারীর[১৩] শোবায় না[১৪]।
ওহো মরিরে একে বয়াসের চেংড়ীগুলার সগার[১৫] হইল্ বিয়া
উয়ার ছাওয়া[১৬] খেলিচে—।
ডোমনারে ডুমনী ইল্সা মাচের[১৭] ঘুমনী
শাক খায় সুক্যাতি খায় ডোমনা ব্যাটা কোণ্টে লুকায়।
মোর যদি বিয়াও হইলে হয়
মোর ছাওয়া ডোমনা ডুমনী খেলা খেলিলে হয়।
ওহো মরিরে একে বয়াসের চেংড়ীগুলার সগারে হইল বিয়া
উয়ার ছাওয়া খেলিচে—।
ইচন বীচন ধাপড়ী বীচন তাক্ খ্যায়া গেইল্ মঙ্গোল পাটান[১৮]
মঙ্গোল পাটান লড়ে চড়ে আয় কুমুরী ঠেস্ক ধরে।

শব্দার্থ : ১-আস্তে ২-চালান ৩-ধীরে ৪-বোনটাকে ৫-মেজো বোন ৬-বিয়ে দেওয়া ৭-যুবতী ৮-থাকা ৯-একদিন ১০-দেখলাম ১১-শরীর ১২-পরের ছেলে ১৩-কুমারীর ১৪-শোভা পায় না ১৫-সবার ১৬-ওদের ছেলে ১৭-মাছের ১৮-মোগল-পাঠান।

অ্যালেলে ব্যালেলে ফুল তুলিবার গেইল্ রে
ফুলের ম্যাণ্ডলা পাত্ ছিরিআংটি কর হাত রে ॥
(গঙ্গাধর দাস । কোচবিহার)

॥ ২ ॥

ওকি বাইদন[১]— ।
কি দেইখ্যা বা দিলারে বিয়া মোর
আমার শ্বশুর বাড়ীত্ চালে নাইরে ছোন[২] ।
পিন্দনে[৩] নাই কাপড় বাইদন ঘরে নাই খাওন ॥
গোণের[৪] সোয়ামী মোরে মাইর্যা[৫] করে খুন
আমারে যে ধরবো আইস্যা[৬] নাইরে এমন জন ।
ছোড ব্যালা মা মরিল বাপের উদিশ[৭] নাই
পাইল্যা পুইল্যা[৮] যমরাজার ঠায়[৯] সইপ্যা দিলা তাই ।
ওকি বাইদন, কি দেইখ্যা বা দিলারে বিয়া মোর ॥
সুকুমারী রায়বর্মন । কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

ওমা মুই যাঁও মরিয়া— ।
কাইন্[১০] কইরবার চাইচেরে[১১] মোক্ পাকন্[১২] দাড়িয়া[১৩] ।
ও তার নামা দাড়ির[১৪] ফরকোন্[১৫] দ্যাকিয়া দিদি মোক নাগে ভয়
হারা[১৬] আইত[১৭] পোয়াঁও[১৮] দিদি গচা[১৯] নাগেয়া[২০] ।
যম গোলামের মাতাত্ ন্যাদাও[২১] বুড়াক্ দ্যাকিয়া
ওমা মুই যাও মরিয়া ॥
(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড । বাঙলা একাডেমী, পৃ: ৩৫)

॥ ৪ ॥

কিও সোন্দরী— ।
বাইরাও[২২] তোর দ্যাকোঁ চন্দ্র মুকরে[২৩] ।

শব্দার্থঃ ১-ভাইধন ২-ঘর ছাওয়ার একরকম ঘাস ৩-পরার ৪-গুণের (ব্যাঙ্গার্থে) ৫-মেরে ৬-ধরবে এসে ৭-ঠিকানা ৮-লালন পালন করে ৯-মৃত্যু-দূতের কাছে ১০-বিয়ে ১১-চেয়েছে ১২-পাকা ১৩-দাড়িওয়ালা ১৪-লম্বা দাড়ি ১৫-কেতা ১৬-সারা ১৭-রাত ১৮-কাটাই ১৯-মাটির গাছপ্রদীপ ২০-লাগিয়ে ২১-লাথি মারি ২২-বের হও ২৩-চাঁদপানা মুখ ।

হাজার ট্যাকার বালি নক্টাকার[১] তুই সোন্দরী
পাঁচশো ট্যাকা খরচ করিয়া, তোক সোন্দরীক করচোঁ বিয়া
কিসের দুস্কেরে তুই নাইয়োর[২] যাবার চাইসো[৩] রে ॥
নাইয়োরেতে যাবু তুই যত কামকাজ করিমু মুই
তোর বদলক্[৪] তোর বইনোক্[৫] থুইয়া যাও।
নাইয়োরেতে যাবার আশে চাউল বানিয়া থুচিস্[৬] বইসে
হাউসের[৭] নাইয়োর যাওয়ায় না হইবে রে ॥

(সুরপতি মোহান্ত। পশ্চিম দিনাজপুর)

॥ ৫ ॥

ক্যান্‌রে বাপোই[৮] দিলা বিয়ারে পাঁচশো ট্যাহা নিয়া[৯]।
সারা জনম গেইল্ বুড়ার পাকা চুল বাচিয়া[১০] ॥
শ্বউর[১১] পাইলোঁ[১২] ভালয় মুই শাউড়ী[১৩] পাইলোঁ ভালয়
ঘরের সোয়ামী আমার না শোতে বোগলত্ ॥
ছোড এ্যাককান[১৪] ডিঙ্গি আছিল্ মোর শ্বউর বাড়ী
সেই ডিঙ্গিত্ চড়ি আমি দেমোঁ সাগর পাড়ি।
আগের ডিঙ্গি য্যামন ত্যামোন পাচের ডিঙ্গি মন্দ
মাজের[১৫] ডিঙ্গিত্ চড়ি আমি যামোঁ বাপোর বাড়ীত্ রে ॥

(সুবলা রায়বর্মণ। কোচবিহার)

॥ ৬ ॥

নাইয়োর ছাড়িয়া দ্যাও মোর বন্দু নাইয়োর ছাড়িয়া দ্যাও
এইবার নাইয়োর গেইলে কাইল[১৬] থুইয়া যাইবে মাও।
দাদায় আইচে তোমার বাড়ীত বন্দু নাইয়ার ছাড়িয়া দ্যাও
একনজর দেকিয়া[১৭] আসি দয়াল বাপো মাও রে ॥
ক্যামন তোমার কাথা[১৮] হে বন্দু ক্যামন তোমার হিয়া
শরমে মরিয়া যামোঁ গালায় দড়ি দিয়া।

শব্দার্থঃ ১-লক্ষ টাকা ২-বাপের বাড়ী যাওয়া ৩-চেয়েছো ৪-পরিবর্তে ৫-বোনকে ৬-রেখেছিস ৭-শখের/খুশীর ৮-বাবা ৯-রাজবংশী সমাজে মেয়ে বিয়ে দিলে মেয়ের বাবা টাকা নেয় পণ হিসাবে ১০-বেছে বেছে ১১-শ্বশুর ১২-পেয়েছি ১৩-শ্বাশুড়ী ১৪-ছোট একখানা ১৫-মাঝের ১৬-আগামী কাল ১৭-দেখে ১৮-কথা।

অইন্য গুরু পিতা হে মাতা বন্দু জন্মদাতা বাপে
কাণ্ডা সোনা বুড়ার আশ রে মাইরবে অবিশাপে[১] ॥

(রমনীকান্ত রায়বর্মন । কোচবিহার)

॥ ৭ ॥

ও তুই ট্যাহা[২] খায়া তোর মুখত্ বাঁধিনি[৩] ডাঙগাও
তোর গে আই—
এমন বেসালেন[৪] জায়োই[৫] আর মুলুকত[৬] বরগে[৭] পালেন নাই।
ট্যাহার নোভাত্ বুড়াক্ দিলেন
আর মুলুকত্ বর নাই পালেন
মোক কি সগায় কয় বুড়ি আই[৮] ॥

(গঙ্গাচরণ বিশ্বাস । কোচবিহার)

॥ ৮ ॥

[ঘুম পাড়ানী গান বা ছোয়া ভুরকা]

আয় নিন্[৯] আয় চক্ষুত্ ভাসা[১০] বান্দে
কোণ্ঠেকার হাবাতের নিন্ চক্ষুত্ ভাসা বান্দে
হাটের নিন্ পথের নিন্ চক্ষুত্ ভাসা বান্দে।

(চারুচন্দ্র সান্যাল । জলপাইগুড়ি)

লোকাচার

॥ ১ ॥

[অশুভ আত্মা বিতাড়নের গান বা বিরুয়া গীত]

বাহমতী ফির মোর ময়লানী, বাহমতী ছাড় মোর ময়লানী গে।
অঘোনা[১১] মাসোতে[১২] পাকে নয়া ধান
কাঁহো কাটে কাহোঁ বান্দে[১৩] কাহোঁতে নবান।
পুষুণা[১৪] মাসোতে পুষুণা পরব
যেই নারীর পুরুষ নাই মিছা তার গৈরব ॥

(রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল—চারুচন্দ্র সান্যাল, । পৃ; ১৫৮)

শব্দার্থ : ১-অভিশাপে ২-টাকা ৩-মুখে কুলুপ এঁটেছিস ৪-জোগাড় করলেন ৫-জামাই ৬-মুল্লুকে ৭-বর ৮-সকলে আমাকে বুড়ি দিদিমা বলে ডাকে ৯-নিদ্রা ১০-ধাসা ১১-অগ্রহায়ণ ১২-মাসে ১৩-বাঁধে ১৪-পৌষ।

॥ ২ ॥

[হুদুম দ্যাও-এর গান]

হিল্‌হিলাচে[১] কমরটা[২] মোর শিরশিরাচে[৩] গাও[৪]
কোণ্টেখানায়[৫] গেইলে এলা[৬] হুদুমার দ্যাকা পাও।
পাটানিখানি[৭] পইড়ছে[৮] খস্যা[৯], হুদুমা দ্যাকা দ্যাওহে আস্যা
আইসেক্ রে[১০] হুদুমা দ্যাওয়া আসিয়া অসিয়া[১১] ॥
তোরবাদে[১২] মুই থাকোংরে[১৩] বসিয়া ॥
ডিংসালি ডিংসালি কমরটা[১৪], তাতে নাই মোর ভাতারটা[১৫]
করয় বা কি মুই[১৬] কায়বা কং[১৭], কোন্টে গেইলে দ্যাকা হও
দ্যাকা হইলে দেহাটা জুড়ায় ॥

(বাংলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব, ১৯৬৬। পৃ: ৬৬)

॥ ৩ ॥

[হুদুম দ্যাও-এর গান]

দ্যাওয়া[১৮] তুই বরষেক রে—
গাও ধুইয়া মুই বাড়ী নাগি[১৯] যাঁও।
হ্যারিয়া কোণাত্ য্যামোন দ্যাওয়া দুরদুরায়
ওই মতো চেংড়ীগিলা ফেরকেটায়
আষাঢ় মাস শান[২০] মাস দ্যাওযাত্ না হয় পানি
তিনদিনকার শড়ার[২১] গায়ত[২২] পইচে ছানি[২৩]
দ্যাওয়া তুই বরষেক রে
গাও ধুইয়া মুই বাড়ী নাগি যাঁও ॥

(রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল—চারুচন্দ্র সান্যাল, । পৃ: ১৫৮)

শব্দার্থঃ ১-হিলহিল করছে, অনুভূতির অভিব্যক্তি ২-কোমর ৩-শিরশির করছে বা শিহরণ জাগছে ৪-শরীর ৫-কোথায় ৬-এখন ৭-মেয়েদের বস্ত্র ৮-পড়ছে ৯-খ'সে ১০-এসোরে ১১-রঙে রসে ১২-তোর জন্য ১৩-আছি ১৪-মোটা-সোটা কোমর ১৫-স্বামী ১৬-কিবা করি ১৭-কাকেই বা বলি ১৮-মেঘ ১৯-বাড়ীর দিকে ২০-শুকনো ২১-সকরী বা এঁটো বাসন ২২-গায়ে ২৩-জলের অভাবে বাসন মাজা সম্ভব না হওয়ায় এঁটো শুকিয়ে যাওয়া, (নিগূঢ় অর্থে মেয়েদের তিনদিন মাসিকের পরও স্নান না করতে পারার কথা বলা হয়েছে)।

॥ ৪ ॥

[ম্যাগারাণীর গান]

হ্যাদে লো বুন ম্যাগারাণী
হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানি
ছোড ভুঁইতে চিনাচিনানি,[১] বড় ভুঁইতে হাঁটু পানি ।।
ম্যাগারাণীর ঘরখানি পাথরের মাজে
হেই বিষ্টি নাইমলো ঝাঁকে ঝাঁকে
কাইল্যা ম্যাগা ধইল্যা ম্যাগা বাড়ীত্ আছোনি ॥
গোলায় আচে বীজধান বুনতে পারোনি ॥

(বাংলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব, । পৃ: ৬৭)

॥ ৫ ॥

[বৃষ্টি কামনায় জারী গান]

আল্লা ম্যাগ[২] দে আল্লা পানি দে ।
পানি না নামাইয়া বুজি পরাণ করলা সারা
ও ম্যাগ আইসো পানি হইয়া রে ॥
জোয়াল লইয়া বলদ লইয়া আকুল হইয়া রই
আসমানেতে ছায়া দ্যাখি কই
ও আল্লা ম্যাগ দে, আল্লা পানি দেরে তুই ॥
আসমান হইল টুডাফুডা[৩] জমিন হইল ফাডা[৪]
ম্যাগা রাজায় ঘুমায়[৫] রইচে[৬] পানি দিবে কেডা[৭]
ও আল্লা ম্যাগ দে আল্লা পানি দেরে তুই ॥

(নির্মলেন্দু চৌধুরী । কলকাতা)

॥ ৬ ॥

[মেচেনী বা ভেদেই খেলার গান]

আসিয়া লখমী[৮] মাও মোর দুয়ারে দিবেন পাও
আগোবাড়ী[৯] শুদ্[১০] কইর‍্যাছে বেদুর[১১] বাপো মাও ।
ক্যানরে পুতা[১২] ঘন পাও[১৩] লখমী সরস্বতী এইটে ঘর ন্যাও
সইঞ্জে[১৪] হইলে সইঞ্জে বাতি, বিহানে ছানছর[১৫] ॥

(চারুচন্দ্র সান্যাল । জলপাইগুড়ি)

শব্দার্থ : ১-গুঁড়ি গুঁড়ি ২-মেঘ ৩-ছেঁড়া ফাটা ৪-ফাটা ৫-ঘুমিয়ে ৬-রয়েছে ৭-কে ৮-লক্ষ্মী ৯-বাড়ীর সামনের দিক বা উঠোন ১০-শুদ্ধ ১১-বিধুর ১২-নাতি ১৩-বারে বারে আসা যাওয়া করছো ১৪-সন্ধ্যে ১৫-সকালে ঝাঁট দিয়ে ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে ।

॥ ৭ ॥

[সাধ ভক্ষণের গান]

লাউলোর বউলো সাধশিত, কি কি খাইতে সাদ[১]।
ঘরের ছাইঙ্গা[২] কাজলা সীম তাই খাইতে সাদ।
বড়ইর[৩] অম্বল কর্ক'রা ভাত
লেম্বু পাতা আর পান্তা ভাত।

(চারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ি)

১৩. অর্থনৈতিক অবস্থা

॥ ১ ॥

আজি ধার করিয়া করলু[৪] বিহো[৫] —
আজি মাহাজনটা[৬] পাক পাড়েছে[৭] ওহো গে নোদারী[৮]
বড়য় দুস্কে[৯] যাছু গে চাখিরি[১০] ॥
আজি আজার[১১] জ্বালা বিষম জ্বালা
আতি পোয়াইলে[১২] নাগে[১৩] ট্যাহা গে[১৪]
ওহো গে নোদারী বড়য় দুস্কে যাছু গে চাখিরি ॥

(সুলোচনা রায়। জলপাইগুড়ি)

॥ ২ ॥

উট উট[১৫] ভাবের বন্দু চ্যাতোন[১৬] কর গাও
চাল কাউয়ায়[১৭] উটিয়া কয় অঞ্জনী[১৮] পোহাও।
আতিনা[১৯] পোভাত[২০] কালে ও কইন্যা নিদ্ পাড়েবার[২১] মাজা[২২]
সেই সময়ত্[২৩] ওটায়া[২৪] দিলেক্ ফান্দাইস্[২৫] শালা ব্যাটা
হাতী বান্দো ছাতী ছান্দো[২৬] হাতীক্ নাগাওঁ বেড়ি
তোর মাউতরে যাবে আজি রায়মামার শিকার-বাড়ি ॥[২৭]
যারে যারে ফান্দাইস্ ব্যাটা তোর মাইয়া হবে আড়ি[২৮]
আইস্তে আইস্তে ভাঙ্গি পড়িবে তোর দোলান কোটা বাড়ীরে।

(ধনঞ্জয় বর্মণ। বক্সুনগর জলপাইগুড়ি)

শব্দার্থ: ১-সাধ ২-ঘরের কোণে ৩-কুলের ৪-করলাম ৫-বিয়ে ৬-মহাজন (যে টাকা ধার দিয়েছে) ৭-ঘুরে বেড়াচ্ছে ৮-নতুন বৌ ৯-দুঃখে ১০-চাকুরীতে ১১-রাজার ১২-পোহালে ১৩-লাগে ১৪-টাকা ১৫-ওঠো ওঠো ১৬-জাগো ১৭-দাঁড়কাক ১৮-রজনী ১৯-রাত শেষ হতে ২০-প্রভাত ২১-ঘুমানোর ২২-আরাম ২৩-সেই সময়ে ২৪-উঠিয়ে ২৫-ফাঁদ যে পাতে শিকারী ২৬-হাতীকে বান্ধতে হবে ২৭-শিকারের আস্তানা ২৮-বিধবা।

॥ ৩ ॥

আরে ও বাঙ্গোর ভইষের দপাদার[১]।
না করোঁ মুই বাঙ্গোর ভইষের চাখিরি রে ॥
বাঙ্গোর ভইষের যেমন সুক কাড়িয়ায় কাড়িয়ায়[২] ছ্যাঁকে[৩] দুদ,
ভইষের চাখিরি বিষম দায়
বোনের বাগে মইষালুক ধরিয়া খায়।
আরে ও বাঙ্গোর ভইষের দপাদার
না করোঁ মুই বাঙ্গোর ভইষের চাখিরি রে ॥

(নারায়ণ রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

॥ ৪ ॥

কত দিনা দুস্কের জীবন যায় দিনে দিনে—
আর কতয়দিন[৪] দারুণ বিদি[৫] দুস্ক দিবে মোরে।
কত জোনার[৬] দোলানকোটা[৭] ওরে টিনের বাড়ী
মুই কমবক্তার[৮] কপাল পোড়া ধরিছুং ভইষের চাখিরি ॥
ঔদে[৯] মিটা[১০] বৃক্ষের ছায়ায়ে রে ছায়ায় মিটা বাও[১১]
পরনারীর মুক মিটা যদি হাসিয়া করে রাও[১২]।
বিদি গাবুর বয়াসে—।

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

ওকি ও হোরে বাউদিয়া—।
মোক্ ছাড়িয়া বড়য় দুকে[১৩] যাছিতু[১৪] রে চাখিরি
ওরে তুই যদি চাখিরি যাবোঁ, মোক্ ক্যানে তুই বিহাও করলোঁ।
কানের সোনা বন্দক থুইয়া ঘুরিয়া[১৫] দে তুই চাখিরির ট্যাহা[১৬]
মোক্ ছাড়িয়া না যাইস্ রে চাখিরি বড়য় দুকের রে ॥

(সুশীলা রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

শব্দার্থ : ১-দফাদার ২-ঘড়ায় ঘড়ায় ৩-দোহন করে ৪-কতদিন ৫-নিদারুণ বিধাতা ৬-জনের ৭-দালান-কোঠা ৮-অভাগী ৯-রোদে ১০-মিঠা ১১-মধুর বাতাস ১২-মুখমিষ্টি কথা ১৩-দুঃখে ১৪-যাচ্ছি ১৫-ফিরিয়ে ১৬-টাকা।

॥ ৬ ॥

বিদিরে—।
এই কি ছিল মোর কোপালে[১]
আর কতয়দিন[২] থাকিম্ ভইষ নিয়া জোঙ্গলে।
কুনবা[৩] দিন জোঙ্গলের বাগ[৪] মোক্ ধরিয়া খাবে
ওরে মাইয়া ছোওয়া[৫] ট্যাহাকড়ি মোর বিফলে যাবে।
বিদিরে, এই কি ছিল মোর কোপালে ॥

(সুরেন্দ্রনাথ রায়। কোচবিহার)

১৪. উদ্ভট কল্পনা

॥ ১ ॥

ও সকীরে—।
শালের গচে[৬] শৌলের পোনা[৭] বগায় ধরিয়া খায়
ওরে বাপোর বিয়া না হইতে রে
বেটি নাইওর[৮] যায় রে।
ওকি হায় রে হায় ॥

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

১৫. লোক সাংবাদিকতা

ক. জীবন যন্ত্রণা

॥ ১ ॥

আমরা ধান কাটিরে—।
সগায় মিলি[৯] খাটিখুটি কি পাইলোংরে ধান।
(হায়রে) প্যাটের[১০] ভোকত্[১১] দিন কাটে শুন্যা[১২] দোতরার গান ॥
চাষীর দুস্ক হায় কায়[১৩] বুজিবার[১৪] পারে
আশিন কাত্তি[১৫] মাসোত্[১৬] চাষীর যে দুগ্গতি[১৭]
সারা বছর খাটিখুটি কায় পুরাইবে ক্ষেতি[১৮]
মোরা ধান কাটিরে ॥

(সুবোধ সেন। গণশক্তি, ২রা ফেব্রুয়ারী, পৃঃ ৫)

শব্দার্থঃ ১-কপালে বা ভাগ্যে ২-কতদিন ৩-কোনদিন বা ৪-জঙ্গলের বাঘ ৫-মেয়েছেলে অর্থাৎ স্ত্রী পরিবার ৬-গাছে ৭-শোল মাছের বাচ্চা ৮-কন্যা শ্বশুর বাড়ী যায় ৯-সকলে মিলে ১০-পেটের ১১-ক্ষিধায় ১২-শুনে ১৩-কে ১৪-বুঝতে ১৫-কার্ত্তিক ১৬-মাসে ১৭-দুর্গতি ১৮-ক্ষতি।

॥ ২ ॥

ও ভাই মোর গাঁওয়ালী[১] রে—।
কতয় দুস্কে তোমার দিন কাটে
ভাত কাপড় তাও না জুটে রে
ভাই মোর অভাবের সোময় কাও[২] না খপর করে রে ॥
নাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপেতে[৩] বেচায় দুদের[৪] ছাওয়াল[৫] ॥

(শর্বরী রায়। জলপাইগুড়ি)

॥ ৩ ॥

হারে ও হামার কাতিশাল[৬] বছর বছর থাকিসরে বহাল।
তুঁই আমাদের মাতাপিতা তুঁই আমাদের নাতি ছাওয়াল।
সাত পুরুষের জমিন হামার তিন পুরুষের হাল।
কাঠফাডা[৭] রৈদে[৮] পুড়্যা আধমরা মোর বলদজোড়া
(আবার) পানি কাদায় ভিজ্যা সারা হলঃরে নাঙ্গেহাল।
তোর আশাতে ভাবি বইস্যা কতই রাইত সকাল ॥
খ্যাতের পানি ট্যান্য ট্যান্যা[৯] করনঃ তোক সেয়ানা
তোর দোয়াতে[১০] টিক্‌লি সোনায় চিকমিকাচে বোয়ের[১১] কোপাল
হাসে[১২] তরজা গানের আসরে যাই গায়ে দিয়া শাল ॥

(বাংলার লোকসাহিত্য : ৩য় খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৪৫৩)

॥ ৪ ॥

[গম্ভীরা গান—বন্যা উপলক্ষে]

এবার কি খাবা বাবাহে পুয়াল[১৩] চাবাও বস্যা।
কোন মুলুকের বইন্যা[১৪] আলো[১৫] মোর বাবা হে ॥
আমের গচের ডাণ্টা খাড়ু[১৬] ভাদই ধানের আশা ছাড়ুঃ
ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে মোর বাবা হে ॥

(মটর বাবু। মালদহ)

শব্দার্থ : ১-গ্রামবাসী ২-কেউ ৩-খাজনার দাপটে ৪-দুধের ৫-ছেলে ৬-ধানের নাম (কার্তিক মাসে ওঠে) ৭-কাঠফাটা ৮-রোদে ৯-টেনে টেনে ১০-দয়াতে ১১-বৌয়ের ১২-হেসে ১৩-ধানের চিটা ১৪-বন্যা ১৫-এলো ১৬-আম গাছে আমের ডাল শূন্য।

॥ ৫ ॥

[গম্ভীরা গান—খরা সম্পর্কে]

শিব কি করিবো হে এবার বাঁইচবে না[১] পরাণ
ট্যাহা স্যারের[২] চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেইল্ টান ॥
মোগো দ্যাশের আম্র ফলটি স্যেও হইল মাটি[৩]
পলু[৪] পুশা[৫] মাছি দিশা দর হইল খাটি ॥
দর হইল কুড়ি পচিশ পলু পুশা লাগছে যে দিস
এ ক্যামোন হইল দ্যাশের ধারা বল বাঁইচবো ক্যামনে ॥
কিষকেরা ভাইব্ছে বস্যা উপায় কিবা করিহে
ধান কলাই হইল্না ভাই হইল না জলঝারি[৬]হে
আর ক্যামনে রোপন করি জল বিনা সব মইল গরু বকরী[৭]
একি হইল্ বিষম জ্বালা ক্যামনে বাঁইচবে ছেইলে পিলা[৮]হে ॥

(বাংলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব। পৃ: ১০)

॥ ৬ ॥

শুন ও নগরবাসী ও—
জলপাইগুড়ি শহরত[৯] গাড়ীত[১০] নামিসে।
মাদারগঞ্জের বালুর টিপোত্[১১] যায়া[১২] মারেচে[১৩] তোপ
শুন নগরবাসী ও— ॥
মহারাজার হুকুমজারী না করেন বেলক্[১৪]
চট্ করিয়া না পালালে কইরবে জরিমানা
ঘর বাড়ি গেরস্তি সাজ[১৫] তামানে[১৬] ছাড়িনু
সগায়[১৭] পালাচে হাতাসে[১৮] মাইয়া ধরিয়া[১৯] ॥

(বাঙলার লোকসাহিত্য : ৩য় খণ্ড, । পৃ: ৬৪১)

॥ ৭ ॥

ভোট পাটিতে বসিসে মিসিন[২০] চল দ্যাকিবারে[২১] যাই।
শুন মোর ওহো গে বাই ॥

শব্দার্থ: ১-বাঁচবে না ২-একসের এক টাকা ৩-নষ্ট হয়ে গেল ৪-রেশম চাষের কীট ৫-এক জাতের পাট ৬-বৃষ্টি ৭-গরু বাছুর ৮-ছেলেমেয়ে ৯-শহরে ১০-গাড়ীতে ১১-বালির টিপিতে ১২-গিয়ে ১৩-মেরেছে ১৪-ব্লাক বা কালো-বাজারী ১৫-গৃহের সরঞ্জামাদি ১৬-সবকিছু ১৭-সকলেই ১৮-ভয়ে বা ত্রাসে ১৯-পরিবার পরিজন নিয়ে ২০-মেশিন ২১-দেখতে।

ইঙ্গিরাজের[১] বুদ্দি ভারী[২] আনিসে ধানভুকা কল[৩]
অ্যাকদিকে ওটচে[৪] ধোয়া অ্যাকদিকে[৫] পড়ছে জল
অ্যাকদিকে পড়ছে ভূষি অ্যাকদিকে পড়ছে চাইল[৬] ॥
খাজনার অলে[৭] ধনীগিলা[৮] আরো বেচাছে ধান।
আপনারে গাড়ী গরাই মিসিন নিখিয়া দ্যাচে ধান
ধান ব্যাচায়ে ধনী গিলা হাউসে[৯] মোটকটোক্[১০]
কত ধনী চাইল কিনিলে বাজার হাটোত্ ॥
ধানের দর হইল আণ্ট আনা[১১] চাইল চাইর পাইসা[১২]
ওই বাদে ভূকাতিগিলা[১৩] হারাইসে[১৪] দিশা[১৫] ॥
শুন মোর ওহো বাই গে ॥

(বাংলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব, । পৃঃ ৪৪০)

॥ ৮ ॥

নদীর বান আসিল্রে[১৬]—ওরে তিস্তা নদীর বান
ঘর-গিরস্তি[১৭] মাইয়া ছাওয়া[১৮] ধরিয়া পলান বন্দুরে ॥
ঢেউ দ্যাকিয়া নাগে ভয় বড় বড় পাক্ ওরে বাপোরে বাপ
উতাল পাতাল করে পানিরে ওরে বাঁচেনা পরাণ ॥
কলকলায়া[১৯] যায় পানি ভাই খাল বন্দর দিয়া
(রে ভাই) বান্দো এবার ভুরা[২০] কমোর বান্দি ছাড় নৌকা রে
পালে দ্যাওরে টান।
আর কত মড়া চিনা কাও[*] যায় ডুবিয়ারে মানুষ গরু ভাসি ভাইরে
ওরে ডুবিল প্যাটের ধান ॥

(রেকর্ড : সুনীল দাস)

॥ ৯ ॥

আমার মঙ্গুর মায়ে তো কনটোল[২১] বুজেনা[২২]।
রাইন্তে[২৩] গেইলে কাইন্তে বসে লবন ছাড়া রান্দে না ॥

শব্দার্থঃ ১-ইংরাজের ২-বুদ্ধি বেশ ৩-ধান ভানা কল ৪-উঠছে ৫-একদিক দিয়ে ৬-চাউল ৭-খাজনার আশায় ৮-ধনীরা ৯-আহ্লাদে ১০-গড়াগড়ি দিচ্ছে ১১-আট আনা ১২-চার চার পয়সা ১৩-ধান ভেনে যারা খায় ১৪-হারিয়েছে ১৫-পথের সন্ধান ১৬-এসেছে ১৭-ঘর গৃহস্থালী ১৮-ছেলেমেয়ে ১৯-কলকল শব্দে ২০-কলার ভেলা তৈরী কর ২১-কণ্ট্রোল ২২-বোঝে না ২৩-রাঁধতে।

ও আহারে, কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম
কত বাবুর পায় ধরলাম
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে ॥
ও আহারে আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি[১]
ম্যাঘ না হাতেই[২] পড়ে পানি
ও তার ট্যাপ ট্যাপানি গেইল্ না রে[৩]
ও তার ট্যাপ ট্যাপানি গেইল্ না ॥

(নিবারণ পণ্ডিতের গান। রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, । পৃঃ ২১)

খ· শ্রমজীবন

॥ ১ ॥

[ছাত পেটানোর গান]

ও আমার ছান্দের কণা আন্দার[৪] কইর‍্যা কই গেলিলো
আন্দার কইর‍্যা কই গেলিলো পাগোল[৫] কইর‍্যা কই গেলিলো।
তর লাগি যামু ঢাহা[৬] বাস্কো[৭] ভইর‍্যা আনমু ট্যাহা
দোতলায় রাখমু তরে খেড়ী ঘরে[৮] রাখমু না লো ॥
কিন্যা আনমু ঢাহাই শাড়ী পিন্দা[৯] যাইবি বাড়ী বাড়ী
রাইস্তার লোকে দেইখ্যা তরে বুক থাপড়াইয়া মইরবে ওলো ॥

(লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম -হেমাঙ্গ বিশ্বাস. । পৃঃ ৬১)

॥ ২ ॥

[ছাত পেটানোর গান]

দালান দিলি মহল দিলি বাড়ীর নীচে পুষ্করণী[১০]
একখানা পানসি[১১] দিতে পারোনি।
বাঁধা জল কাঁচা পানি শুনহে মিস্তিরি
একটু নবন[১২] দিতে পারোনি ॥
চাইল[১৩] পালাম[১৪] ডাইল পালাম না পালাম জ্বালানী
তরকারী সবই হোলো খালামনা[১৫] আমানী[১৬]।
দিগীর ধারে বাগান হোলো না হোলো মালিনী ॥
বড় বড় বাবু আছে দুনিয়া ভিতর
এমন মালিক চোক্ষেতে দেখিনি।

(লোকগীতি মঞ্জরী—বুদ্ধদেব রায়. ১৯৭৬। পৃঃ ১২)

শব্দার্থ : ১-খড়ের ছাউনি ২-মেঘ না হলেও ৩-টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ে ৪-অন্ধকার ৫-পাগল ৬-ঢাকা ৭-বাক্স ৮-ছনের ছাউনী দেওয়া ঘর ৯-পরে ১০-পুকুর ১১-পানসি নৌকা ১২-লবণ ১৩-চাল ১৪-পেলাম ১৫-খেলাম না ১৬-পান্তাভাতের জল।

॥ ৩ ॥

[ধান ভানার গান]

শ্যাও শ্যাও শ্যাও[১] — ।
ধান্‌ত ভুকি[২] দ্যাও
দুয়ারে আগত ভৈষ ধান বা ঘর হোইল্‌
যত্‌কে ভাতার লড়ে চড়ে তত্‌কে ধান ভুকি পরে ।

(চারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ি)

॥ ৪ ॥

[পাট কাটার গান]

পূবের থনে[৩] আইলো বাতাস নদী হইলো তল
দ্যাশ পিরথিমী[৪] সাগর ভইর‍্যা চরায় নামলো জল ।
কাচিবাগী[৫] সঙ্গে লইয়ারে পাট কাটিতে চল
জোনা ভাইরে—॥
পূবের থনে বইচে বাতাস নামচে ম্যাগের[৬] ঢল
এক নিমিষে দুই না জাহান করব বুঝি তল
ঝড় বাদলে দিন মজুরী দিব ট্যাহা ট্যাহা[৭]
শিগ্‌গী কইর‍্যা বাইরাওরে ভাই চালাও বিষম ঠ্যাহা[৮] ॥
বিহান বিকাল[৯] দিব খাওন পাবদা বোয়াল রুই
তাহার সইঙ্গে পাইবা আরো হাটের সরস দৈ ।
জোনা ভাইরে, কাচিবাগা সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল ॥

(বাংলার লোকসাহিত্য ; ১ম খণ্ড— আশুতোষ ভট্টাচার্য, । পৃঃ ৩৯১)

॥ ৫ ॥

[নৌকা বাইচের গান]

হেঁইয়ো মারো মারো টান হেঁইয়ো মারো রে ।
চৈদ্দ[১০] ডিঙ্গা নিশান ওড়ে, বাইয়ো রে নাও জোরে জোরে ॥
হে মাজি[১১] ভাইরে—
চম্পক নগরে যাই ভাসাও তরণীরে ॥

শব্দার্থ ঃ ১-ধান এলিয়ে দেওয়ার শব্দ ২-ধান ভানা ৩-পূব দিক থেকে ৪-পৃথিবী ৫-কাস্তে ইত্যাদি ৬-মেঘের ৭-টাকা ৮-দায় (প্রয়োজন) ৯-সকাল ও বিকাল ১০-চৌদ্দ ১১-মাঝি ।

কালীদহের কাল জল[১] উতাল পাতাল বইলো ঢল
হেঁইয়ো মারো বৈঠা টানো[২] শিব শিব বলো হে ॥

পল্লীবাঙলায় লোকগীতি—নির্মলেন্দু চৌধুরী । পৃঃ ১৪-১৫ ।

॥ ৬ ॥

[ভুঁই নিড়ানোর গান]

আয়রে তরা[৩] ভুঁই নিড়াইতে যাই।
ভুঁই মোগো মাতা পিতা ভুঁই মোগো পুত[৪]।
ভুঁইয়ের দৌলতে মোগো আশি কাটা[৫] সুক[৬] ॥
পোষ মাসে দেলাম[৭] পুজা বাস্তু দেব্‌তার পায়
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায়।
ফাগুন মাসে দেলাম নাঙ্গল চত্তির মাসে[৮] বীজ
বৈশাকেতে চিকচিকানী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ ॥
আষাঢ় মাসে সোনার ধান সোনার ফসল ফলে
ছেরাবনে[৯] আউস ধান গেরহস্তে[১০] তোলে।
ভাদ্দোর[১১] গেল আশ্বিন আইলো কাত্তিকে দেয় সাড়া
অগ্রাণেতে[১২] ক্ষ্যাতের পরে দেখরে আমন ছড়া ॥
আমন ওটে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই আর
আইসো এবার খাবার ব্যালা চরণ বন্দি তার।
(ওগো) সপ্তডিঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে
এবার য্যানো সোনার ধানে আমার গোলা ভরে ॥

(বাঙলার লোকসাহিত্য ; ১ম খণ্ড—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, । পৃঃ ৩৯০)

গ. শ্লেষাত্মক

॥ ১ ॥

তোমরা এবার লও চিনিয়া—তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছে কত দ্যাশ দরদী ভোটাভুটির গন্ধ পাইয়া ॥
শুনতে পাই হাট বাজারে এবার যত জমিদারে
ট্যাহা পাইসা[১৩] খরচ কর‍্যা ভোট নিবেন কিনিয়া।

শব্দার্থ : ১-গভীর নদীর জল কাল দেখায় ২-দাঁড় বাও ৩-তোরা ৪-ছেলে ৫-অফুরন্ত ৬-সুখ ৭-দিলাম ৮-চৈত্র মাসে ৯-শ্রাবণ মাসে ১০-গৃহস্থে ১১-ভাদ্রমাস ১২-অগ্রহায়ণ মাস ১৩-টাকা পয়সা।

খদ্দর টুপি ধর্‌য়াচেন[১] কেহ কোলাম্বর ছাড়িয়া
আইতে যাইতে জিজ্ঞাস্‌ করে কেমন আছেন সেলাম দিয়া ॥
কাঁও কাঁও লীগের নাম ধর্‌য়া বলেছেন নম্বা উয়াজ পড়্যা[২]
এইবার ভোট দ্যাও আমারে মুছলমান বুলিয়া।
আমি আছি লীগের মেম্বর সাত বচ্ছর ধরিয়া
এইবার ভোট না দিলে হিন্দু যাবে স্বরাজ লয়্যা ॥
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগে পিঠা যায় বানরের ভাগে
এই কথাডা বহু আগে গেছে পষ্ট হইয়া।
কত মামু আছেন দেখ দরদী সাজিয়া
কোন বেহেস্তে[৩] নিবেন তারা লালু কালুর[৪] ভোটখান নিয়া ॥
(নিবারণ পণ্ডিতের গান—পঃ বঃ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, ১। পৃঃ ৫২)

॥ ২ ॥

কত দেখিমু ভাই ভোটের ভেকধারী
কাঙ্গালের বন্দু সাজি বেড়াচে[৫] বাড়ী বাড়ী।
ন্যাতালা[৬] ভোটের বাদে[৭] হোইসে[৮] বাইর
নিজের বাহার করসেন জাহির।
বুড়্যা ন্যাতালা কহেসেন[৯] নয়্যা নয়্যা বুলি[১০]
বেড়াচে ঘাড়ে নিয়া ভোট ভিক্কার[১১] ঝুলি।
জিবিহাতে[১২] নিকিলিয়া[১৩] দ্যাছে[১৪] পান বিড়ি
হবার চাছে[১৫] হামার মেম্বর মোন্তিরি[১৬] ॥
ভোট পালেরে[১৭] ভাই দেখায়[১৮] হাওয়া[১৯] ধাই[২০]
এলায় তো[২১] বন্দুর নেকা জোকায়[২২] নাই ॥
(সুবোধ সেন। গণশক্তি, ২রা ফেব্রুয়ারী, পৃঃ ৫)

শব্দার্থ : ১-খদ্দেরের টুপি পরছেন ২-দীর্ঘ নমাজ শেষে ৩-স্বর্গে ৪-সাধারণ লোকের ৫-ঘুরছে ৬-নেতারা ৭-ভোটের জন্য ৮-হয়েছে ৯-বলছেন ১০-নতুন নতুন কথা ১১-ভিক্ষার ১২-পকেট থেকে ১৩-বের করে ১৪-দিচ্ছেন ১৫-হতে চাচ্ছে ১৬-সদস্য বা মন্ত্রী ১৭-ভোট পাওয়ার পর ১৮-দেখা ১৯-হওয়া ২০-দায় ২১-এখন তো ২২-লেখা জোখা নেই অর্থাৎ অসংখ্য।

ঘ. প্রতিবাদী গান

॥ ১ ॥

চল্ চল্ চল্ চল্‌রে কিষান ভাই
জমিদারী উটিবার[১] তনে[২] ভোট দিবার যাই।
শ্যাষ[৩]কইরবার তনে জমিদারী, জমিদারের নামে করিম্ শমন জারী।
হা খোরাকিয়া[৪]দ্যাশটাক্ করিম্ ঠিক, ভিনদ্যাশোত্[৫]না মাগিম্ ভিক্
আপনা জমিত্ ঠাসিয়া ধরিম্ হাল
বাঙলা দ্যাশের হাম্‌রা খেদাইম্[৬] জঞ্জাল ॥

(সুবোধ সেন। গণশক্তি ২রা ফেব্রুয়ারী. । পৃঃ ৬)

॥ ২ ॥

এই বছর ওগো চুন্নি[৭] নদীত্ উটিল্ বান।
দে মোক্ দুঘ্‌ঘটনা[৮] মানুষ গরু ভজিল্ কত লোকের পাণ।
চুন্নি লো ওগো চুন্নি গবরমেটি[৯] দিলেক্ ট্যাহা
বানভাসার কপাল পোড়া কাক্‌তো মারিলেক্ মাজা[১০]।
আইল্ ডাঙ্গা ভাসান ॥
চুন্নিগে ট্যাহা নিলেক মেম্বরগণ, ঘুষত্ নিলে অকারণ
ঘুষত্ নিয়া বাড়ীত্ বাজিছে রেডিও গ্রামোফোন ॥
চুন্নিগে পাটির যেমন আন্দোলন মেম্বরগণের দুঃখ মন
এর আগে কান্নাকাটি করে মেম্বরগণ।
ওরে বাচাইও তুমি জান না বাচালে গেল মান
জনগণ ক্ষেপিয়া আচে বাচিব কেমন, এইবারে শাস্তি হবে বোডের মেম্বরগণ ॥

(বাঙলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব, । পৃঃ ৪৬২)

॥ ৩ ॥

ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া[১১] রে—।
চতুরদিগে জ্বলে সুরয বাতি[১২] তোমার ক্যানে বল আন্দার আতিরে[১৩]
হায়রে হায়! পরার বোজা[১৪] তোমরা কদ্দিন বইবেন বাই[১৫]।
বালুটিলটিল্ পঙ্খী কান্দে নিজের আহার খুজির বাদে রে[১৬]
হায়রে হায়, তোমরা বুজি[১৭] ন্যাও নিজের অদিকার[১৮] রে ॥

শব্দার্থ : ১-তুলে দেবার ২-জন্যে ৩-শেষ ৪-হাভাতে বা অভাবী ৫-অন্য দেশে ৬-দূর করবো ৭-চুর্ণী নদী ৮-দুর্ঘটনা ৯-গভর্নমেণ্ট ১০-মজা ১১-গ্রামবাসী চাষী ১২-চতুর্দিকে আলোর রোশনাই ১৩-অন্ধকার রাত ১৪-পরের বোঝা ১৫-বহন করবেন ভাই ১৬-খোঁজার জন্যে ১৭-বুঝে ১৮-অধিকার।

এক ব্যালা তোমার অন্ন জোটে, পেন্দোনোত্ কাপড় কোন্ঠে রে[১]
হায়রে হায়! খালি কইরচেন নেংটি সব্বোসার[২] ॥
তোমার হাতোত্ বাইরে[৩] কোদাল কাঁচি
তবু প্যাটোত্ পাতর বান্দি[৪] আচেন বাঁচি
আর তোমরায় জোগান ভাত সারা দুনিয়ার।
ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে ॥

(রেকর্ড: আব্বাসউদ্দীন)

॥ ৪ ॥

দরদী মোর ভাই, চল্ করি চল্ বাইচ্বার[৫] লড়াই।
দিনে আইতে খাটিয়া মরি চিন্তিয়া কাটাই আত[৬]
(ওরে) মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই না পাই প্যাটের ভাত ॥
অমিলন নয়[৭] কোন জিনিষের সব জিনিষই মিলে।
হাটে বাজারেই সউগ পাওয়া যায় ডবল মূল্য দিলে
ভাইগ্যাবানের[৮] বোজা[৯] দেখোংরে ভগমানেও বয়
ওরে গরীব চাষীর বোজা বইবার দরদী কাওঁ নাই ॥
ধনীর কান্দন ধনীরে কান্দে আর কান্দে ভগমানে
ওরে সরকার কান্দেন ময়া[১০] কান্দন মোর কান্দন না শুনে।
কাক মরিলে কাকেরে কান্দে গুটে[১১] এক জায়গায়
ওরে গরীব মরিচে গরীব ভাইসব আয়রে ছুটে আয় ॥
(নিবারণ পণ্ডিতের গান— প্রঃ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, । পৃঃ ২২)

॥ ৫ ॥

সাতই শনিবারে—।
৭ই শনিবারে দ্বিপ্রহরে ভুখা ভারতেরে
খাদ্যের বদলে গুলি দিল সাগর দীঘির পাড়ে।

শব্দার্থ: ১-পরার কাপড় কোথায় ২-নেঙট সার হয়েছে ৩-ভাইরে ৪-পেটে পাথর বেঁধে অর্থাৎ না খেয়ে ৫-বাঁচার ৬-রাত ৭-দুষ্প্রাপ্য নয় ৮-ভাগ্যবানের ৯-বোঝা ১০-মায়া কান্না অর্থাৎ কপট অশ্রু ১১-জোটে।

শিশু সাত বছরের— ।
শিশু সাত বছরের বকুলের হইল মরণ
ভ্রাতার সাথী হইল ভগ্নী বন্দনা তখন ॥
ইহা পঞ্চাশ সন নয়— ।
ইহা পঞ্চাশ সন নয় তার পরিচয় দিয়াছেন জনতা
ভুলেন নাই পঞ্চ শহীদ ভাই ভগিনীর কাথা ।
সভা মিছিল করে— ।
সভা মিছিল করে পষ্ট করে কর্যাছে ঘোষণা
ভুখা কণ্ঠ বুলেট দিয়া দমানো যাবেনা ॥

(নিবারণ পণ্ডিত—উমাচরণ চক্রবর্তী ছদ্মনামে ১৯৫১ সালের ২১শে এপ্রিল ভুখা মিছিলের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে)

॥ ৬ ॥

আরে ও মোর বন্দু দরদীয়া ।
(বুজি দ্যাক্) কাঁয় বানাইল্ তোমাক্ নবীন বাউদিয়া[১] ॥
কোন দোষত্[২] গেইল্ তোর ভিটামাটি, ব্যাচেয়া খাইলেক কুল্লে গয়নাগাটি
কোন দোষত্ শেষ থালাবাটি খাইলেক তুই ব্যাচেয়া ॥
কাঁয় হরিয্ তোর ক্ষ্যাতের ধান, কাঁয় কাড়িল্ তোর মুকের গানরে
দোশ্মনক[৩] তুই না রাখিলুঁ চিনিয়া ॥
ঐ পুর্ণ গোলাডা পুর্ণ হইলু, হাজারভিটা শুন্য হইল্ রে
বুজি দ্যাক্ কাঁয় তোর বুকের রক্ত খাইলেক্ রে চুষিয়া ॥
কি আছে তোর ভয় ডর বাঁচির বাদে[৪] লড়াই কর রে
মরবি যদি মরি যা তুই বাঁইচবার লড়াই করিয়া ॥
যাঁয়[৫] তোমাক্ নিত্তি মারে মুখের গ্রাস হরণ করে রে
মুল দোশ্মনক বিনাশ কর তুই মরণ কামড় দিয়া ॥
(নিবারণ পণ্ডিতের গান—প.ব রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, । পৃঃ ১০৩)

শব্দার্থ ঃ ১-বিবাগী ২-দোষে ৩-দুশমন বা শত্রু ৪-বাঁচার জন্য ৫-যারা ।

চট্কা গানের বিষয়ানুযায়ী সঙ্কলন

১. কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচনা

॥ ১ ॥

আজি পায়বা[১] ঘুঙ্গুরা[২] বাজেরে, আই মুই ক্যামনে বাইরা[৩] যাঁও।
ঘরে মোর শউর[৪] বাইরা মোর ভাসুর আই মোর শিয়রে ননদী জাগে
আই মুই ক্যামনে বাইরা যাঁও ॥
পীরিতির আশে পীরিতির বশে ও মোক্ ঘুঙ্গুরা বনেয়া[৫] দিচে
কি করিম্ বানিয়াটাক্[৬] ও অ্যালা[৭] কালাইবা[৮] ভরেয়া দিচেরে
আই মুই ক্যামনে বাইরা যাঁও ॥
অ্যালা হাটিয়া গেইতে[৯] বাজেরে ও মুই ক্যামনে বাইরা যাঁও
চিপিয়া ধরং ঠাসিয়া ধরং ও আই মুই আইস্তে[১০] ফ্যালাওঁরে পাও
ওরে জলের ঝাড়ি হস্তে লইয়া ও আই মুই ঘরের বাইরা হমো রে
আই মুই দ্যাকিবারে বাইরা যাঁও ॥

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার')

॥ ২ ॥

ওরে আগা নাওয়ে[১১] ডুব ডুব[১২] পাছা নাওয়ে বইস
ঢোঙ্গায় ঢোঙ্গায়[১৩] ছ্যাকোঁ[১৪] জলরে,
ও কইন্যা পাছা নাওয়ে বইস ॥
(ওরে) জল ছেঁকিতে[১৫] জল ছেঁকিতে সেউঁতির[১৬] ছিঁড়িল্ দড়ি
গালার হার খসেয়া[১৭] কইন্যা হে সেউঁতিত্ লাগাইম্ দড়ি
গালার হার খসেয়া কইন্যা হে ॥
তোক্ সে বলং ছাওয়াল কানাই তোর সে ভাঙা নাও
ভাঙা নাওয়ে খ্যাওয়া[১৮] দিয়া হে, ও তুমি ক্যামন মজা পাও
ভাঙা নাওয়ে খ্যাওয়া দিয়া রে ॥

শব্দার্থঃ ১-পায়ে ২ ঘুঙুর ৩-বাইরে ৪-শ্বশুর ৫-বানিয়ে ৬-ব্যবসায়ীকে ৭-এখন ৮-কলাই (লোহার ছোট গুলি) ৯-যেতে ১০-আস্তে ১১-নৌকার সামনের দিকে ১২-জল কানায় কানায় উঠেছে ১৩-জল সেচবার টিনের পাত্র ১৪-ছেঁচে ফেলা ১৫-জল ফেলতে ফেলতে ১৬-জল ছেঁচার পাত্রের গায়ে লাগানো ১৭-খুলে ১৮-পারাপার করে।

(ওরে) ভাঙাও নোয়ায়[১] ছেঁড়াও নোয়ায় সোনা উপায়[২] গড়া
(ওরে) আজার হস্তীক্ পার করিচোং রে ও কইন্যা তোরবা কত ভরা[৩]।
এক সোন্দরীক্ পার করিতে নিচোং আনা আনা
তোক্ সোন্দরীক্ পার করিতেরে খসাইম্ কানের সোনা।
(ওরে) সোনাও খসাইম্ রূপাও খসাইম্ খসাইম্ কানের সোনা
ভরা গাঙে খ্যাওয়া দিয়ারে ও কইন্যা শরীল[৪] হইল্ মোর কালা
ভরা গাঙে খ্যাওয়া দিয়ারে ॥

(নারায়ণ রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

বড়াই মনডা ক্যানে মোর ধুকধুকিয়া[৫] অয়
আরো গাওখান ক্যানে মোর ধুবধুবিয়া[৬] হয়।
যেই কথাডা কবার চাঁনু[৭] সেই কথাডা হয়
ছাড়িয়া গেইচে সোনা বন্দু আরতো আইস্‌বার নয় ॥
বিন্দা দূতীক্[৮] পাটেয়া[৯] দিচোং বন্দুক্ আনেবার[১০]।
বন্দু বলে গসা হইচেন না আইস্‌বে আর ॥
নানা না আর না যামোঁ কদমতলে না গাথিম্ মালা
ঘরের বৈরী[১১] ননদী পাতারের[১২] বৈরী কালা
বিন্দা দূতী আসিল্ ঘুরি ধরপড়ং বিচিনাত্[১৩] পাড়ি
মনডা মোর বুজিয়াও বোজেনা মরে কালার বাদে[১৪] ঘুরি ॥

(পূর্ণলক্ষ্মী বর্মন। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

॥ ৪ ॥

কালা আর না বাজান বাঁশরী।
সাদের[১৫] ঘরে কালা অইতে না পারি ॥
কালারে ওরে কুল গেইল কলঙ্ক রইল, ওরে তুই কালা মোর গালার কাটি
ওরে সকালে বৈকালে কালা না বাজান বাঁশরী ॥

শব্দার্থ: ১-নয় ২-রূপা ৩-ভার ৪-শরীর ৫-ধুকপুক করে ৬-ছমছম ৭-বলতে চাই ৮-বৃন্দাদূতীকে ৯-পাঠিয়ে ১০-আনতে ১১-ঘরের শত্রু ১২-বাইরের ১৩-বিছানায় ১৪-কালার জন্যে ১৫-সাধের।

(কালারে) ওরে তোর কালার বাঁশীর সুরে, ওরে নারীর মোন মোর অয়না ঘরে
ওরে ক্যানরে কালা বাজান বাঁশরী সঞ্জে[১] সকালে ॥
(কালারে) আমি না যাঁমো যমুনার জলে
না শুনিমু তোমার বাঁশীর গান
ওরে ফুল ফুটিলে য্যামোন ভোমরা আইসে
গুণ গুণ সুরে করে মধুপান।
কালা আর না বাজান বাঁশরী ॥
(গানটি ভাওয়াইয়া সুরেও গাওয়া হয়)
(রেকর্ড : কেদার চক্রবর্তী)

২. প্রেম নিবেদন

॥ ১ ॥

একটা কাথা শোনেক্ মোরে রে[২]
নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্দু রে[৩]
ও তুই কিসের গসা[৪] হলুরে
নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্দুরে ॥
নদীর বসন্তোকালেরে ওরে ঝরিয়া পড়ে মাটি
নারীরো বসন্তোকালেরে ঐনা পুরুষ গালার কাটি।
মাচের বসন্তোকালেরে ঐনা করে উজান ভাটি
নারীরো বসন্তোকালেরে ঐনা পুরুষ গালার কাটি ॥
পক্ষীর বসন্তোকালেরে গচে বনায়[৫] ভাসা[৬]
নারীরো বসন্তোকালেরে ঐনা হাসিয়া কয় কাথা রে
গচের বসন্তোকালেরে ঝরিয়া পড়ে পাতা
নারীরো বসন্তোকালেরে ঐনা হাসিয়া কয় কাথা রে ॥
(উত্তর বাংলার পল্লীগীতি ; চট্কা খণ্ড—হরিশচন্দ্র পাল পৃ: ৬১)

॥ ২ ॥

পুরুষ—আজি হাতোত্ দ্যাখোঙ[৭] ক্যানে দৈয়ের হাড়ি
নারী—যাবার বিড়াচি[৮] বন্ধু মৈষাল টারি[৯]।

শব্দার্থ: ১-সন্ধ্যে বেলা ২-আমার ৩-অল্পবয়সী বন্ধু ৪-রাগ করা ৫-গাছে তৈরী করে ৬-বাসা ৭-দেখছি ৮-বেরিয়েছি ৯-মৈষালের বাড়ী।

পুরুষ—মৈষালের সাতে[১] তোমার ভাবরে আচে[২]
নারী—তোমার তা পুচবার[৩] বন্দু কোণ্ঠে[৪] নাইগ্‌চে[৫]
পুরুষ—বাইস্‌[৬] ঐকনা[৭] কাথাতে কিতায়[৮] গসারে[৯] হন
নারী—বুচ্‌চি বুচ্‌চি[১০] বন্দু তোমার মোন্‌
পুরুষ—যাননা ক্যানে তোমরা আমরার টারি
নারী—আমরা গেইলে নাগে ট্যাহা কড়ি।
পুরুষ—ট্যাহা পাইস্যার[১১] কিবা কমা[১২] আছে
নারী—সেকাথা তো বন্দু জানায়[১৩] আচে
পুরুষ—এমন করি হিনা করালোত্‌[১৪] যায়
নারী—পাইস্যা হইলে না বন্দু নগ্‌তে হয়।

চলেন আমার বাড়ী যাই বন্দু আমার বাড়ী যাই
জলপান খায়া আইস্‌বেন বন্দু ছাচি কাচা দৈ
ছাচি কাচা দৈ খাইও খাইও বন্দু খাইও।

(রেকড কেশব বর্মন ও স্মৃতি বসু)

॥ ৩ ॥

ওকি পীরিতি ভাঙ্গিবে চ্যাংড়া মুকের[১৫] কাথাতে[১৬]।
কারে পীরিতি পাড়ি[১৭] ভুলিলু মোক্‌, চ্যাংড়া কি বুঝাও তোক্‌।
তুইরে চ্যাংড়া নিদয়া ধুলাও[১৮] কি তোর নাই ময়া[১৯]
কারবা পেমে ভুলিয়া রলু[২০] মোক্‌ ছাড়িয়া॥

চ্যাংড়া যত কাথা কলু[২১] মুই গসা কিন্তুক্‌ না হইস তুই
আসিস্‌ আসিস্‌ ওরে চ্যাংড়া শুন্‌[২২] দুক্কুর[২৩] সমে[২৪]।
ওকি দুস্ক সুকের[২৫] কাথারে কও ঐনা জলের ঘাটে
ওকি চ্যাংড়া কি ময়ায় ভুলালু মোক্‌ পীরিত করিয়ে॥

(বিরজা সেন। কোচবিহার)

শব্দার্থ: ১-সঙ্গে ২-প্রণয় আছে ৩-জিজ্ঞাসা ৪-কোথায় ৫-লাগছে ৬-বেশ ৭-ঐ একটা কথায় ৮-কেন ৯-রাগ ১০-বুঝেছি বুঝেছি ১১-টাকা পয়সার ১২-কম ১৩-জানাই ১৪-অঙ্গীকার করা ১৫-মুখের ১৬-কথাতে ১৭-পড়ে ১৮-ধুলিকণাসম বা সামান্যতম ১৯-মায়া ২০-রইলে ২১-বললাম ২২-নিঃঝুম ২৩-দুপুর ২৪-বেলা ২৫-দুঃখ সুখের।

॥ ৪ ॥

ওকি বন্দুরে, ঘটক ধরিয়া বিয়াও করেন মোক্ রে।

শাড়ী পেন্দোং[১] খোপা বান্দোং[২] ঐনা যৈবনের বাহার করঙ রে

(ওকি বন্দুরে) যৈবনের বাহার দেখয়ইয়া[৩] নাই মোর ঘরে রে ॥

সেন্দুর[৪] পেন্দোং সিতা পারং আয়না দিয়া দেহার ছপি[৫] দেখঙরে

(ওকি বন্দুরে) গাবুর বয়াসে সোয়ামী নাই মোর ঘরে রে ॥

ওরে তুই ছাড়া বন্দু কায়ও[৬] নাই

দুস্কের কাথা বন্দু তোমাক জানাই

(ওকি বন্দুরে) বুক ভেজে মোর দুই নয়ানের জলে রে ॥

(গঙ্গাচরণ বিশ্বাস। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

নারী –ওকি যাইমেন[৭] সোনা বন্দু যান আমার বাড়ী

যাইও সোনা বন্দু যাইও বন্দু যাইও যাইও।

পুরুষ—ক্যানে কইন্যা যাবার কন[৮] আমাক দিয়া কিসের টান

কিসের বাদে কইন্যা আমাক্ যাবার কন্।

নারী—বন্দু মনোত্ আমার কোনো নাই,[৯] এম্নে তোমাক্ যাবার কই

বিচিনায়[১০] বসিয়া বন্দু গুয়া খায়্যা যান।

পুরুষ—শুন শুন কইন্যা মনে কত ধান্দা

তোমার সাতে আমার নাই চিনা জানা[১১]।

নারী—যাইও যাইও বন্দু না করেন ভয়

ঘন কলায়ালা[১২] ঐ বাড়ীটায় হয়।

পুরুষ—কইন্যা আমাক্ বড়োয় নাগে ভয় পাছোত্ যদি কোনো হয়[১৩]

আশা দিয়া কইন্যা ভাসান দরিয়ায়।

নারী—দোহাই বন্দু মাতা[১৪] খান মিছা কাথা কবার নও

তোমাক পাইলে হিয়া মোর শেতল[১৫] হইলে হয়।

পুরুষ –কইন্যা ভাল যদি বাসির[১৬] চাও যমুনার ঘাটে যাও

দেকা হইবে কইন্যা ঐ কদম তলায় ॥

(রেকর্ড : কেশব বর্মন ও নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়)

শব্দার্থ : ১-পড়বো ২-বাঁধবো ৩-দেখার মত ৪-সিঁদুর ৫-শরীরের ছবি বা রূপ ৬-কেউই ৭-যাবেন ৮-বলছেন ৯-মনে কিছু নেই ১০-বিছানায় ১১-জানাশোনা ১২-কলাগাছ ওয়ালা ১৩-যদি কোন কিছু হয় ১৪-মাথা ১৫-ঠাণ্ডা ১৬-যদি ভালবাসতে চাও।

॥ ৬ ॥

নারী—ও মোর চ্যাংড়া বন্দু রে
একবার পাইছুলা[১] ফিরিয়া চাও
না ন্যাও যদি হাতের পান মোর গান শুনিয়া যাও ॥
পুরুষ—না লই তোমার হাতের পান না শোনোঙ তোমার গান
বুকখান্ মোর ভাঙ্গি দিয়া এল্যাও[২] মোক ক্যানে চাও ॥
নারী—আমার মোনের দুক্কের কাথা কারঠে[৩] কবার[৪] যাই
কাঁও বুজেনা[৫] বুকের ব্যথা দরদী কাঁও নাই।
এই সইঞ্জেন্ন[৬] ব্যালা বুকের বোঝা হালকা করি যাও ॥
পুরুষ—শুনলোঙ তোমার মোনের কাথা বুজলোং হিয়ার জ্বালা
অ্যালায় মোর বুকোতে বুক ঠ্যাকেয়া[৭] পর পেমের মালা
ও মোর পাণের সোনারে।
নারী—ওমোর চ্যাংড়া বন্দু রে ॥

(রেকর্ড : বিরজা সেন ও স্মৃতি বসু)

॥ ৭ ॥

ওরে ও বন্দু মোর কালিয়া—।
কন্ যায়া মোর বাপোর আগে ঘটক ধরিয়া।
দিনে দিনে সোনার যৈবনরে ও মোর গত হয়্যা যায়
মাও আচে মোর অবুজ[৮] হয়্যা বাপে না দ্যায় বিয়া ॥
ফুল ফুটিলে ভোমরা যেমনরে পড়ে উড়াও[৯] দিয়া
ওরে যাইতে আইস্তে চেংড়াগিলা[১০] দ্যাকে চায়া চায়া রে ॥
বাপোক্ না কঁও ডরে রে ওরে মুই মাওক[১১] না কঁও লাজে
দাদাক্ না কয় বৌদি মোর দরদী হয়্যা রে ॥

(সুনীল দাস। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ৮ ॥

পেম[১২] জানেনা অসিক[১৩] কালাচান[১৪] ও মোর ঝুরিয়া থাকে মোন—।
কতয়দিনে[১৫] বন্দুর সনে হবো দরিশন ও বন্দুরে ॥
(ও বন্দুরে) নদীর ওপাড় তোমার বাড়ী যাইতে আইসতে অনেক দেরী
যামো কি রব, শুদাই করো মানা—

শব্দার্থ : ১-পিছন ফিরে ২-এখন ৩-কার কাছে ৪-বলতে ৫-কেউ বোঝেনা ৬-সন্ধ্যেবেলা ৭-বুক ঠেকিয়ে ৮-অবুঝ ৯-উড়ে ১০-ছেলেগুলো ১১-মাকে ১২-প্রেম ১৩-রসিক ১৪-কালাচাঁদ ১৫-কতদিনে।

হাটিয়া যাইতে নদীর জল থাক্‌লুম কি থুকলুম কি খল্লাল্‌ খল্লাল[১] করে
হায় হায় পরাণের বন্দুরে ॥
(ও বন্দুরে) অ্যাকলা ঘরে শুতিয়া থাকোং পালঙ্ক উপরে
মোন মোর আবিল্‌বিল্‌[২] করে।
গারোত্‌[৩]ফিরতে মরার পালঙ,ক্যারারাম কি কুরুরুম কি ক্যারাম ক্যারাম[৪]করে
(ও বন্দুরে) তোমার আশায় বসি থাকোং বটবিরিক্ষির তলে
মোন মোর উড়াও বাইরাও[৫] করে।
ভাদরমাসি দ্যাওয়ার ঝাড়ি[৬] ট্যাপ্পাস কি টুপ্পুস[৭] কি ঝমঝমেয়া[৮] পড়ে
হায় হায় পরাণের বন্দুরে।

(অনিল রায়বমন। জটেশ্বর, কোচবিহার)

॥ ৯ ॥

ঢাল খুঁপা[৯] সোন্দরী মাই[১০] ও তোর মুচকিমারা হাসিরে
মোন ভোলালু চোক্ষের ইশিরায়, ওহো মাই রে ॥
মনোত্‌ মোর অ্যাকনা কাথা ফুটফুটিয়া থাকে
সুট্‌ করিয়া অ্যাকনা কাথা শুনিয়া যাঁও মোরে রে ॥
খিটখিটিয়া মুকের হাসি মোন করলুং চুরি
মদুর নোবে[১১] ভোমরা আসি করে পাকাপাকি[১২]।
যেমন ঢপের মাইকোনা তুই সিঁথা পাটি পারা
নাকমুড়ি কইতরের মতো[১৩] আমরা হাঁচ জোড়া ॥

(নীলকমল রায়প্রধান। জামালদহ কোচবিহার)

॥ ১০ ॥

নারী · দ্যাওয়ায় কইরাছে ম্যাঘম্যাঘালি তোলাইল্‌ পুবাল বাও
ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরীহে ও তুমি ধীরে ক্যানে বাও
হাড়িয়া ম্যাঘা[১৪] কুড়িয়া ম্যাঘা[১৫] হাড়িয়া ম্যাঘার লাতি
গিস্‌নি আইসে[১৬] দ্যাওয়ার ঝাড়িত্‌[১৭]

শব্দার্থঃ ১-নদীর জলে চলার শব্দ ২-আকুলি বিকুলি ৩-পাশ ফিরতে ৪-খাটের শব্দ ৫-উড়ে বাইরে যাই ৬-বৃষ্টির ঝাঁট ৭-বৃষ্টি পড়ার শব্দ ৮-ঝমঝমিয়ে ৯-বিশাল খোঁপা ১০-সুন্দরী মেয়ে ১১-মধুর লোভে ১২-ঘোরা-ঘুরি ১৩-পায়রার মত ১৪-কালো হাঁড়ির মত ১৫-ছোট ছোট কাল মেঘ ১৬-শীত করছে ১৭-বৃষ্টির ছাঁটে।

ও দ্যাওয়া তোলাইল পুবাল বাও
ধীরে ক্যানে বাওয়াও তরীহে ॥

পুরুষ—হাঙ্গর কুম্ভীর বন্দু আমার নদীক কিসোত[১] ভয়
সাম্তারিয়া[২] দরিয়া হমোঁ পার ও কইন্যা নদীক কিসোত ভয়।
কালা শাড়ী পেন্দনে চান তোর ভোগধান বাসায়[৩] গাও
শোনেক্ শোনেক্ সোনার কইন্যা হে নায়ে দিচেন পাও।
এখন তুমি কিসেরবা ভয় পাও ॥

নারী—তুমি তো সুজন ওরে নাইয়া আমার কাথা শোন
শিমুল খুটার নৌকা তোমার নৌকা তলায় জলের ভারে।

পুরুষ—শিমুল নোয়ায় সেগুন নোয়ায় মন পবনের নাও
সাত সমুন্দর পাড়ি দিমোঁ রে ও কইন্যা যদি সঙ্গে যাও।
ভয় করিনা তিস্তানদীর ঝড় ॥
ওরে গগনকালা কালাশাড়ী কালাপানির ঢেউ
কালায় কালায় কালা হইল্রে কইন্যা আমার ভাটির নাও
ধীরে চল সোনার নৌকা হে ॥

নারী—শোনেক নাইয়া ভাটির নাইয়া বলোঁ তোমার আগে
তুমি আমার পাণের বন্দুহে
ও বন্দু কালায় কালাক্ দেখোং, তুমি আমার পাণের কালা হে।

পুরুষ—ভাটির নাও মোর ভাটিত্ চল নাওয়ে তোমার ধন
ও নৌকা তীরে আমার ঘর।
ধীরে চল ধীরে চল, ধীরে চল সোনার নৌকা হে ॥

(সুশীল রায়। কোচবিহার)

॥ ১১ ॥

হাত ধরিয়া কঙ[৪] যে কাথা[৫]
ও হায় হায় শোনেক্ বৈষ্টম-বাউদিয়া[৬]।
(আহারে) অল্প বয়াসে মোর সোয়ামীটা গেইচে[৭]রে মরিয়া ॥
তুই মোর মোনোবাঞ্ছা[৮] পুরণ কর বৈষ্টম-বাউদিয়া ॥

শব্দার্থঃ ১-কি জন্য ২-সাঁতার দিয়ে ৩-শরীর থেকে সুগন্ধ ছড়ায় ৪-বাল ৫-কথা ৬-বিবাগী ৭-গিয়াছে ৮-মনের আকাঙ্ক্ষা।

মোর মত দুখিনী নারী ও হায় তিন ভুবনে নাই
আর সাদন-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া সিদ্ধ কর গোসাই
তুই মোর মনোবাঞ্ছা পূরণ কর বৈষ্টম বাউদিয়া ॥
সইত্য করিয়া কও যে কাথা ও হায় কিসের এ জীবন
আর ভজন বিনা সাদন নাইরে বলে কোরাণ-পুরাণ।
শোনেক বৈষ্টম বাউদিয়া—
তুই মোর মনোবাঞ্ছা পূরণ কর বৈষ্টম বাউদিয়া ॥

(রেকড : আব্বাসউদ্দীন)

॥ ১২ ॥

ঘেঘির ঘাটে ঠেকাইলেন নাও আদার[১] আইতে[২] কোণ্ঠে[৩] যাঁও
না কইরেন আর হাউসের[৪] চাতুরালী।
মোর অসের নয়্যা যৈবন ছল করিয়া ও বন্দুদোন[৫]
কাড়িয়া নিয়্যা কুলে দিলেন কালি ॥
নয়্যা বসন[৬] কইল্লেন মাটি[৭] যৈবন তাতে বিরায় ফাটি[৮]
খোপাকোনা[৯] দিচেন এলেয়া[১০]।
চন্দ্রোবদন ভইল্লেন[১১] দাগে ক্যামনে বিরাঁও[১২] মাইনসের[১৩] আগে
হাতের বালা দিলেন ফ্যালেয়া[১৪] ॥
আমার বুকোত্ হয়্যা বন্দী না কইরেন আর নয়্যা ফন্দি
ঘেঘির ঘাটে তুফান[১৫] উঠচে ভারী
এইনা তোমার ধইল্লোঙ[১৬] পাঁও বুকোতে[১৭] মোক্ তুইল্যা লও
কিরা করেন না হইবেন ছাড়াছাড়ি ॥

(বিরজা সেন। কোচবিহার)

৩. প্রেমে হতাশা

॥ ১ ॥

তোরষা নদীর ধারে ধারে ওই দিদি গো মানসাই নদীর ধারে
আজ সোনার বন্দু গান গাহিয়া যায়।
দিদি তর তরে কি মোর তরে কি নদীর পাড়ে পাড়ে।

শব্দার্থঃ ১-আঁধার ২-রাতে ৩-কোথায় ৪-শখের ৫-বন্ধুধন ৬-নতুন বস্ত্র ৭-নষ্ট করে দেওয়া ৮-ফুটে বের হয় ৯-খোঁপা খানা ১০-এলোমেলো করে ১১-মুখমণ্ডলে চুম্বন এঁকে দেওয়া ১২-বের হই ১৩-মানুষের ১৪-ফেলে ১৫-তুফান ১৬-ধরলাম ১৭-বুকেতে।

ঢেকি পাড়ায়[১] বড় বোইনে[২] ছোড বোইনে[৩] ধান ঝাড়ে
(আর) মাইজা বোইনের বুকের ব্যথা
ওদিদি অঝোর ধারে ঝরে ও চোক্ষের কিনারে ॥
যায় চলি আর পিচন পানে[৪] তাকায় থাকি থাকি
ও দিদি ও যায় যে চলি ক্যামন কর‍্যা ডাকি
ভিন গায়ের ঐ নিদয়া বন্দু মোন কাড়িয়া লয়
মোর বুকের মাজে তুষের আগুন গো দিদি জ্বলে আর জ্বালায় ॥

(রেকড : আব্বাসউদ্দিন)

॥ ২ ॥

অ্যালাও[৫] ক্যানে দ্যাকা না পাঁওরে বন্দুধন
কোনবা কাথায়রে চ্যাংড়া ব্যাজার[৬] হইচে মোন।
চ্যাংড়া গেইল্ যুক্তি করিয়া
অ্যালাও ক্যানে না আইসে মোর পাঞ্জারের শুয়া[৭]।
কতজনে মোক্ কতয় কয় বালুশ ভিজিয়া যায় রে
বুক মোর ভিজিয়া যায় আংখির জলেরে[৮] বন্দুধন
তোর জইন্যে মোর ঝুরে দুই নয়ান ॥
চ্যাংড়া বন্দুর কটুর মন[৯] তোর জইন্যে মোর ঝুরে পাণ
যৈবন ক্যানে কান্দি কান্দি উটেরে বন্দুধন
অসময়ে মোক্ ছাড়িয়া না যান্ ॥

(গোপালচন্দ্র দে। দিনহাটা, কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

ও মোর ব্যানিয়া বন্দু[১০] রে—।
দিবার চাইলেন নাকের নোলক ছাড়িয়া গেইলেন রে
যেজন সোনার বানিয়া হয়, নিক্তিত্[১১] করিয়া সোনা ওজন করিয়া দ্যায়
হাতেরো নিলেন কোচেরো নিলেন ঠকাইলেন্ মোক বিদুয়াক্[১২]
চৌখের পানি পীরিতির কাথাতে ॥

শব্দার্থ : ১-ঢেঁকিতে পাড় দেয় ২-বড় বোন ৩-ছোট বোন ৪-পিছন দিকে ৫-এখন ৬-রাগ ৭-পিঞ্জরের শুক পাখী ৮-চোখের জলে ৯-কঠোর মন ১০-বেনে বা বণিক বন্ধু ১১-নিখুঁত দাঁড়ি পাল্লায় ১২-বিধবাকে।

যেজন সোনার বানিয়া হয়,
সোনায় উপায়[১] মিশল করিয়া নোলোক বানেয়া দেয় ।
ওরে বানিয়া বন্দুরে মোক্ কবজ গড়েয়া দে
ওরে বিয়ার সোয়ামী মরিয়া গেইচে স্বপোনে[২] আইসে ॥

(রেকর্ড : ধীরেন সরকার)

॥ ৪ ॥

বন্দুধন তুমি আমি শিশুকালে খেলা খেলচি এ্যাকই সাতে[৩]
ইস্কুলে পড়চি দিনহাটার বন্দরে ।
কত পরীক্ষায় পাশ করিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করিয়া
ইস্কুল ছাইড়লাম মনের দুস্কেতে ॥
বাপো মাওয়ের মোন হইল্ ব্যাজার, মোক ইস্কুলে যাবার না দ্যায় আর
আরো না দেয় মোক্ বাড়ীর বার হ'তে ।
বন্দুধন না দ্যাকিয়া তোমার মুক ভাঙ্গে মোর নারীর বুক
মন কান্দে মোর তোমার বাদে ॥
তোমরা ইস্কুল ছাড়ি কালেজ গেইলেন চলিয়া গেইলেন দিনহাটা ছাড়িয়া
বন্দু সদায় সদায় চিঠি পাঠাঙ তেঁও বন্দু তোর খপর না পাঁও
মোক্ ভুলিলেন বি এ পাশ করিয়া ।
তোমরা কইরলেন বি এ পাশ মোর কইরলেন সব্বোনাশ
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া গেইলেন মোরে ।
বিয়াও যদি না করেন মোক্, সইত্য নষ্ট কইরলেন ক্যান
কলঙ্ক রইল জগতের মাঝারে ।
বয়স হইল মোর আঠারো বছর না আইসে মোর বিয়ার খপর
তেঁই বন্দু অদয়া করলু মোক্
দুস্কের কাথা কওঁ কারে যৈবন জ্বালায় না পাঁও থাকিবারে ॥

(কামিনীকুমার রায় । দিনহাটা, কোচবিহার)

শব্দার্থ : ১-সোনা রূপায় ২-স্বপনে ৩-এক সঙ্গে ।

॥ ৫ ॥

আজি কিরে মজার[১] দক্ষিণা হাওয়া বাইরে-খোলানে[২]
মনের হাউসে[৩] বান্দন্ খোপা আউলাইল্ বাতাসে।
আজি আসিবার চাইলেন সোনাবন্দ্ ঐ কদম তলে ॥
দুষ্টা হাওয়া কি যে খেলা খেলুলু[৪] মোর সাতে[৫]
ওকি বুকোর বসন[৬] বন্দুর গামছা লুটালু পাথে[৭]।
হেইল্যা পড়িল্[৮] পুন্নিমার চান্দ[৯] বাঁশের আড়ালে
ওকি সোনাবন্দ্ ভাবের অসিয়া অ্যালাও[১০] না আইসে ॥

(সুনীতি রায়। খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার)

॥ ৬ ॥

হাওয়া গাড়ী[১১] চলিয়া গেইল মোর বন্দু আইল্ কৈ
জলপাইগুড়ির চিড়া মুড়ি গৌরীহাটের দৈ
খাইবার ব্যালা মনে পড়ে গো মোর চ্যাংড়া বন্দু কৈ ॥
জলপাইগুড়ির রেশমী চুড়ি পাইসা পাইসা দাম[১২]
তারই মইদ্যে[১৩] নেখা আচে[১৪] মোর চ্যাংড়া বন্দুর নাম।
হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেইল্ মোর বন্দু আইল কৈ ॥

(বীনাপাণি রায়। কোচবিহার)

৪. বিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

আজি কিসের মোর আতর[১৫] কিসের মোর কাপড় সই
কিসের মোর গায়বা সাবোন[১৬] মাখা।
(ওরে) সোয়ামী না মরিচে সেন্দুর না পরিচে[১৭]
হস্তের না গেইচে শাকা[১৮] ॥
আজি ব্যালা যকোন দুকুর হয়[১৯] মোর তকোন মনে কয়
সোয়ামী বুজি আইসে হেথা।
তকোন থ্যালে[২০] ভাত বাড়িয়া রই মুই কান্দিয়া
পতিদোনের[২১] নাই মোর দ্যাকা ॥

শব্দার্থ: ১-আনন্দের ২-বাইরের উদার প্রান্তরে ৩-মনের আনন্দে ৪-খেলিছে ৫-আমার সঙ্গে ৬-বুকের কাপড় ৭-পথে ৮-অস্তমিত হতে চললো ৯-পূর্ণিমার চাঁদ ১০-এখনও ১১-মোটরগাড়ী ১২-এক এক পয়সা দাম ১৩-মধ্যে ১৪-লেখা রয়েছে ১৫-গন্ধ দ্রব্য ১৬-সাবান ১৭-সিন্দুর পরিনি ১৮-শাঁখা ১৯-দুপুর হয় ২০-থালায় ২১-পতিধনের।

আজি সোয়ামীর মরণে জীবন অকারণ সই
জীবন যায়না সকী রাকা ।[১]
আজি সবেনা[২] শাকা পেন্দে[৩] মোর একোন মনবা কান্দে
সেন্দুর না গেইচে মুচিয়া[৪] ॥
আজি সবেনা মাচোক্[৫] খায় মোর তকোন মনে কয়
সোয়ামী বুজি গেইচে মোর সেথা ।
ওরে সবেনা আইসে ফিরে দেকোং তকোন বাইরে
সোয়ামীদোনের নাই মোর দ্যাকা ॥
তকোন দ্যাকোং খানি খানি[৬] চউক্ষে পড়ে পানি
জীবন যায়না সকী রাকা ॥

(রেকর্ড : মঙ্গেলা বর্মণ)

॥ ২ ॥

আবো—নওদারীটা[৭] মরিয়া মোর সে হইসে[৮] হানি
আন্দার ঘরোত্ পড়ি থাকোং পড়ে চউক্ষের পানি ।
আবো টপ্পাস্ কি টুপ্পুস[৯] করিয়া ॥
আবো—সগায়[১০] বেড়ায় টারি টারি[১১] নাল শাড়ী পিন্দিয়া
তোলা আছে ঢাহাই[১২] শাড়ী কায় যাইবে পিন্দিয়া
ওকি ঢাস্সাম্ কি ঢুস্সুম ও কি খস্যোর কি মস্যোর[১৩] করিয়া ॥
আবো—আশপড়শী নাইওর যায় দোকোল জুড়িয়া[১৪]
মোর নওদারী থাকলে হয় নাল শাড়ীখান পিন্দিল্ হয়
পাছোত্ গেইলে হয় চালালাৎ কি ছালালাৎ করিয়া ॥
আবো—আসিল যে ঝস্কাল[১৫] শুইয়া নিদ্রা যাও
মোর নওদারী থাকিল্ হয় বগলত্ বসিল্ হয়
পাংখা হাকাইল্ হয় ক্যারোরৎ কি কুরুরোৎ করিয়া ॥
আবো—আসিল যে বাইস্যা[১৬] কাল মাচ মারি আনিনু
মোর নওদারী থাকিল্ হয় বগলত্ বসিল্ হয়
মাচ কুটিল্ হয় ঘ্যাচ্চোত্ কি ঘোচ্চোত্ করিয়া ॥

শব্দার্থ : ১-রাখা ২-সকলে ৩-পরে ৪-মুছে ৫-মাছ ৬-বারে বারে ৭-নতুনবৌ ৮-হয়েছে ৯-চোখের জলপড়ার শব্দ ১০-সকলে ১১-পাড়ায় পাড়ায় ১২-ঢাকাই ১৩-নতুন শাড়ী পরে চলার শব্দ ১৪-বাচ্চা কোলে নিয়ে ১৫-গ্রীষ্মকাল ১৬-বর্ষাকাল ।

আবো—নওদারীটা মরিয়া মোর সে হইসে দুখ
নদীর পাতারের মত ভাঙিয়া পড়ে বুক
আবো হিড়িড়িম্ কি হাড়াড়াম্ ওকি দিড়িড়িম কি দাড়াড়াম করিয়া ॥
(আব্বাসউদ্দীনের গান। পঃ ৩৪)

॥ ৩ ॥

আই মোর কইলে কাথা[১] পুরায়না।[২]
মোর কোপালে[৩] অ্যাতই যণ্তন্না[৪] ॥
ওকি বিয়ার কাথা বড় কাথা রে হায়রে সব্বোলোকে[৫] জানে
আমার বিয়াও বারণ কল্লেরে[৬] ঐনা কোনবা মাহাজনে[৭]।
ওকি মাহাজনের নাগাইল্ পাইলে রে ও তার সঙ্গে চলি যামো
হাত ধরিয়া দুইকান কাথা[৮] রে ও তাক বুজিয়াক্[৯] কব ॥
পতি যকোন হাল জুড়তো রে ঐনা নিদুয়া-পাতারে[১০]
ঔদের[১১] ডাকে বদন কালারে ঐনা দ্যাকলে পরাণ ফাটে
কি আষাঢ় শাওণ মাসেরে গাইরোস্তে[১২] বান্দে আলি[১৩]
ভর যুবতী কাণ্ডা সোনারে মোক্ বিদি করলে আড়ি রে[১৪]
আই মোর কোপালে অ্যাতই যন্তন্না ॥
(রেকর্ড : কেশব বর্মন)

৫. পরকীয়া প্রেম

॥ ১ ॥

ক্যানরে বাপোই[১৫] তুই মারিলু ইশিরা[১৬]
কাণ্খে আচে মোর ভরা জলের ঘড়া।
(ওরে) মইরে গেইচে মোর বিয়ার সোয়ামী বান্দিচোং[১৭] মন কতয় করি
বান্দা ছিল্ মোর নারীর মন দিলেন আউলিয়া ॥[১৮]
(ওরে) বাকুনিবারা[১৯] ঘরোত থুইয়া মুই নারীটা যাবার চাও
কোলার-ছাওয়া[২০] ফ্যাকনা[২১] করে অ্যালায় যাওয়া হবার নঁও।
তকনে বন্দু মোর মাকার-মুকুর[২২] হাসে ॥

শব্দার্থ : ১-কথা ২-ফুরায় না ৩-কপালে ৪-যন্ত্রণা ৫-সকলে ৬-নষ্ট করলে ৭-কোন কারিগর ৮-দুখানা কথা ৯-তাকে বুঝিয়ে ১০-ধু ধু প্রান্তরে ১১-রোদের ১২-গৃহস্থে ১৩-বাঁধে আল ১৪-বিধবা ১৫-অল্প বয়সী ১৬-ইশারা ১৭-বেঁধে রেখেছি ১৮-এলোমেলো ১৯-ধান ভানার কাজ ঘরে তুলে ২০-কোলের ছেলে ২১-ফ্যাসাদ বাধায় ২২-মুচকি মুচকি।

এলকার[১] মনে তুই একনে ফিরিয়া যা সময় মত আসিস বাপোই
কদম তলায় মুই থাকিম্ বসিয়া ॥

(উত্তরবাংলার পল্লীগীতি : চট্‌কা খণ্ড—হরিশচন্দ্র পাল। ১৩৮২ পৃঃ ২১১)

॥ ২ ॥

বাড়ী ছাড়িয়া কোথা যান্ দোহাই আল্লা মাতা[২] খান্
কালা মুরগীটা ওস্যান[৩] বইস্যাছে, ও মরি হায় হায় রে ॥
কইন্যা যকোন তোর বাড়ী যাই কত মানষিরে[৪] দেখিবার পাই
দৌড়্যা পালাই মুই পাটা বাড়ীর ভিত্‌রে[৫]।
কইন্যা আশা দিলি ভরোসারে[৬] দিলি কলার থোপাত্ মোক বসায়া থুলি
সারা আইত্ মোক্ মশায় কামড়্যাছে[৭]।
কইন্যা আগম নিগমটা[৮] না বুজিয়া ভাতের উতালটা[৯] দিলি ঢালিয়া
সোনা অঙ্গে মোর ফোসা[১০] পইড়্যাছে।
বিশোয়াস[১১] যদি না হয় তোর জামা খুল্যা[১২] দ্যাকেক্ মোর
দেড় ট্যাহা[১৩] স্যার[১৪] ফিনাইল্ ত্যাল গ্যাচে[১৫]।

(শৈলেশকুমার রায়। কালিয়াগঞ্জ। পশ্চিমদিনাজপুর)

॥ ৩ ॥

আই মোর কইলে দুস্ক[১৬] ফুরায় না পীরিতির এক অদ্‌গা[১৭] ভাবনা।
আজি কোন শিতানে[১৮] আইত পোয়াইছুঙ[১৯] হারাইল্ কানের দুলকোনা ॥
মনোত্ নাই মোর খোশখোনা[২০] পীরিতির এক অদ্‌গা ভাবনা।
(আর) যদি বন্দু আইসেন বাড়ী মুই আবাগী কামাই ছাড়ি
ভুল্‌কি মারি[২১] দ্যাখোঙ্ বারে বারে
ওরে সোয়ামী মোরে ড্যাকে কয় খাইবার দিয়া গেইলে হয়
অদগা জবালা শৈল্লে[২২] না সয় মোরে ॥
তকোনে বাকুনিবারা ঘরোত্ থুইয়া জলোক্ যাঁও মুই কলসী লইয়া
ঐ মানষিডার নাগাইল্ ধরির আশে[২৩]।

শব্দার্থ : ১-এখনকার মত ২-মাথা ৩-ডিম পাড়ার জন্য খোপে বসা ৪-মানুষকে ৫-পাট বাগানের মধ্যে ৬-ভরসা ৭-কামড়িয়েছে ৮-আগুপাছু ৯-ফ্যান ১০-ফোস্কা ১১-বিশ্বাস ১২-খুলে ১৩-দেড় টাকা ১৪-সের ১৫-খরচ হয়েছে ১৬-দুঃখ ১৭-বাড়তি ১৮-শিয়রে ১৯-শুইয়েছে ২০-খুশির ভাব ২১-উঁকি দিয়ে ২২-শরীরে ২৩-নাগাল পাওয়ার আশায়।

ওরে ফ্যাক্না করে নিন্দের ছাওয়া[১] না হইল্ মোর জলোক্ যাওয়া
বন্দ্ থাক্কাত্ কি থক্কুত্ করিয়া হাসে ॥
তকোন মোন মোর উরাঁও বাইরাঁও করে পায়ায়াও[২] বন্দুর নাগাইল্ না পাঙ
মন্নের কামাই ফুরায় না আইতে দিনে।
ওরে ন্যাদাও[৩] পীরিতির মাতাত শৈল্লে না সয় উগ্লা উৎপাত
মোর মতোন আর সইবে কোন সতীনে।
অ্যাই মুই এমোন হইলে আর বাচিম্ না ॥
(উত্তরবাঙলার পল্লীগীতি : চট্কা খণ্ড—হরিশ্চন্দ্র পাল, পৃ: ১৪৮)

॥ ৪ ॥

তুই মোর সুন্দর হে মামা মুই তোর ভাগিনী
(ওরে) আস্তায়[৪] পথে দ্যান মোক্ গুয়া মামা নোকের জ্বালানী[৫]।
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী মামা মইদ্যে[৬] বাঁশের আড়া[৭]
(ওরে) হাতে হাতে গুয়া দিতে মামা দ্যাক্চে ছোট দ্যাওরা[৮] ॥
আমার বাড়ী যান ওরে মামা মামা বইস্তে দিমোঁ পিড়া।
(ওরে) জলপান কইরতে দিমো মামা সরুধানের চিড়া ॥
সরু ধানের চিড়া মামা হে মামা বরণী ধানের খই
(ওরে) চাল্‌ত আছে চাম্পা কলা গামছা বান্দা দই ॥
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী মইদ্যে ধারের নদী[৯]।
(ওরে) ক্যামন করি হমোঁ পার রে পাকা[১০] নাই দ্যায় বিদি ॥
আমার বাড়ী যান ওরে মামা বইস্তে দিমোঁ মোড়া
(ওরে) হৃন্দে[১১] হেলানী দিয়ারে মামা বাজান অসের[১২] দোত্রা ॥
(গঙ্গাধর দাস। দেওয়ানহাটা, কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

পানিয়া মরা মাচ মারে রে—
ভাশুর শ্বশুর মাচ মারে মোর রুই আর কাতেলা

শব্দার্থঃ ১-ঘুমিয়ে থাকা ছেলে ২-পেয়েও ৩-লাথি মারি ৪-রাস্তায় ৫-লোকের ঈর্ষা ৬-মধ্যে ৭-বাঁশের বেড়া ৮-ছোট দেওর ৯-খরস্রোতা নদী ১০-পাখা ১১-হৃদয়ে ১২-রসের।

ভাবের দ্যাওরা মাচ মারে মোর চন্দনী কুরুসা
পানিয়া মরা মাচ মারে রে চান্দা আর ধুতুরা রে ॥
ভাশুর শ্বউরের মাচ বাচোঙ[১] মুই যতন করিয়া
ভাবের দ্যাওরার মাচ বাচোঙ মুই চাকানা করিয়া
পানিয়া মরার মাচ বাচোঙ মুই ট্যাবগিয়া টুবগিয়া[২] রে
ভাশুর শ্বউরের মাচ রাদোঙ[৩] মুই ঝোলেয়া করিয়া
ভাবের দ্যাওরার মাচ রাদোঙ মুই তৈলোতে ভাজিয়া
পানিয়া মরার মাচ রাদোং মুই ছ্যাকার ছিটা দিয়া[৪] রে ॥
ভাশুর শউরকে খাবার ডাকোও বাবা না বলিয়া
ভাবের দ্যাওরাক খাবার ডাকোঙ চোকের ইশিরা দিয়া
পানিয়া মরাক্ খাবার ডাকোং রে নাটির গুতা দিয়ারে ।।
ভাশুর শ্বউরোক খাবার দিচোঙ জাগা না করিয়া
ভাবের দ্যাওরাক খাবার দিচোঙ বগলত বসিয়া
পানিয়া মরাক খাবার দিচোং থ্যারকিরা থোরকিয়া রে ।।[৫]

(বিরজা সেন। কোচবিহার)

৬. সমাজচিত্র

ক. জীবনের ছবি

॥ ১ ॥

অ্যাই মুই সকীন[৬] দ্যাকিয়া বসনু রে কাইন্[৭]
দিন মানেনা পরে হাতের গাইন্[৮] ।
দিনে আইতে বেড়াও[ঃ] বারা বানি[৯]
কথা কইলে পড়ে চোখের পানি
সকালে উটি নাগায় ডাঙ্গের ধুরধুরি[১০]
বাসি মুকোত[১১] কয় মোক দে খাবার করি ॥
একদিন যদি কামাই[১২] করে তিনদিন থাকে বসিয়া
ছোড দ্যাওরা দ্যায় মোক্ কাপড় কিনিয়া ।
দয়ার দাদায় মোক নাইওর নিবার চায়
দুইডা দিনের বাদে[১৩] অ্যাই মোক্ যাবারে না দ্যায়[১৪] ॥

শব্দার্থ ঃ ১-বাছবো ২-কোনরকমে ৩-রাঁধবো ৪-ক্ষার জল ছিটিয়ে ৫-দায়সারা ভাবে ৬-সৌখিন ৭-বিয়ে ৮-মুষ্টাঘাত ৯-ধান ভেনে বেড়াই ১০-লাঠির বাড়ি ১১-বাসি মুখে ১২-রোজগার ১৩-দুদিনের জন্য ১৪-যেতে দেয়না ।

এইবার নাইওর গেইলে আর না আসিম ঘুরিয়া
আটে-চারে[১] মারে মোক দুয়ার বান্দিয়া[২]
সাওনা[৩] কাথায় কাথায়[৪] আগ[৫] করে
বালাই দ্যাঁও[৬] তোর সাঙ্গেনার মাতাত্ রে[৭] ॥

(যোগীন রায়। হলদিবাড়ী কোচবিহার)

॥ ২ ॥

আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর[৮] চল যাই কইলকাত্তা শ'র[৯]
শ'রে ভাড়া কইরলাম ঘর, থাকি দোত্লার উফর[১০]
দিনে দিনে গিন্নীর মোন করে ফর ফর[১১] ।
গিন্নী গাড়ী ঘোড়া দৌড়িবার চায়, গিন্নী দ্যাক্তে চায় দিল্লীর শ'র
আইসে এই কইলকাত্তা শ'র ।
গিন্নী আলতা পরে পায়, পায়ে ছ্যান্ডেল[১২] নাগায়
চউখে চশমা হাতে হাতঘড়ি দ্যায় ॥
গিন্নীর ভ্যানিটি ব্যাগ সোনার গয়না গায়
ও গিন্নী বাইন্তে[১৩] বলে লেকে ঘর ॥
ভেইবে মুকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপ, গিন্নীর আছে সকলে
সোয়ামীর কোলাত্ দিয়া ছাওয়া গিন্নী আস্তায় চলে ।
ও তার ডুরে শাড়ী রেশমী চুড়ি তবু আমায় ভাবে পর
আইসে এই কইলকাত্তা শ'র ॥

(নারায়ণ পাল। কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

ওকি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও
না পারোঁ মুই কামাই[১৪] করিবার ।
হাল বয়া[১৫] আসিলু তুই ঝাঁপি[১৬] মাতাত্ দিয়া
হুত্তি[১৭] থো তোর নাঙ্গল জোয়াল[১৮] বারা বানেক[১৯] আসিয়া
বারা বানিলু ভালে করিলু খুদি চাইট্টা খা
কলসী দুডা ভার সাজেয়া[২০] জল ধুলিয়া[২১] যা ।

শব্দার্থ : ১-আষ্টে পৃষ্ঠে ২-দরজা বন্ধ করে ৩-স্বামী ৪-কথায় কথায় ৫-রাগ ৬-দূরছাই করি ৭-মাথায় ৮-মন ছটফট করে ৯-শহর ১০-উপর ১১-উড়ু উড়ু ১২-স্যান্ডেল ১৩-বাঁধতে ১৪-উপার্জন ১৫-বয়ে ১৬-মাথার আচ্ছাদন ১৭-ওখানে ১৮-জোয়াল ১৯-ধান ভানা ২০-বাঁকে করে ২১-ঢেলে ।

জল আনিস[১] ভালে করিস ঘরের কোণাত্ থো
তিনদিনিয়া[২] বাসি ভোগা[৩] ভাল করিয়া ধো ।
ভোগা ধলু ভালে করিলু তুই সে পাণের নাত[৪]
চট করিয়া চড়েয়া দে তুই দুইডা মাইনসের ভাত ॥
ভাত রান্দিলু ভালে করিলু তুই সে পাণের পতি
বিচনাখান্ পাতেন[৫] অ্যালা ছাওয়া ধরিয়া সুতি[৬] ॥

(উত্তর বাংলার পল্লীগীতি ; চটকা খণ্ড । হরিশ্চন্দ্র পাল । ১৩৮২ । পৃঃ ১৪৬)

॥ ৪ ॥

ও শাউড়ী মাই[৭] না পারি মুই ভাত আন্দিবার[৮]
মুই তো মন্ডলের বিটি[৯] ভাত আন্দিবার না জানি
ভাত খাওতো ধর আন্দুনী[১০] ।
ও শাউড়ী মাই না পারি মুই বারা বানিবার[১১]
মুই তো মন্ডলের বিটি বারা বানিবার না জানি
ভাত খাওতো ধর বারাবানী ॥[১২]
ও শাউড়ী মাই না পারি মুই থালা মাজিবার
মুই তো মন্ডলের বিটি থালা মাজিবার না জানি
ভাত খাওতো ধর নাজুনী ॥
ও শাউড়ী মাই না পারি মুই গোবর ফ্যালাবার
গোবর ফ্যালাইতে হাত গোন্দায়[১৩]খাওনের কষ্ট হয়
ঝাঁটা মারি মুই গরুর কোপালে ॥
মুইতো মন্ডলের বিটি গোবর ফ্যালাবার না জানি
ভাত খাওতো ফ্যালাও গোবরখানি ॥

(পানিয়া দাস । কোচবিহার)

॥ ৫ ॥

ঘুস্[১৪] করিয়া শুনিনু মুই ভুপেনের বলে বিহা[১৫]
ডিমিলার কুণ্ঠেকের[১৬] বলে সিয়ান[১৭] কইন্যা দিয়া ।

শব্দার্থ : ১-জল তুলে ২-তিনদিনের ৩-বাসনপত্র ৪-প্রাণের নাথ ৫-বিছানা করা ৬-শুই ৭-শ্বাশুড়ীমা ৮-রাঁধতে ৯-সমাজপতি বা বড়লোকের মেয়ে ১০-রান্নার সরঞ্জাম ১১-ধান ভানা ১২-ধান ভানার মুষোল ১৩-গন্ধ হয় ১৪-হটাৎ ১৫-বিয়ে ১৬-কোথাকার ১৭-যুবতী ।

সেইদিনা হাতে[১] মনডা মোর তিরিত্ তারাত্[২] করে
হোকোর চোখোর[৩] গাজাইসে[৪] কাটা নিন্দে না ধরে ॥
পঞ্জি দ্যাকো[৫] পুন্হি দ্যাকো গণাও আঙ্গুলের মাতা[৬]
চুলকাইতে চুলকাইতে বেড়াছ মুই মাতা
দহি চুড়া ভিরিত্ ভারাত্[৭] কার শুনিবো কত
দহি চুড়া খায়্যা প্যাটকানা[৮] মোর হইসে টিনটিনা[৯]
কোটোরোই ব্যাঙের মোতো[১০] ॥
বাউ বিহাও করলো ভালে করলু আচ্চায় করিলু কাম
ধানভূকা আনিয়া দে অ্যাকটা নটোইভরা ছাম্ ॥
(চারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ি)

॥ ৬ ॥

ডাইল্ পাক[১১] কররে কাচা মরিচ দিয়া।
গুরুর কাচে নাওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়া ॥
ছোড বউ চড়ায় ডাইল্ মাইঝাল্[১২] বউ ঝাড়ে
আবার বড় বউ আসিয়া কাটি দিয়া নাড়ে।
আমার শ্বউর করে ঘুসুর মুসুর ভাশুর করে গ'সা[১৩]
নিদয় হেন সোয়ামী আইস্যা ধরলো চুলের খোসা[১৪]
আমার শাউড়ী আচে ননদ আচে আচে ভাইগ্না বউ[১৫]
হায়রে, অ্যামন কইর‍্যা মাইর মারিল্[১৬] আউগাইল্[১৭] না কেউ ॥
ডাইল্ পাক কররে কাচা মরিচ দিয়া
গুরুর কাচে নাওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়া ॥
(শৈলেশকুমার রায়। কালিয়াগঞ্জ পশ্চিমদিনাজপুর)

॥ ৭ ॥

নারী—নাইওর[১৮] ছাড়িয়া দ্যাও মোর বন্দু বন্দু নাইওর ছাড়িয়া দ্যাও
এইবার নাইওর গেইলে কাইলেহে[১৯] থুইয়া যাইবে মাও ॥
পুরুষ—যেও কাথা কইলেন কইন্যাহে ওকইন্যা সেও কাথা জানি
একবার নাইওর ছাড়িয়া দিয়া পাও ধরিয়া আনি (কইন্যারে) ॥

শব্দার্থ : ১-হতে ২-আনন্দে ছটফট করছে ৩-বিছানায় ৪-কাঁটা গজিয়েছে ৫-পঞ্জিকা ৬-মাথা ৭-দই চিড়ে খাওয়ার শব্দ ৮-পেটটি ৯-টানটান্ ১০-গর্তের ব্যাঙের মত ১১-রান্না ১২-মেজো ১৩-রাগ ১৪-চুলের মুঠি ১৫-ভাগ্নে বউ ১৬-মারমারলো ১৭-এগিয়ে এলোনা কেউ ১৮-বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি ১৯-কালকেই।

নারী—দাদা আইছে তোমার বাড়ীত্ হে বন্দু নাইওর ছাড়িয়া দ্যাও
এক নজর দ্যাকিয়া আইসোঙ দয়ার বাপো মায় হে ॥
পুরুষ—যেও কাথা কইলেন কইন্যা হে ও কইন্যা কাথা মন্দ নয়
রিমিঝিমি দাওয়ার ঝাড়ি[১] হে অ্যাকলা ঘরে ক্যামনে রওয়া যায় ॥
নারী—ক্যামন তোমার কাথা বন্দু হে বন্দু ক্যামন' তোমার হিয়া
শরমে মরিবার চাই হে গালায়[২] দাঁড় দিয়া (বন্দু হে) ॥
পুরুষ—তুমি ক্যানে মইরবেন কইন্যা হে কইন্যা আমার পরাণ হরি
তুমি হন দরিয়া কইন্যা হে ও কইন্যা আমি ডুব্যা মরি ॥
নারী—আদ্য গুরু পিতারে মাতা বন্দুু জনমদাতা বাপে
কাণ্ডাসোনা বুড়ার আশা হে নইলে মাইরবে শাপে ।
পুরুষ—শোনেক শোনেক শোনেক কইন্যা হে কইন্যা হিতকাথা কও
পুবের ব্যালা পচ্চিমে গেইলে ছাড়িয়া দিবার নঁও (কইন্যা হে) ॥

(আব্বাসউদ্দীনের গান— । পৃ: ১০৪-১০৫)

॥ ৮ ॥

বুড়ি গেইচে উমরাভিট্যা[৩] অ্যালাও[৪] বুড়ি না আইসে
তিনডা কাটোল[৫] বোক্না[৬] কাড়িছে ।
কাউয়া[৭] কাটোল খায়রে মাশায় কাউয়া কাটোল খায়
খ্যাদাও খ্যাদাও[৮] কাউয়াডা ওকেয়া[৯] ফ্যালায় ।
বুড়িটা হইল ফটক-চাঁদা[১০] আয়নার দিকে চায়
হাটুয়ার[১১] উপর নাল-পাটানি[১২] থমকে হাটি যায় ॥
একদিনা বুড়াবুড়ি ঝগড়া নাগে বুড়িক দিল্ ধাক্কা
রইল বুড়িটা চালিত্[১৩] বসিয়া ॥
মোক্ মারিলু ভালে করিলু আগুপাছু তাকালু না
অ্যালায় দেখিম্ তোর ক্যামন মজাটা ॥

(জগদীশচন্দ্র রায় : ময়নাগুড়ি, কোচবিহার)

শব্দার্থঃ ১-বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ ২-গলায় ৩-অন্যবাড়ী ৪-এখনও ৫-কাঁঠাল ৬-বোঁচকা বেঁধে ৭-কাক ৮-তাড়াও ৯-ঠুক্রিয়ে ১০-সৌখীন ১১-হাটুর উপর ১২-লাল রঙের পাটানি (মেয়েদের বস্ত্র) ১৩-বারান্দায় ।

॥ ৯ ॥

হাড় মোর জ্বলিয়া গেইল[১] দ্যাওরা রে, তোমার দাদার পাল্লায় পড়িয়া
জাতি কুল মান গেইল রে ॥
হাউস[২] করিয়া দিচে বিহা পাচ ভাইয়ের সইংসারে[৩] ।
শ্বশুর ভাসুর দ্যাওরা ভালে মিন্‌সা[৪] কোপালপড়া রে[৫] ॥
ইল্‌শা মাচের মাতা দিয়া হবে কচুরশাক
তাইতে ভাসুর দিলেন ট্যাহা[৬] কইরতে বাজার হাট
আর মিনসা আনে ল্যাটা মাচ আর তেলাকচুর পাতারে ॥
ভাইয়ের ছাইলার মুকে ভাতে[৭] গেইলাম বাপোর বাড়ীত্ রে
মিন্‌সে আমার মাকে বলে কেমোন আচেন দিদি রে ॥
হাড় মোর জ্বলিয়া গেইল দ্যাওরা রে ॥

(বুলবুল রায় । কোচবিহার)

॥ ১০ ॥

মাচ[৮] মোর ইলিশারে— ।
শুক্‌ল সুতা শুকল বড়োশী[৯] দরিয়ায় ফেলানু
ওকি উজানে তুলিনু, মাচ না মারিয়া মুই খলাই[১০] ভরালু
বাড়ীত আসিয়া মাচ চান্নিতে[১১] তুলিনু
বটিত্ বেচিয়া মাচ মালই তুলিনু
মালই না তুলিয়া মাচ ঘরে নিয়া গেনু ।
ত্যালত্যালানী[১২] মাচ মোর উপরে ঢাকুনী
মজিল মাচের বাসে[১৩] খাও ননোদিনী
ক্যামনে পরসিমু[১৪] মাচ মুই ইলিশার তরকারী
ভাশুর বসিয়া চালিত্[১৫] করিছে কাছারী[১৬] ॥

(প্রিয়নাথ রায় । গরেয়কাটা, জলপাইগুড়ি)

খ. বিয়ের গান

॥ ১ ॥

মুককোনা[১৭] টুলোরে টুলো সঞ্জা না বালি ।
কান্দে বালি মোর সোনামালার বাদে ।

শব্দার্থ : ১-গেল ২-শখ করে ৩-সংসারে ৪-স্বামী ৫-কপাল পোড়া ৬-টাকা ৭-মুখে ভাতে ৮-মাছ ৯-শুকনো সুতা আর বড়শী ১০-মাছ রাখার বাঁশের তৈরী পাত্র, খালুই ১১-মাছের চুবড়ি ১২-তেল সমৃদ্ধ ১৩-গন্ধে ১৪-এড়াবো ১৫-ঘরের বারান্দায় ১৬-খবরদারী বা তদারকি ১৭-মুখখানা ।

সোনামালা ঘরের মাইয়া কী হইলো যতনে পাইলা রে
সেইনা মালাক নিয়ারে যাইবে পরে ॥
সোনাপংখীর পাংখায় সোনা আও[১] করে যেমন টুনিটুনা রে
সেই না টুনি যাইবেরে পরার ঘরে।
সোনামালা অঙ্গিরে চঙ্গি[২] অঙ্গিলা[৩] উয়ার চলন ভঙ্গি
সেইনা মালা যাইবেরে ঝাপইর পাড়ে ॥
সোনামালা ঘরের চান্দ্ পাতা আচে ভুবনে ফান্দ
সেইবা ফান্দে কাঁয়বা রে দিলেক্ পাও
সোনামালার সোনাগাও সেইনা নোভে মালাক্ লয়্যা যায়
সেইনা বাদে মুকোত্ নাই তোর আও ॥

(আব্বাসউদ্দীনের গান—স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা : পৃঃ ৯০)

॥ ২ ॥

গাও তোল গাও তোল কইন্যাহে কইন্যা পেন্দো[৪] বিয়ার শাড়ী
এই শাড়ী পিন্দিয়া যাইমেন[৫] তোমার শ্বউর বাড়ী[৬] কইন্যা হে।
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা পেন্দো নাকের ফুল
পাতাবাহার কাকই[৭] দিয়া কইন্যা তুলিয়া বান্দো চুল ॥
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা হস্তে পেন্দো চুড়ি
শ্বউরবাড়ী যাইমেন তোমরা যাইমেন স্বপোন পুরী।
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা পেন্দো পায়ে মল
তবক্‌খিলির সোনা দিয়া হন ঝলোমল কইন্যা হে ॥
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা মেহেন্দী পেন্দো হাতে
ধওলার[৮] উপরা[৯] হলদিয়া অং[১০] মাখো খানেক তাতে।
গাও তোল গাও তোল কইন্যা হে কইন্যা কম্নে পেন্দো মাকড়ী
এইবার স্যানে[১১] সোনার কইন্যার ফাটি পড়িল ছিরি[১২] কইন্যা হে ॥

(আব্বাসউদ্দীনের গান। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, । পৃঃ ৮৮-৮৯)

শব্দার্থঃ ১-শব্দ করে ২-রঙ চঙে ৩-চটকদার ৪-পরো বা পরিধান কর ৫-যাবেন ৬-শ্বশুর বাড়ী ৭-চিরুনী ৮-সাদা রঙের ৯-উপরে ১০-হলুদ রং ১১-এইবারে ১২-রূপ খুলে পড়ল।

॥ ৩ ॥

ভাল কইর‍্যা[১] বাজান রে দোত্‌রা সোন্দরী কমলা নাচে
সোন্দরী কমলার পায়ের খাড়ু[২] নাচিয়া যাইতে বাজে রে ॥
সোন্দরী কমলার কমরের[৩] শাড়ী ঐদে[৪] ঝলমল্‌ করে রে
সোন্দরী কমলার নাকের নোলক হাটিয়া যাইতে ঢোলে রে ॥
সোন্দরী কমলার কানের মাকড়ি ঝলমল্‌ ঝলমল করে রে।
সোন্দরী কমলার গালার মালা নাচিয়া যাইতে পরে রে।
এ বাড়ী হাতে[৫] ওবাড়ী যাতে[৬] ঘাটায় ছিপ্‌ছিপ্‌ প্যানি
গাব্‌রের[৭] ভিজিল্‌ জামা জোড়া কইন্যার ভিজিল্‌ শাড়ীরে ॥

(রেকর্ড: ধীরেন সরকার)

৭. অর্থনৈতিক অবস্থা

॥ ১ ॥

এলা দিনের বা গতিক ভালে নোয়ায় রে[৮] ও মুই ক্যামনে বাচিয়া রঙ
ঘরে মোর ভাত নাই পেন্দনে কাপড় নাই ওহো রে—।
এলা মুই শরমে বাচোং না রে, ওকি দিনো দিলেক বিদি ওহো ॥
বৌয়ের হাতের পৈছা খাড়ু[৯] ও মুই ব্যাচেয়া[১০] খাইচোং রে
এলা ক্যামন করিয়া বাঁচিয়া রমো ওহো।
বৈশাখে বিত্‌রী[১১] হেমতি ভাদরে[১২] ওরে মাঝিয়াত্‌[১৩] সরিষা কান্দে
(ওরে) আদখান ভাগ তার জমিদারের (ওহো)
আর আদখানাতে মোর চলেনা রে। আইমুই ক্যামনে বাঁচিয়া রঙ
প্যাটের ভোকত্‌ মোর প্যাটোত্‌ কান্দেরে ওমুই গগনে পাতংরে হিয়া
বিদি দ্যাহার ভিতি চায়া দেখোং মোর বাতি বুজি যায় নিব্যা রে ॥

(আব্বাসউদ্দীনের গান—স্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, । পৃ: ৯২)

॥ ২ ॥

নাক ডাঙ্গেরার[১৪] ব্যাটাটা, চউখ ডাঙ্গেরার লাতিটা[১৫]
মোক্‌ ভুলালু সতের খাড়ু[১৬] দিয়া।

শব্দার্থ: ১-করে ২-পায়ের মল ৩-কোমরের ৪-রোদে ৫-হতে ৬-যেতে ৭-যবরের ৮-নয় ৯-হাতের অলংকার ১০-বিক্রী করে দেওয়া ১১-বৈশাখ মাসে বিতরী ধান ১২-ভাদ্র মাসে হৈমন্তী ধান ১৩-এই দুই সময়ের মাঝে ১৪-নাক-খেকো (গালাগালি বিশেষ) ১৫-চোখখেকো ১৬-হাতের অলংকার।

তকনে না কচিস[১] তুইরে হাল চাইরখান্ গরু পাঁচ হাল[২]
ছেউটি গরুর[৩] ন্যাখা-জোখায়[৪] নাই।
(ওরে) বাড়ীত্ আসিয়া দেখলু মুই চাতুরালি করলু তুই
ঘরোত্-হিনা তর ছনে দিবার নাই।
তকনে না কচিস্ তুই রে মোটা চাউল খাইনা।
সরু চাউলের ন্যাখা-জোখায় নাই।
(ওরে) বাড়ীত্ আসিয়া দেখলু মুই চাতুরালি করলু তুই
ঘরোত-হিনা তর ক্ষুদির গুড়ায় নাই[৫] ॥
তকনে না কচিস তুইরে মোটা কাপড় পিন্দিনা
সরু কাপড়ের ন্যাখা-জোখায় নাই
বাড়ীত আসিয়া দেখঙ মুই চাতুরালি করলু তুই
ঘরোত্ হিনা তোর ফ্যাড়া ত্যানায় নাই[৬] ॥
তকনে না কচিস তুইরে দোমহলা তেমহলা
টিনের ঘরের ন্যাখা-জোখায় নাই
বাড়ীত আসিয়া দেখঙ মুই চাতুরালি করলু তুই
গাও গড়েবার বিচিনা না পাঙ মুই ॥

(বকুল রায়। বানেশ্বর, কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

ও দিদি শোনেক্[৭] একটা কাথা কঙ[৮] তোক ছাড়া আর কাক শাইকত্[৯]
তুই ছাড়া আর কবার জাগায়[১০] নাই।
(আর) বাপোমাওয়ের কোপাল[১১] পড়া[১২] মোরও নারীর অল্প পড়া
সেইজইন্যে ভাল পাত্তর[১৩] আইসে নাই ॥
আই. এ, বি. এ, ম্যাট্রিক পড়া[১৪] তার সাতে[১৫] নাই নেকে জড়া[১৬]
জড়া নেকিচে মাইনর পাশ করা।
বিয়াও করি আইন্চে হাতে[১৭] নাই দ্যায় মোক টারি ব্যাড়াইতে[১৮]
মোক্ করিচে ধরারতলে এন্দুর[১৯]।
(আর) গয়নার কাথা কইলে কালে[২০] তকোনে চৌউখ করকেয়া[২১] ওঠে
কিনিয়া না দ্যায় এক পাইস্যার সেন্দুর ॥

শব্দার্থ : ১-বলেছিলি ২-পাঁচ জোড়া ৩-দুগ্ধবতী গাভী ৪-লেখাজোখা অর্থাৎ অগুনতি ৫-চাউলের কণা ৬-ছেঁড়া ন্যাকড়া ৭-শোন ৮-কথা বলি ৯-কার কাছে ১০-জায়গা ১১-কপাল ১২-পোড়া ১৩-পাত্র বা বর ১৪-ম্যাট্রিক ১৫-সঙ্গে ১৬-বিয়ে (জোড় বাঁধা) ১৭-হ'তে (যেদিন হ'তে) ১৮-পাড়া বেড়াতে ১৯-কলে আটকানো ইন্দুরের মত ২০-বললে পরে ২১-রাঙিয়ে।

বাপোমাওয়ের বাড়ী যায়া এগ্‌লা কাথা[১] দেইম কয়া
না হয় খাইম বারানী বানিয়া[২] ॥

(সুশীল দাস। কোচবিহার)

॥ ৪ ॥

সতীন নিকা করি আইন্‌লে তোক্‌ ঝগড়া করি মাইল্লে মোক্‌
মোক্‌ সজালু[৩] ধরারতলে এন্দুর।
ওরে ভাত না কাপড় ধুড়িরা চাপড়[৪] দয়ার দাদাক্‌ দিচোং খপর।
পানিয়া মরা ছাড়িয়া না দ্যায় নাইওর ॥
আই মোর বন্দুর বাড়ী ভাসান গান[৫] মনডা হইচে উচাটন[৬]
পানিয়া মরা শুইনলে না মোর কাথা।
ওরে নাউশাক কুমুড়ার ফুল আটিয়া কালা[৭] গরম দুলাই[৮]
আই ছ্যাকা দিয়া আন্দিম্‌ মরার মাতা[৯]।
মরা সাদের কাথা[১০] পুচ কইরলে দুই চোউখ করকেয়া ওটে
কিনিয়া না দ্যায় এক পাইস্যার সেন্দুর।
যেগুণে[১১] মোর দয়ার দাদা কিনিয়া দিচে হাতের শাকা
মুরাদ নাই হয় দিবার একখান কাপড়।

(উত্তমকুমার দাশ। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি)

৮. উদ্ভট কল্পনা

॥ ১ ॥

ও ভাই হালুয়া মাজি[১৩] চল যাই বহিয়া নদী
আন্দি আন্দি পান্হারে[১৪] ভাই খাদা খাদা[১৫] ডাইল
খায়না বুড়া লাড়ে চাড়ে[১৬] বুড়িক মারে গাইল্‌[১৭]।
তালগচে শৈলের[১৮] পোনা শিয়ালে ধইর‍্যা খায়
তাই দেইখ্যা খাদুর চাচী পলো[১৯] নিয়া যায়।
গাই বিয়াইলো[২০] গহীন জলে কুম্ভীর থাকে চালে[২১]
ভেড়া বিয়াইলো মাচ তলাতে[২২] বাচ্চা নিল চিলে।

শব্দার্থ : ১-এসব কথা ২-ধান ভেনে ৩-বানিয়েছে ৪-নির্দয়ভাবে চড় মারে ৫-বিষহরির গান ৬-ব্যাকুল ৭-বিচিকলা ৮-গায়ের বস্ত্র ৯-মাথা ১০-কথা ১১-যে কারণে ১২-মুরোদ বা ক্ষমতা ১৩-হালুয়া যে হাল বয় বা চাষী, মাঝি ১৪-পান্তা ভাত ১৫-বড় বড় পাথরের বাটি ভর্তি ১৬-নাড়ে চাড়ে ১৭-গালাগালি ১৮-শোলমাছের বাচ্চা ১৯-মাছ ধরার বাঁশের সরঞ্জাম ২০-বাচ্চা হল ২১-ঘরের ছাদে ২২-মাছ যেখানে থাকে অর্থাৎ জলে।

বড়া গেইল্ মাচ মাইরতে মাইর‍্যা[1] আইন্‌লো চ্যাং
আবার দুই সতীনে ঝগড়া কইর‍্যা বড়ার ভাইঙ্গলো ঠ্যাং।
ও ভাই হালুয়া মাজি চল যাই বহিয়া নদী ॥
(নিত্যানন্দ বর্মণ—দেওয়ানগঞ্জ। জলপাইগুড়ি)

॥ ২ ॥

আরে চ্যাং মাচ[2] বলে মাজি[3] ভাই হামাক না মারিও
কাইল ডারিক্যার[4] হইবে বিয়ারে আমি বৈরাতি[5] যামোঁ।
আরে ও মোর ক্যাকই মাসি, ম্যানকা দিদি
বৌ ভুলানি মাতা ডাংরি ফিচ্যা দুলুকী
ধ্যাং ডিগিল্যা জটা বগিল্যা, আলুক মালুক শালুক ননদিয়া
মোর মায়ই না মোর কে।
কাইল হইবে ডারিক্যার বিয়ারে আজিও চান্দা[6] না আইস্‌লো রে ॥
ইচা মাচ[7] বলে মাজি ভাই হামাক না মারিও
কাইল ডারিক্যার হইবে বিয়ারে আমি ঘটক হয়্যা যামোঁ
ট্যাপা মাচ বলে মাজি ভাই হামাক না মারিও
কাইল ডারিক্যার হইবে বিয়ারে আমি সানাই বাজাইতে যামোঁ
ডারিক্যা মাচ বলে মাজি ভাই হামাক না মারিও
কাইল হইবে আমার বিয়ারে আমি কইন্যাক ঘরে নিমোঁ ॥
(খগেন রায়বর্মন। বক্সীগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)

৯. রঙ তামাশা

॥ ১ ॥

আই মোর সতীনগিলা[8] কয়, মুই বলে আন্দোং[9] জানোঁ না।
এক তোলা কচুর শাক (আর) তিন হাঁটু তার পানি
(ওরে) বাপো বেটি হাসিয়া মরিবে (ও মোর) কচুর শাকে পানি ॥
আই মোর সতীনগিলা কয়, আই মোর ঘেগী সতীনে[10] কয়
আই মোর বুঁচি সতীনে[11] কয়, মুই বলে আন্দোং জানোঁ না ॥
ময় দিচোং মশলা দিচোং (আরো) হরিতকী কুটিয়া
তাহার মইদ্যে গন্ধী পকা[12] আরো দিচোং বাটিয়া
না তেন[13] সোয়াদ[14] হইবে না।

শব্দার্থঃ ১-মেরে ২-মাছ ৩-মাঝি ৪-দারিকা মাছ ৫-বরযাত্রী ৬-চাঁদা মাছ ৭-চিংড়ি মাছ ৮-সতীনেরা ৯-রান্না ১০-ঘা হয়েছে যার ১১-নাক বোঁচা ১২-গন্ধওয়ালা পোকা ১৩-না হলে ১৪-স্বাদ।

আই মোর সতীনগিলা কয়, আই মোর ঘেগী সতীনে কয়
আই মোর বংচি সতীনে কয়, মুই বলে আন্দোং জানোঁ না ॥
(খগেন রায়বর্মণ। বক্সনগর, জলপাইগুড়ি।

॥ ২ ॥

আমি নউতোন[১] বউয়ের কাথা বইলমোঁ[২] কারে
আন্দোন[৩] খায়া জামাই যায়না ঘুরে[৪]।
আনিয়া দিনু খইল্সা পুটি কুটিয়া দিলে কাটোলের ঘুটলী[৫]
অ্যাক কমোর জল ঢালিয়া দিচে খাবার সোমে মজা ধরে।
আনিয়া দিনু উইমাচের মাতা[৬] তাতে কাটিয়া দিলে নাউয়ের পাতা
সইরষ্যার ত্যাল ছাড়িয়া অ্যাড়ির ত্যাল[৭] ঢালিয়া দিচে
খাবার সোমে মজা ধরে ॥
সকালে দিচে আদা-কুটা[৮] তাতে দিচে চ্যাংটা মুটা
অ্যাক চাড়ি পানি দিয়া ভিজিয়া থুইচে[৯]
আনিয়া দিনু মুলার পাতা তাতে দিচে ব্যাঙের মাতা
চুপ করিয়া খায় জামাই কয়না কারে।
আমি নউতোন বউয়ের কাথা বইলমোঁ কারে ॥
(ত্রিফুল্লকুমার রায়। চিলকিরহাট, কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

আরে কইনার কিবা দোষরে আছে, ও তার ঘটকশালা পাজি।
ওরে অ্যাকেতো কইন্যা যম-পালাটি[১০] তাতে হইল দারুণ টসি
বাম গালে তার টোপ্লাফুলা[১১] ডাইন চোউক্ষে তার কালি
এক চোউক্ষে দ্যাকে।
আরে বরের কিবা দোষরে আছে—
অ্যাকে তো পাত্র যম পাগেলা[১২] তায় হইল গালাফুলা
প্যাট ঢ্যাবরা[১৩] পিঠিত্ এ্যাকটা দারুণ কুঁজ সেইটে দ্যাকে লোকে।
আমি হইনা গরীবের মাইয়া[১৪] তোর সঙ্গে পেম করিম না রে
মোক বলে ব্যাচেয়া খাইচে তেমোলা ঘরে ॥

শব্দার্থ : ১-নতুন ২-বলবো ৩-রান্না ৪ আর ফিরে আসে না ৫-কাঁঠালের বিচি ৬-রুই মাছের মাথা ৭-রেড়ির তেল ৮-আধকোটা বা আধভাঙ্গা ৯-ভিজিয়ে রেখেছে ১০-যম যাকে দেখলে পালায় ১১-আব ১২-যম যাকে দেখে পাগল হয়ে যায় ১৩-পেট ফোলা ১৪-আমি গরীবের মেয়ে হলেও।

আমি শুইন্যাচি ঘটকের মুকে বাড়ীত পুষ্করণী আচে
হস্তীত্ করিয়া নাইওর কইরবে রে
আই মোক পাল্কীত করিয়া নাইওর কইরবেরে !
আই মোক গাড়ীত কইর‍্যা নাইওর কইরবে রে
আই মোক ঘাড়োত কইর‍্যা নাইওর কইরবে রে
আই মোক কোলাত্ কইর‍্যা নাইওর কইরবে রে।
মোক বলে ব্যাচেয়া খাইচে তেমালা ঘরে ॥

(রেকর্ড : নায়েব আলি (টেপু)

॥ ৪ ॥

আষাঢ় শাওণ মাসেরে ভাই নদীর আসিল্ ঢিপ্[১]
যত গোদায়[২] যুক্তি করি কাটিল্ বড়শীর ছিপ্।
গোদায় যায় মাচ মারিতে—হায় রে এ-এ-এ।
কেউ বা নিল সুতা বড়শী কেউবা নিল চ্যারা
নদীর পাড়োত্ পড়িয়া রইল কণ্ঠিধারী মড়া
যেমন গরুর মত। হায়রে হে এ হে ॥
(আরে) নদীর পাড়োত্ ব্যাড়েয়া তকোন গোদার খাইলেক ঠ্যাং
যত গোদায় যুক্তি করি বাধিল্ এককান টঙ[৩]
টঙখান্ নদীর পাড়ে। হায়রে এ-হে-এ ॥
মাচো না পাইল্ টাচো[৪] না পাইল গোদা আসিল ঘুরি
(আর) আন্দোন ঘরোত্ বসিয়া গোদা গল্প দিচে জুড়ি
কত মাচ হুকসি গেইচে[৫]। হায়রে—এ হে-এ ॥
এই কাথা শুনিয়া গুদ্নী রাগে হইল টঙ
ভাত-ঘাটা নাটিত্[৬] গোদার মাতাত্ মারিল্ ডাং
গোদা যায় পলাইয়া। হায়রে—এ-হে-এ ॥
ডাং খারা গোদা তকোন দাঁত-নিক্লি হাসে
খিড়কি দুয়ার দিয়া গুদনী নজর করি দ্যাকে
গোদা মোর গঁসা হইচে। হায়রে—এ হে এ ॥

(রেকর্ড : কেশব বর্মণ)

শব্দার্থ : ১-ঢল ২-বুড়োরা ৩-মাচা ৪-মাছটাছ ৫-ছুটে গেছে ৬-ভাত নাড়া দেওয়ার কাঠিতে।

॥ ৫ ॥

দ্যাক্‌রে মোর ঢকো আবো[১] ক্যামনরে সোন্দরী
বোচা নাকে নথ পিন্দিছে[২] ।
চোউক্ষের ভুরুতে কাজলের ফোটা চিক্কিত[৩] করিয়া হাসে রে ॥
মলা তমাকু[৪] না খায় মোর আবো আলেয়া তামাকু ভালে
ওরে ভাঙা মুড়িয়া ছিলিম[৫] জিউ ছাড়িয়া[৬] টানেরে
চোবগা[৭] নাগে আবোর গালেরে ॥
সুপারী গুয়া না খায় মোর আবো মজাগুয়া[৮] ভালা
কাণ্ডা গুয়া খায়া নাবি-ঢিলা[৯] হইচে হাতের শুকায় না জলরে ।
ফেলা খাড়ু বাজে ঝমোর ঝমোর করি থমক বাজে রয়া রয়া
(আরে) দোত্‌রার বাইজন্‌তে[১০] নাচে মোর আবো কমোরে হাত দিয়া রে ॥

(মিহিরকুমার মল্লিক, ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

॥ ৬ ॥

না জানিয়া না শুনিয়া না দ্যাকিয়া না বুজিয়া
আগে কইরলাম বিয়া
মদ্যি পতে[১১] কইন্যার ভারে ভাইঙলো গাড়ীর জোড়া ॥
হায়রে টেংগা[১২] কইন্যাক্‌ বিহাও করিয়া
হায়রে, টেঁবলা কইন্যাক বিহাও করিয়া
হায়রে, ধুপসী কইন্যাক বিহাও করিয়া ॥
ওজন বৌয়ের চারেক মন, তাইতে বৌয়ের মন উচাটন
শরীলডা শুকাইয়া হইল কাঠ ।
ডাকদার হাকিম বদ্যির দেওয়া দাওয়াই গিলবার চায় ।
গাড়ীর ভাঙ্গিল লোহার জোড়া বাড়ীর ভাঙ্গিল শিলের নোড়া
বৌয়ের হাতের ভারে ।
ঢেকির ভাঙ্গিল্‌ কমর কইন্যার গোদা পাওয়ের ভারে রে ॥

(পল্লীবাঙলার লোকগীতি—নির্মলেন্দু চৌধুরী

শব্দার্থঃ ১-রসিক দিদিমা ২-পড়েছে ৩-ফিক্‌ফিক্‌ করে ৪-মাথা তামাক ৫-কোনা ভাঙা কলকে ৬-দম বন্ধ করে ৭-গালতুবড়ে যায় ৮-ভেজানো সুপারী ৯-পেট খারাপ হওয়া ১০-দোতরার বাজনার তালে তালে ১১-মাঝপথে ১২-মোটা, ধপসী ।

॥ ৭ ॥

ফুটানীপাড়া নাগেশ্বরী একেত গারাম[১]
হাইয়ের জ্যাঠা ঐ মুচিরাম পাইচে নিমন্তন—যায় সে নিমন্তনে।
একে হইল্ গরীব মানুষ তায় নিমন্তন পাইচে
তিনদিন হাতে[২] ঐ মুচিরাম প্যাট শুকিয়া[৩] আছে।
মুচির মাতাত্ ধুতিরে মোর হাইয়ের মাতাত্ কাপড়
হাইটবার নাগায়[৪] ঐ মুচিরাম পিঠোত্ মারে চাপড়—জ্যাঠা বেল্ গেইল্।
ধেরে ধেরে[৫] যায় মুচিরাম ঘাটোত্ না হয় খাড়া
খানেক দূরে গিয়া পইল্ দাসের হাটোত্ ছড়া[৬]—সেইটা বিল বটে।
দাসের হাটোত্ ছড়া পইল্ ব্যালা হইল্ গত
মুখ নাগেদি[৭] খাইল্ পানি গাড়ীর গরুর মত—জ্যাঠা বলদ হইল।
পানি খায়া ঐ মুচিরাম ঘাটাত্ দিলেক পাড়ি
এক্কে দমে চলি গেইল্ ঐ না কাটোলবাড়ী—গেইল সে নিমন্তনে।
মুচিরামোক্ বইস্তে দিল তিন ঠেঙ্গিয়া[৮] পিড়া
উব্রা খায়া[৯] পৈল মুচিরাম মাতাত্ ভরিল্ চিড়া—জ্যেঠা নৈভ্জা পাইল্
উব্রা খায়া পৈল মুচিরাম নৈভ্জা পাইল ভারি
হাত ধরিয়া নিয়া গেইল্ তায় ঐনা অন্দরবাড়ী—জ্যেঠাক্ জল খোয়াইতে
পানি খায়া ঐ মুচিরাম হ্যাট করিল্ মাতা
আনিয়া দিল্ পানের বোটা ছিড়িয়া আলুর পাতা—সেইটা মজাক্ কর্যা।
ন্যাতিগলা নাচেরে মোর ঘাড়োত্ দিয়া হাত
বাইগোন বাড়ী[১০] বাইজ ছাড়িয়া[১১] খ্যাসরে দিচে দাত[১২]—সেইটা তামাশা কর্যা

(উত্তর বাঙলার পল্লীগীতি ; চট্কা খণ্ড—হরিশচন্দ্র পাল: ১৩৮২। পৃঃ ১২)

১০. ছড়া

॥ ১ ॥

চৈল্ ভৈল্ ধুপ্ করিয়া পৈল্
কুড়ি আইনলোং তা আমার বাপোই হইল,
তুর, তুরা তুর তুরা—নাচে আমার বুড়া
হাটের ইলিশা মাচ আর বাড়ীর বাইগোন।
তাক খায়া বাপোই আমার জুইড়ছে নাচোন ॥

শব্দার্থঃ ১-গ্রাম ২-তিনদিন হতে ৩-না খেয়ে ৪-হাটতে থাকে ৫-ধীরে ধীরে ৬-দাসের হাটের নদী ৭-মুখ লাগিয়ে ৮-তেপায়া ৯-উপুড় হয়ে ১০-বেগুনের ক্ষেত ১৫-বাজাতে বাজাতে ১১-দাত বের করে হাসছে।

তুড়ুৎ তুড়ুৎ নাচে তোমার বাড়ীত্ আচে
কুত্তি গেইল্[১] ছাওয়ের আবো[২] দ্যাকেক আসিয়া
তালে তালে নাচে বাপোই হাসিয়া হাসিয়া।
কত চ্যাংড়া চেংড়ী আদাবসি[৩] গাবুরালী আইচে পোলার মাও
নাচন দেকিলেন আই মাওগিলা[৪] পাইসা দিয়া যাও ॥
বাপোই নাচির ধরিচে ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুম ঝুমা ঝুমঝুম
ঢাক বাজে ঢোল বাজে তাক ডুমা ডুম ডুম।
গুয়ার ব্যাটা নাও তোমরা গুয়া খায়া যাও[৫]
বিনা পাইসায় না দেখাইম্ আর বাপোইর নাচন ফাও[৬] ॥

(নগেন শীল শর্মা। কোচবিহার)

॥ ২ ॥

তাই তাই তাই মামার বাড়ী যাই
মামী দিচে দুদভাত[৭] মামা দিচে গাই
মামার ব্যাটা ছ্যাচেড়া[৮] কাড়িয়া নিচে গাই—নৈল্জা নাই নৈল্জা নাই ॥
দোনো জনে সাতী[৯] হয়া ভাত-আন্দা[১০] খেলাই
এলা সাজাই কইন্যা গাবুরা জোকার[১১] দে তুই
উলু উলু বাচ্চা কইন্যা তুই ধর
মুই সাজোং মেঘা বর - এ হেনা সোন্দরী কইন্যা যাইবে পরার ঘর ॥
আম বাড়ী জাম বাড়ী হেই দ্যাক্ তোর মামা বাড়ী
গালা হউক ঝারি ঝারি।
ডোমনারে ডুমনী সরা মাচের[১২] ক্ষুমণী
সরসরায় না ঘরঘরায়—ডোমনা ব্যাটা কোণ্টে লুকায়
ধাপ ধুপ নিশ্চুপ কোথায় অ্যালা তুই।

(নগেন শীল শর্মা। কোচবিহার)

॥ ৩ ॥

নুনে আজা[১৩] ত্যালে পাত্র হল্দি শুদু অং[১৪] মাত্র
মায় মশলা পাচ ফোড়ন তাইতে ভালো আন্দোন বাড়ন।

শব্দার্থঃ ১-কোথা গেল ২-ছেলের দিদিমা ৩-আধবয়সী ৪-মায়েরা ৫-সুপারী খেয়ে যাও ৬-বিনা পয়সায় ৭-দুধভাত ৮-ছ্যাচোড় ৯-সাথী ১০-ভাতরান্না ১১-উলুধ্বনি ১২-শুঁটকি মাছের ১৩-রাজা ১৪-রং।

নোমায় মিঠা নোমায় ঝাল[1] নয়া বউয়ের আন্দোন ভাল্
চাটুম চুটুম খাবার মজা চ্যাং মাচের শানা না খায় কোনজনা
দিয়া কাজী নেবুর টেঙ্গা ।[2]
ভাজার মইদ্যে ভাজা কই মাগুর ভাজা
তাহার মইদ্যে আজা ইল্শা মাচের ঝোল
আদুনী[3] যদি ভালয় হয় খাওযাইয়া[4] পাগোল ।
উই কাত্লা মাচ[5] মাংস খায় কয় জনা
বড় নোকে খায় মাংস যার হাজার ট্যাহা আয়
গরীব মাইনষে খাইলে সেইডা ভাইগ্যো[6] বলা যায় ॥

(নগেন শীল শর্মা । কোচবিহার)

১১. কেচ্ছা

॥ ১ ॥

আমার সুক[7] নাই রে দুখ পরাণের বরি
দশ বারোখান করিয়া বিয়া দ্যাশে দ্যাশে ঘুরি ।
পোত্থমে[8] করিলাম বিয়া কামারজানির ভাটি
সেই বউটা আসিয়া আমার ঘর কইরলে মাটি ।
তারপর করিলাম বিয়া তিস্তা নদীর পাড়ে
সেই বউটা আসিয়া আমার চাইরখ্যান খড়ি ফাড়ে[9] ।
তারপর করিলাম বিয়া মোহন গঞ্জের ধারে
সেই বউটা আসিয়া আমার গালা টিপি ধরে[10] ॥
আমার সুক নাইরে ॥

(লোকসাহিত্য : ১১ খণ্ড । বাঙলা একাডেমী । পৃ: -১৩)

॥ ২ ॥

কি মোর এ জোঞ্জাল হইল্ রে ।
কদমতলার ঘাটে কি খ্যানে[11] দ্যাকিলুঁ তরে
হইলাম পাগোল তরে বিয়া করিবারে ॥
(ওরে) দুই বিগা ভুঁই ব্যাচেয়া দিলুঁ ট্যাহা চিপ্টা বাপ তোর নিল্রে
আন্দা ভাতের[12] আশে আনিলাম তরে ট্যাহা দিয়া তুল্যা
অখন হাঁড়ি ফ্যালায় হাড়ির হাল হাসে লোকে শুন্যা ।

শব্দার্থঃ ১-না মিষ্টি না ঝাল ২-লেবুর টক দিয়ে ৩-রাঁধুনী ৪-যে খাবে ৫-রুই কাতলা মাছ ৬-ভাগ্য ৭-সুখ ৮-প্রথমে ৯-কাঠ চেরাই করে ১০-গলা টিপে ধরে ১১-কোন কুক্ষণে ১২-রাঁধা ভাতের ।

চান্দপানা মুক[১] দেইকে চান্দির পৈছা[২] দিলু কিনে
সেই মুকের ঝাঁঝে থাকতে নারি কান্দি আইতে দিনে।
হইল হাড় কালি আর মাস কালি মোর কালা হইল মুক
হাড়ে হাড়ে বুঝেয়া দিচে[৩] বিয়া করবার সুক ॥

(আব্বাসউদ্দীনের গান। স্টুডেন্ট ওয়েজ। ঢাকা. পৃঃ ৯৫-৯৬)

॥ ৩ ॥

ওকি মাইরে[৪] মাই মোর মতন আর সতী নারী নাই।
বাপোমাওয়ে নাম রাইক্যাচে[৫] নবঅংয়ের[৬] তারা
ঝাড়িয়া বান্দোং মাতার চুল নাচিয়া যানোং বারা ॥
ওকি মাইরে মাই, ওকি ধওলী[৭] মোরে মাই ওকি কালটি মোরে মাই
মোর মতন আর সতী নারী নাই।)
নাল শাড়ীখ্যান পিন্দিয়া আবো পরজা টারি[৮] গেনু
ভালে ভালে চেংড়াগুলার[৯] পানের খিলি খানু।
মোর সোয়ামীর অসুক[১০] হইল ওজার[১১] বাড়ী গেনু
ওজার চক্কর বক্কর দ্যাকি ছয়োমাস ঐটে রনু ॥
মোর সোয়ামী মরিয়া গেইচে প্যাটোত্ হয়া বিষ
কামের খরচ নাই করিতে[১২] কাইনের উন্দিস।[১৩]
য্যামোন হইল্ মোর পাড়ার নোক মুই নারীটা ত্যামোন।
কোন সতীনে কবার পারে অ্যামোন আর স্যামোন।
বারো হাতিয়া[১৪] শাড়ীখ্যান না ঢাকে মোর গাও
বিয়ার ঘটক না আইতেই সাত ছাওয়ালের[১৫] মাও ॥

(দময়ন্তী রায়। কোচবিহার)

॥ ৪ ॥

বুড়াটা মাসে মাসে বত্তপালে[১৬] হরির নামের মালা জপে
ঐ বুড়াটা বিধুয়া নিবায় চায়।
উয়ার বড় ব্যাটা উটিয়া কয় ওইটা কাথা হবার নও
ঐ বিধুয়া মোক নেওয়া হয় ॥

শব্দার্থ ঃ ১-চাঁদের মত মুখ ২-রুপোর কোমরবন্ধনী ৩-বুঝিয়ে দিয়েছে ৪-ছোট মেয়ে ৫-রেখেছে ৬-নব রঙের ৭-ফর্সা রঙের ৮-পরের বাড়ী ৯-ছেলেদের ১০-অসুখ ১১-ওঝার ১২-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম না হতেই ১৩-বিয়ের উদ্দেশ্যে ১৪-বারো হাত লম্বা ১৫-ছেলের ১৬ ব্রত পালন করে।

বুড়ার ছোড ব্যাটায় নটপটায়[১] মাতা ঝাপে[২] উটি কয়
তোমরাগিলার[৩] বুদ্দি ভালা নয়।
তোমরায় করেন কানাকানি তাকো মুই ভালেই জানি
ঐ বিধুয়া মোর ভাবের মাইয়া[৪] হয় ॥
তকনে[৫] তিনিজনে[৬] কাড়াকাড়ি ডাঙ্গাডাঙ্গি[৭] মারামারি
এক বিধুয়া সগায়[৮] নিবার চায়।
বুড়াটার হইল্ বুদ্দি ভারী ঐ বিধুয়াক্ আইন্‌লো বাড়ী
বড় ব্যাটা তার গঁসা[৯] হয়্যা যায় ॥
ও দারুণ বিদাতারে[১০] বিদাতা, কলিযুগের ভাব বুজা দায় ॥

(ধনেশ্বর রায়। জটেশ্বর, কোচবিহার)

১২. লোক সাংবাদিকতা

১. জীবন সংগ্রাম

॥ ১ ॥

(মূল্যবৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত অবস্থা সম্পর্কে)

শুনেন রে বাই সমাচার, ভাব ধরিল কি চমৎকার
মিঠা তৈল হইল্ আঠারো ট্যাহা স্যার[১১]।
(আর) ডাইলের পোয়া একুশ আনা, পাথর থাকে চাবান[১২] যায়না
দাম বাড়িল্ ভাই শুকান্ মরুচের ॥[১৩]
বউয়ের মাতার নারিকেল তৈল, সিটারও[১৪] দাম বাড়ি গেইল্
মাচের দাম হইল্ য্যামোন সোনাদানা, বাদ দিনু সাবান চুড়ি
সাধারণ ধুতি শাড়ী আর বুজি পেন্দোন যায়না ॥
হাহাকার হইল্ শুরু বেচি দিত্যাছে হালের গরু
বন্দক রাখে কেউ বৌয়ের কানের সোনা
অনাহার অর্ধাহারে কেউ চলতেছে ধার করে
শাখাই বাড়ী কেউ করচে আনাগোনা ॥
এবার বৃষ্টি হইল্ ভারী, হয়নাই তাঁর তরকারী
হাটোত্ যায়া কি জিনিস ব্যাচাই।
লাউ কুমড়া এটা ওটা এসবে আর পাইসা কয়টা
বেচির জিনিস[১৫] ঘরোত্ কিছুই নাই ॥

শব্দার্থ: ১-ঝটপট করে ওঠে ২-মাথা ঝেঁকে ৩-তোমাদের ৪-প্রেয়সী ৫-তখন ৬-তিনজনে ৭-লাঠালাঠি ৮সকলে ৯-রাগ ১০-বিধাতা ১১-সের ১২-চিবানো ১৩-শুকনো লংকার ১৪-তারও ১৫-বেচবার মত জিনিস।

কিনতে চাই সস্তা দরে জিনিসের দাম রোজই বাড়ে
দিল্লী বলে নাইম্‌্চে বাজার
তুমি আমি বুজি সেটা সইংসার চালান কি যে ল্যাটা[১]
মরণ হইলেক্ ভাই তোমার আর আমার ॥
(নিবারণ পণ্ডিতের গান—প: ব: রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, । পৃ: ১১)

খ. রাজনীতি

॥ ১ ॥

(গান্ধীজীর আহ্বানে চরকা কাটার গান)

হুরর বাকুমকুম করে চরকা
(আয়) চরকার গান শুইন্‌বার ভাল্ ।
হরকার গচের নাওরে ওরে কুনিয়ার গচের বৈঠা
(ওরে) কায়তের বেটি কাটোল কাটে মোর লুসায় ভাবে চরকারে ।
আয়রে নালাটুর বাপ ধৈরচে এন্দুর[২] মাইরচে সাপ
এ্যাকটা এন্দুর গিরগিরায়[৩] নালাটুর বউয়ের জিউ শুকায়[৪] ।
নালাটু বলে হায় হায় মরি কি হবে উপায়
হরকার গচে চরকার ভাসা ওরে বগিলায় ধরি খায়
ওরে খৈলসার বিয়াও নাই হৈতে পুটি নাইওর যায় রে ।
টান্ ওরে টান্ হুকা ছিলুম টান্
চরকার ছিলুম জিউ ছাড়ি টান্
ঘড়িয়াল ঘোম্ মুকখ্যান শোঙ নগরীত্ বসিয়া টগরী বাজায়
দোতরার ঘোম্ হুরর বাকুমকুম চরকার গান শুইনবার ভাল ॥

॥ ২ ॥

(অপারেশন বর্গাকে সমর্থনে)

ওকিরে ও হালুয়া[৫]
দখল রাখ তুই ভুঁই[৬] দখল ল্যাখ্যাইয়া[৭]।
গিরিওয়ালার[৮] ফাসার ফুসুর[৯] তুই য্যানে শুনিস না ।
কনে তুই দেকিয়াও দ্যাকিসনা উয়ার দুষমনি কোনা
হাল তুলিবার বুদ্দি কত তোকে মারিয়া ॥

শব্দার্থ: ১-সমস্যা ২-ইন্দুর ধরেছে ৩-চোখ পিটপিট্ করে ৪-ভয়ে জিহ্বা শুকিয়ে আসে ৫-চাষী ৬-জমি দখল ৭-লেখিয়ে ৮-জমির দালালের ৯-কুমন্ত্রণা ।

হালুয়া নাম রেকর্ড হইবে ভুঁইটা চাষ করিছে যে
নগদ জরিপ নামিবে হালুয়ার নামটা বসিবে
হালুয়া নাম রেকর্ড কর তুই জুট বান্দিয়া[১] ॥
অ্যাকবার যদি হালুয়া নাম রেকর্ডভুক্ত হয়
হালুয়া নাম পুছা আর নয়,[২] নাই আর উচ্ছেদের ভয়
ব্যাংক সেলায়[৩] ঋণ যোগাবে তোক ডাকিয়া ॥

(নিবারণ পণ্ডিতের গান। পৃ: ১২৫)

॥ ৩ ॥

(আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে)

মাও বুন[৪] ও মাও বুন
জুট বান্দো জুট বান্দো মাও বুন ও।
ধুঁকে ধুঁকে মইরবো কত আর দ্যাশের যত নারী
চলো সবাই এ্যাকটে[৫] বসি বাঁইচবার চিন্তা করি।
মজুর কিষাণ মইরচে ধুকে কাজ কামাই[৬] না পাইয়া
মায়ের জাতি মা বুন মইরচে ঘর কোনায় পড়িয়া ॥
পুরুষ মানসির কামাই নাই মাইয়াক্ কি খোয়ায়
ছাওয়াক খোয়াইয়া[৭] মা বুনগিলার[৮] উপাসে দিন যায়।
পিন্দনের কাপড় মিলেনা প্যাটের মিলেনা ভাত
প্যাটের ভুখে ছাওয়া কান্দে কান্দিয়া কাটে দিন আত[৯] ॥
নারী সমাজ মইরবে ক্যানে সদায় পুরুষ ভীতি চায়া[১০]
চলো বাঁইচবার চিন্তা করি আমরা অ্যাকটে বসিয়া।

(নিবারণ পণ্ডিতের গান। পৃঃ ১২৭)

॥ ৪ ॥

(নির্বাচন সংক্রান্ত গান)

উত্তরবঙ্গের কিষক সাবদান—
যদি মানুষির[১১] মতোন বাইচবারে[১২] চান।
ভোট নিবার বাদে[১৩] দ্যাশে নাগিচে[১৪] ঢেউ
চোঙা ফুকে কেউ নম্ফ ঝম্ফ[১৫] করে কেউ।

শব্দার্থঃ ১-জোট বেঁধে ২-নাম মোছা যাবে না ৩-ব্যাংকগুলিও ৪-মা ও বোন ৫-একত্রে বসে ৬-কাজ কর্ম ৭-সন্তানকে খাইয়ে ৮-মা বোনেদের ৯-দিনরাত ১০-পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে ১১-মানুষের ১২-বাঁচাতে ১৩-ভোট নেওয়ার জন্যে ১৪-লেগেছে ১৫-লাফা-লাফি।

ন্যাতালা[১] বান্দি নানান রকম পার্টি[২]
ভোটের তনে কইরচেন উজান ভাটি ।[৩]
দ্যাশে নাগিচে ভোটের মস্ত বড়ো ঢেউ
বড় বড় ন্যাতাগিলার[৪] না হয় ঘুম ॥
নানান দল বান্দি করে দলাদলি
কাঁহো ডাইনে কাঁহো বাঁয়ে যায় চলি ॥

(কুমার নিধিনারায়ণ : কোচবিহার)

গ. প্রতিবাদী গান

॥ ১ ॥

(বেরুবাড়ী পাকিস্তানে হস্তান্তরের প্রতিবাদে)

মুলগায়েন ঃ আসরেতে খাড়া হয়্যা[৫] বন্দিম্ এ লোক কাক্[৬]
দ্যাশের হালত্[৭] দেখ্যা হইচুরে[৮] আবাক
মরি হায়রে কলিকাল—
বেরুবাড়ী দিবার নাগে[৯] নাগ্যাচে ক্যাচাল[১০] ।
সমস্বরে ঃ বেরুবাড়ী দিম্ না, বেরুবাড়ী দিম্ না
বেরু দিম্ বাড়ী দিম্ বেরুবাড়ী দিম্ না
জান্ দিম্ পাণ দিম্ বেরুবাড়ী দিম্ না ॥
পুরুষ ঃ খাজালা[১১] খাবার চাছিস্ গিরথানী[১২] মুই ক্যামনে পামু গুড়
বেরুবাড়ী যায় পাকিস্তানত্ মুই কি হছু চুর ।[১৩]
পাটানী[১৪] পিন্দিবার চাছিস্ গিরথানী পাটানী পামু কই
বেরুবাড়ী যায় পাকিস্তানত্ হামি কি চুপ করিয়া রই ॥
নারী ঃ যাওরে কুকিল উড়্যা হামাক্ বাপোক্ গিয়া কভা[১৫]
তোমার বেটি ছাওয়া[১৬] মরছুরে হায় নদীত্ ডুব্যা
ডাঙ্গর মাইয়ারে[১৭] বিয়া দিতে বেরুবাড়ী নাগে ।
পুরুষ ঃ হায়রে হায়, হায়রে দারুন বিদি
বেরুবাড়ীটার ক্যাচাল ছাড়াক বিদি
হামার ঘর না করিস আইন্দা ॥

(বাঙলার লোকসাহিত্য , ৩য় খণ্ড । পৃঃ ৬৬০)

শব্দার্থ ঃ ১-নেতারা ২-পার্টি ৩-এদিক ওদিক ৪-নেতাদের ৫-দাঁড়িয়ে ৬-কাকে বন্দনা করবো ৭-দেশের অবস্থা ৮-হয়েছি ৯-দেওয়ার জন্য ১০-গণ্ডগোল শুরু হয়েছে ১১-খাজা ১২-গৃহিনী ১৩-আমি কি চোর হব ১৪-মেয়েদের পরিধানের বস্ত্র ১৫-বলবে ১৬-মেয়ে ১৭-যুবতী মেয়ে ।

সংকলন : তৃতীয় অংশ

সঙ্কলিত গানের বর্ণানুক্রমিক তালিকা